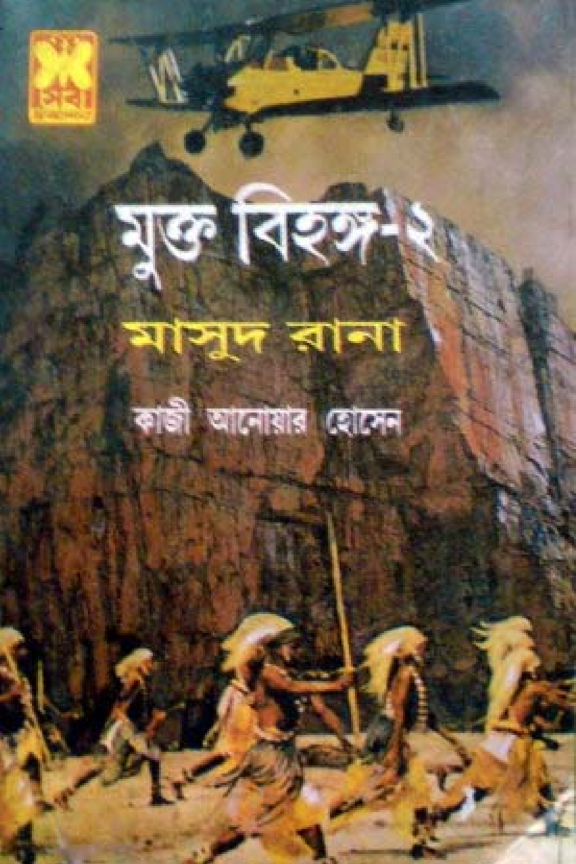

মুক্ত বিহঙ্গ-২
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

মুক্ত বিহঙ্গ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

আর্মারড কারের মাথায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স হাসান সালে আর অ্যানি উইসপার, চোখের উপর হাত দিয়ে রোদ ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে জোড়া পাহাড়চূড়ার মাঝখানে–হঠাৎ করে সেখানে উদয় হলো প্লেনটা।

একজন পাইলট হিসাবে অ্যানি বুঝতে পারে, পাহাড়ের গর্ভ নামে পরিচিত সারডিতে প্লেন নিয়ে আসা ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ। পাহাড়ের কিনারা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীব্রগতি জলপ্রপাত, চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে আছে ঘন কুয়াশার মত মিহি জলকণা। পাহাড় প্রাচীরে বাধা পেলেও, গিরিখাদ আর প্রতি জোড়া চূড়ার মাঝখানে ফাঁকগুলোয় বাতাস প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎগতিতে, হালকা একটা প্লেন নিয়ে আসা, আর পচা সুতোর মাথায় ঘুড়ি ওড়ানো প্রায় একই কথা।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটা চিনতে পারল অ্যানি। খুব বেশিদিন হয়নি, এই একই মডেলের একটা প্লেন নিয়ে ট্রেনিং পর্ব শেষ করেছে সে, প্লেন চালানোর লাইসেন্স পেয়ে গেছে। ওটা একটা পুস মথ, নীল রঙের ছোট্ট মনোপ্লেন। দ্য হাভিল্যান্ড ফোর-সিলিন্ডার অ্যারো এঞ্জিন। বসবার আয়োজন সীমিত, পাইলট ছাড়া

আর মাত্র দু'জন আরোহীর জায়গা হবে। পাইলট বসবে সামনের ঘেরা কেবিনে।

চূড়ার নীচে, পশ্চিম খাদের ভিতর দিয়ে এল পাইলট; হঠাৎ করে খাড়া নামতে শুরু করে দ্রুত বাঁক নিল, ছুটে এল উপত্যকার একমাত্র খোলা জায়গাটার দিকে–শুধু এদিকটাতেই কোন গর্ত, ঘাস বা পাথর নেই। পশুর হাট, জিমখানা বা পোলো গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় জায়গাটা, যখন যেমন দরকার। ফাঁকা মাঠের কিনারায় অবশ্য সবুজ ঘাস রয়েছে, ছাগলও চরছে গোটা পঞ্চাশ, তবে এই মুহূর্তে নূর আয়াঙ গালার ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা খেদিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে। প্লেন মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে গালা বাহিনী সেটাকে ধাওয়া করল, তারপর ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। পিছনের দু'পায়ে ভর করে খাড়া হলো ঘোড়াগুলো, ওগুলোর পিঠে বসে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে নাচতে শুরু করল গালারা, রাইফেলের মাজল আকাশের দিকে তুলে শুরু করল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ।

বারোশো সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি কুৎসিত কদাকার চেহারা। ইথিওপিয়ার অসভ্য আদিবাসী বলতে গালাদেরই বোঝায়। শৃংখলা, আইন, নীতি, বিবেক, দয়াধর্ম ইত্যাদির কোন চর্চা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। দুর্গম গিরিখাদের ভিতর দিয়ে এদের সঙ্গেই যেতে হবে তাকে, ভাবতে গিয়ে গলাটা শুকিয়ে এল অ্যানির।

আর্মারড কারের পাশেই প্লেন থামাল পাইলট, পাশের জানালা খুলে বের করল মাথাটা। আফ্রিকান তরুণ, গোলগাল চেহারা, খুলি কামড়ে থাকা কোঁকড়ানো চুল মাথায়। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলল সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'আপনিই কি মি. হাসান সালে?'

নিতম্বিনীর মাথা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামবার আগে অ্যানির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল প্রিন্স। বলল, 'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো। যুদ্ধ একটা জোরেশোরেই বাধবে। আমাদেরই যেখানে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কীভাবে দেই, বলো? আমি চাই, দুনিয়ার লোক জানুক আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে তোমাকে আমি প্রাণের ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না। ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পারো তুমি।'

'সেই গল্পটা শোনোনি?' মাথা নেড়ে বলল অ্যানি, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'এক সাংবাদিক গোলাগুলির ভয়ে সায়গন থেকে পালিয়ে গেল নিউ ইয়র্কে, পনেরো মিনিট পর মারা গেল কার অ্যাক্সিডেন্টে? কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়?' আবার মাথা নাড়ল সে। 'আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি, প্রিন্স। সেটা শেষ করব।'

ঝুঁকে অ্যানির হাতে চুমো খেলো হাসান সালে। 'আমি কৃতজ্ঞ।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রানাকে গিয়ে কি বলতে হবে মনে আছে তো?' মাথা ঝাঁকাল অ্যানি।

প্লেনের ছোট্ট কেবিনে গিয়ে উঠল প্রিন্স। এতক্ষণ পাশের জানালা দিয়ে অ্যানিকে একদৃষ্টে লক্ষ করছিল পাইলট, অ্যানি তার দিকে তাকাতেই মনভোলানো হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ, বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে অনুমোদন আর প্রশংসার আন্তর্জাতিক সংকেত একটা বৃত্ত তৈরি করল সে। তার নিঃশব্দ হাসিতে এত আন্তরিকতা, চেহারা এতটাই সরল আর নিষ্পাপ যে পাল্টা অ্যানিকেও হাসতে হলো। 'আরও একজনের জায়গা হবে!' চেঁচিয়ে বলল পাইলট।

হেসে উঠে অ্যানিও চিৎকার করল, 'পরের বার, যদি সুযোগ

হয়।’

‘ইট উইল বি আ প্লেজার,’ বলে মাথা টেনে নিল পাইলট, বাঁক নিল, খোলা মাঠের দীর্ঘতম সমতল বিস্তৃতির দিকে তাক করল মনোপ্লেনের নাক।

অ্যানি দেখল, অলসভঙ্গিতে পাহাড়চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে পুস মথ, মাত্র দু’জন আরোহীও যেন ওটার জন্য অনেক ভারি বোঝা। এঞ্জিনের আওয়াজ ব্যস্ত মৌমাছির গুঞ্জন, ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে, সেই সঙ্গে অদৃশ্য কিন্তু নিরেট একটা নিঃসঙ্গ ভাব চারদিক থেকে চেপে ধরল তাকে। কুৎসিতদর্শন প্রকাণ্ডদেহী ঘোড়সওয়ারদের উপর চোখ বুলাল সে, আর্মারড কারটাকে ঘিরে অশ্লীলভঙ্গিতে নাচানাচি আর ছুটোছুটি করছে তারা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। হঠাৎ উপলব্ধি করল অ্যানি, এত লোক অথচ একজনও তার ভাষা বোঝে না। শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, কী এক অজানা আশংকা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল মনে, তলপেটের ভিতর ভয়ের ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠল।

রানা আর মাইকেল, দু’জনেরই অভাব বোধ করল অ্যানি। বড় কোন ঝুঁকি নিয়ে হলেও সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যেত! টেলিগ্রাফ অফিসে একবার যাবে নাকি? কেন যেন জংলী গালাদের কাছে থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। ওর পাঠানো রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার করে নিউ ইয়র্ক থেকে কোনও মেসেজ এসে থাকতে পারে, গিয়ে দেখে এলে হয়। কিন্তু ধারণাটা বাতিল করে দিল সে। তার সম্পাদক এখনও পায়নি ওটা।

চারদিকে তাকিয়ে প্রিন্স হাসান সালের দেহরক্ষীদের খুঁজল অ্যানি। চিনতে অসুবিধে হলো না, কারণ গালাদের সঙ্গে তাদের চেহারায় কিছু অমিল আছে। দেহরক্ষীদের গায়ের রঙ কালো নয়, তামাটে। তারাও দীর্ঘদেহী, হিংস্র ডাকাত বা খুনীর মত দেখতে,

তবে কুৎসিত নয়। গালাদের তুলনায় সংখ্যায় তারা নগণ্য, এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তারা অ্যানির মনে কোন রকম নিরাপত্তা বা স্বস্তি বোধ ফিরিয়ে আনতে পারল না, ড্রাইভারের হ্যাচ গলে তাড়াতাড়ি নিতম্বিনীর পেটে নেমে এল সে, স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে হেলে-দুলে এগোল নিতম্বিনী। খানিক পরই ট্র্যাকটা খুঁজে পেল অ্যানি, নদীর কিনারা ঘেঁষে গিরিসংকটের ধূসর পাথুরে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেছে। সে জানে, ঘোড়সওয়ারদের দীর্ঘ মিছিল পিছু নিয়েছে। কিন্তু এক লাফে তার মন চলে গেছে গিরিখাদের নীচে, ওখানে অপেক্ষা করছে রানা আর মাইকেল। হঠাৎ করে যেন ওরা দু'জন তার গোটা অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়াল। দু'জনকে, কিংবা দু'জনের যে-কোন একজনকে নিজের পাশে পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল মনটা, ব্যাকুল ভাবটুকু স্টিয়ারিং-হুইল ধরা আঙুলের মাথায় সাদা হয়ে ফুটে উঠল।

গিরিখাদ বেয়ে উঠবার চেয়ে নামাটা আরও বেশি আতংককর অভিজ্ঞতা। প্রায় খাড়া বিস্তৃতির এক মাথা থেকে আর্মারড কার খসে পড়ল আরেক মাথায়, প্রতিবার শিউরে উঠল তলপেটের ভিতরটা। একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি, ঠাণ্ডা ঘামে নেয়ে উঠল সে। সামনে আরেকটা ঢাল, মাথায় উঠে একদিকে কাত হয়ে গেল আর্মারড কার, কিনারা খানিকটা দূরে থাকতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ব্রেক করল অ্যানি, কারণ কিনারার পর কী আছে দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু দেরি করে ফেলল, সামনের চাকা দুটো নেমে গেল কিনারা থেকে। উল্টে যাচ্ছে আর্মারড কার, ডিগবাজি খাবে। কিনারা থেকে প্রায় চার ফুট ঝপ্

করে নেমে গেছে পাথুরে পাঁচিল, তারপর আবার শুরু হয়েছে আরেকটা ঢাল। উঠবার সময় কোন সমস্যা হয়নি, কারণ ঢাল আর নিচু পাঁচিলের গোড়ায় প্রিন্সের শ্রমিকরা মাটি ফেলে রেখেছিল। জলপ্রপাতের একটা দিকভ্রান্ত ধারা কখন কে জানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব।

উল্টে পড়ল না আর্মারড কার, পিছনের চাকাগুলোও প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সঙ্গে পাঁচিল থেকে নীচের ঢালে নামল। আর তারপরই শুরু হলো নিয়ন্ত্রণহীন পতন। পাঁচিলের নীচে ঢাল খুব বেশি খাড়াভাবে নেমে গেছে, পাথরের উপর ভেজা মাটিতে পিছলে গেল চাকা। মরিয়া হয়ে ব্রেক করল অ্যানি, চাকা না ঘুরলেও পিছলে নেমে যাওয়া বন্ধ হলো না। স্টিয়ারিং ঘুরিয়েও লাভ হলো না, খুব একটা সাড়া দিল না সামনের চাকা।

সামনের বাঁকে পৌঁছে গেল নিতম্বিনী, সামনাসামনি সংঘর্ষ হলো পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে। একেবারে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে মাথাটাকে চারপাশ থেকে বেড় দিয়ে রাখল অ্যানি, ফলে ইস্পাতের সঙ্গে ঠুকে গিয়ে খুলিটা ফাটল না। দাঁড়িয়ে পড়েছে আর্মারড কার, সেটাকে পিছিয়ে এনে বাঁক ঘুরল সে। বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

দুপুরের খানিক পর গিরিসংকটের বেশির ভাগটা পেরিয়ে এল অ্যানি। মনে আছে, বাকি অংশটুকু আরও বিপজ্জনক। এখান থেকে সগর্জনে ধাবিত নদীর অনেক উঁচুতে পাথুরে পাহাড় প্রাচীরের গায়ে ঝুলে আছে পথটা। স্টিয়ারিং হুইল যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, শক্ত করে ধরে রাখতে গিয়ে তার হাত আর পিঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠল, যেন লোহার হাত দিয়ে খামচে ধরেছে কেউ। ভিজে চুল আর কপাল থেকে নেমে এসে চোখে পড়ল ঘামের ফোঁটা। হাতের উল্টোপিঠ

দিয়ে চোখ মুছে নতুন আরেকটা ঢালে নামবার জন্য জোরে ব্রেক করল অ্যানি, সেই সঙ্গে ত্রিশ ডিগ্রী বাঁকটা ঘুরতে শুরু করল।

পাথর আর আল্‌গা মাটি ঝাঁক ঝাঁক পাখির মত বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড চাকাগুলোর পিছন থেকে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল আর্মারড কার। খানিকটা পথ নামবার পরই আতংকের সঙ্গে উপলব্ধি করল সে, গাড়ির উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ধীরে ধীরে একপাশে সরে যাচ্ছে নিতম্বিনী। সামনের চাকা কার্নিসের মাঝখানেই রয়েছে এখনও, কিন্তু পিছন দিকটা কার্নিসের কিনারা ছোঁয় ছোঁয়।

বিপদটা টের পেল অ্যানি আরও পরে, যখন পিছনের একটা চাকা কার্নিসের কিনারা থেকে সামান্য নেমে গেল একশো ফুট নীচে খরস্রোতা নদীর দিকে। আতংকে কেঁদে ফেলল সে, কারণ সামনের চাকা গাড়ির পিছনের অংশকে কিনারা থেকে টেনে তুলতে পারছে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অ্যানি বুঝতে পারল কী ঘটছে। খসে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নগণ্য ভারসাম্যের উপর স্থির হয়ে রয়েছে আর্মারড কার, ইতস্তত করছে। পুরোপুরি ভারসাম্য হারাতে আর হয়তো এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ই যথেষ্ট। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করল অ্যানি। ব্রেক পেডাল থেকে পা সরাল সে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যে দিকে গড়াতে চাইছে চাকা সেদিকেই গড়াতে দিল, পরমুহূর্তে পা-টা বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল থ্রটলের উপর।

একটা চাকা ঝুলে থাকল শূন্যে, ফুল পাওয়ার পেয়ে এঞ্জিন গর্জে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চাকা পাথর কামড়ে ঘুরতে শুরু করল, ইস্পাতের খোলটা সন্ত্রস্ত হরিণের মত লাফ দিল, ঝাঁকি খেয়ে উঠে এল পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে। সরাসরি

উল্টোদিকের পাঁচিলে ধাক্কা খেল নিতম্বিনী, মাটি আর পাথরে বাড়ি খেয়ে ঘুরে গেল নাক, ভোজবাজির মত পথের উপর সিধে হয়ে গেল আবার ওটা।

কার্নিস থেকে উঠে আসবার পর আর তেমন কোন অসুবিধে হলো না। চওড়া একটা ঢালের মাথায় গাড়ি থামাল অ্যানি, হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে দেখে অপ্রতিভ বোধ করল সে। কিছুক্ষণের জন্য নিরিবিলি একটা জায়গা দরকার ওর, রাস্তা থেকে দূরে কোথাও। অসহ্য আতংকের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, ফলে শারীরিক নিয়ন্ত্রণগুলো দুর্বল আর শিথিল হয়ে পড়েছে−যেমন, বমি চেপে রাখা খুব বেশিক্ষণ সম্ভব হবে না।

গালাদের অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে অ্যানি। হাত-পা, হাঁটু ও কনুইয়ের সাহায্যে খাদের গা বেয়ে উঠবার সময় তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পেল সে। পাথুরে ট্র্যাকে অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে হেঁটে আসছে ঘোড়াগুলো। খানিকটা উঠবার পর বড় আকারের কয়েকটা সেডার গাছ দেখতে পেল সে, নীচে কাঁটাঝোপও রয়েছে−ওখানে তার একা হওয়ার একটা সুযোগ আছে।

গাছগুলোর ভিতর স্বচ্ছ মিষ্টি পানির একটা ঝর্ণা রয়েছে। বমি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার পর পাথুরে কিনারায় উবু হয়ে বসল অ্যানি, আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখ আর ঘাড় ধুলো। কয়েক মুহূর্ত পানিতে হাত দিল না, স্থির পানির গায়ে নিজের চেহারা দেখল, আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক করে নিল সোনালি চুল, বোতাম লাগাল ব্লাউজের!

চরম ভীতির প্রতিক্রিয়ায় মাথার ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, বাস্তবতা আর বর্তমান থেকে একটু যেন দূরে সরে রয়েছে সে।

সেডার বন থেকে বেরিয়ে এল, নেমে এল ট্র্যাকের উপর যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মারড কার। অশ্বারোহী গালারা পৌঁছে গেছে, গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, পিছনের ট্র্যাকে আধ মাইল পর্যন্ত লম্বা ঘোড়সওয়ারদের বিশৃঙ্খল মিছিল। আর্মারড কারটাকে ঘিরে মানুষ আর ঘোড়ার নিরেট একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে।

গাড়ির সবচেয়ে যারা কাছে, ইতিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে তারা। ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগোল অ্যানি, পথ না পেয়ে বার বার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সে এগোতে চাইছে বুঝতে পেরেও গালা সৈনিকরা সহজে সরল না, শেষ পর্যন্ত যদিও বা সামান্য সরল, সদ্য তৈরি সরু ফাঁক গলে একজন মানুষের পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। দুই কাঁধে ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকমে এগোতে চেষ্টা করল অ্যানি।

বুকের ভিতরটা ধুকধুক করছে, প্রিন্সের হারারি দেহরক্ষীরা কাছে-পিঠে কোথাও নেই বুঝতে পের হৃৎপিণ্ড জোরে ঢাক পিটাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, পায়ে জোর পাচ্ছে না, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এল গিরিখাদের ভিতর। অ্যানির চারপাশে গালারাও কেউ নড়লো না বা শব্দ করল না। অসহায় একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বর্বর একদল জংলী যোদ্ধা। অ্যানি দেখল, তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা গালাদের মধ্যেও কেমন উত্তেজনার ভাব। কুৎসিত কদাকার চেহারায় নগ্ন লালসা, আর সরু ফাটলের মত চোখে শকুনের তীব্র প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে আছে তারা। কাল রাতে বুড়িটা যখন পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছিল, তখনও তাদের চোখে ঠিক এই

দৃষ্টিই দেখেছে অ্যানি।

দেহরক্ষীরা কোথায়? তারা আসছে না কেন? দিশেহারা অ্যানি এবার উন্মত্ত অস্থিরতার সঙ্গে চারদিকে তাকাতে শুরু করল পরিচিত একটা মুখের খোঁজে। আর ঠিক তখন গিরিখাদের অনেক নীচে থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে বুঝল অ্যানি, তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে দেহরক্ষীরা। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। চিরশত্রু গালারা সংখ্যায় বারোশো, আর দেহরক্ষীরা গোটা পঞ্চাশ। গালারা তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছে তাদের।

সে একা, বুঝতে পেরে কান্না পেল অ্যানির। মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে যাবে। কিন্তু দেখল খাদের গা বেয়ে উঠবার রাস্তাও বন্ধ। পিছনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, নিশ্ছিদ্র ভিড় ঘিরে ফেলেছে তাকে। বৃত্তটা এবার ছোট করে আনছে গালারা, দীর্ঘ বিরতি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তারা। সবার চেহারায় সেই একই নগ্ন লালসা ফুটে আছে।

পিছু হটবার উপায় নেই, সামনেই এগোতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগোতে বাধ্য করল সে নিজেকে। একটা করে পা ফেলে অ্যানি, আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন গালা তার সামনে চলে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। সে ভয় পেয়েছে, এটা বুঝতে দেওয়া চলবে না, জানে অ্যানি। ওর চেহারায় ও আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ পেলে শেষ মানসিক বাধাটা কাটিয়ে উঠবে লোকগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর, টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যাবে। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল—তার ফর্সা নগ্ন শরীর পাথুরে মাটিতে লম্বা হয়ে আছে, হাজারটা লোকের খেলার সামগ্রী। ছবিটা মন থেকে মুছে

ফেলে ধীরে ধীরে এগোল অ্যানি। প্রতিবার, একেবারে শেষ মুহূর্তে, প্রতিটি দীর্ঘদেহ সরে গেল সামনে থেকে, কিন্তু তার পিছনে সব সময় আরেকজন আছে জায়গাটা দখল করবার জন্য। ভিড়টা চারদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় ওর ঘাড়ের উপর। বছরে এক-আধবারও বোধহয় গোসল করে না গালারা, পাঁঠা-পাঁঠা গন্ধে বমি পেল অ্যানির। তাদের উগ্র কামনার আঁচ সারা শরীরে উত্তপ্ত ছ্যাঁকার মত অনুভব করল সে। উত্তেজনায় গালারা হাঁপাচ্ছে, ঘামে ভেজা চকচকে মুখগুলোয় নিঃশব্দ হাসি, সরু চোখের নির্লজ্জ দৃষ্টি অ্যানির শরীরে ধারাল নখের মত বিঁধছে।

হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখল অ্যানি, সামনে পা ফেলবার জায়গা নেই। এ লোকটা যেন সবার চেয়ে লম্বা, চেহারায় মারমুখো ব্যঙ্গ, স্যাঁৎ করে অ্যানির একেবারে মুখের সামনে চলে এল সে, কোমরে হাত দিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে পথরোধ করে দাঁড়াল। লোকটাকে আগেও দেখেছে অ্যানি, গালাদের একজন সর্দার। গাঢ় নীল আলখেল্লা গলা পেঁচিয়ে নেমে এসেছে পায়ের পাতায়। মাথার চুল আঁকাবাঁকা তার, ফুলে-ফেঁপে কাকের বাসা হয়ে আছে, প্রায় ঢেকে রেখেছে সরু নিষ্ঠুর মুখটাকে, ডান চোখের বাইরের দিকের কোণ থেকে চোয়াল পর্যন্ত নেমে এসেছে শুকনো ক্ষতচিহ্ন।

নোংরা একটা ইঙ্গিত করে নিজের ভাষায় কিছু বলল লোকটা, খসখসে গলা। একটা শব্দও বুঝল না অ্যানি, তবে অর্থটা পরিষ্কার। তার চারদিকের ভিড় নড়ে উঠল, যেন মোচড় খেলো বিশাল একটা অজগরের দেহ। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল অ্যানি, ওকে ঘিরে থাকা বৃত্তটা আরও ছোট হয়ে এল। তার কানের কাছে হেসে উঠল এক লোক, আওয়াজটার মধ্যে কুৎসিত এমন একটা কিছু রয়েছে, প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল অ্যানিকে।

চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তার। ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়ায়, হাত-পা ছুঁড়ে আর নখ দিয়ে খামচে মুক্ত করে নিজেকে। কিন্তু জানে, সেই অপেক্ষাতেই আছে লোকগুলো। সামান্য উসকে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর চড়াও হবে ওরা। সমস্ত মনোবল আর অবশিষ্ট আত্মবিশ্বাস জড়ো করে গলায় তুলল সে, 'পথ ছাড়ো!' স্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠে বলল। সামনের লোকটা আধবোজা চোখে হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই, তার একটা হাত আলখেল্লার ভিতর গলিয়ে দিল লোকটা, তলপেটের নীচে। একটা ফিতে ধরে টান দিল সে, আলখেল্লা ফাঁক হয়ে যাওয়ায় কোমরের নীচেটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। হাত দিয়ে এমন অশ্লীল একটা ভঙ্গি করল সে, কুঁকড়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেল অ্যানি, চামড়া পুড়িয়ে মুখে আর গলায় উঠে এল গরম রক্তস্রোত। তার গলা কেঁপে গেল, আগের সেই দৃঢ়তা নেই, 'ইউ বাস্টার্ড! ইউ ফিলদি বাস্টার্ড!' হাত বাড়াল লোকটা, তার আলখেল্লা এখনও খোলা। অ্যানির হাঁটু আর শিরদাঁড়া সামান্য বাঁকা হয়ে গেল, কুঁজো হয়ে পিছিয়ে এল সে, কিন্তু পিছনের ভিড় থেকে কয়েক জোড়া হাত পিঠে ধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠাল আগের জায়গায়।

এই সময় আরেকটা গলা ভেসে এল। কথাগুলো নগণ্য, কিন্তু লোহার উপর করাত চালানোর মত সুর। 'ঠিক আছে, খতম করো। যথেষ্ট বেয়াদপি হয়েছে!'

অ্যানি অনুভব করল তার চারদিকে ভিড়ের চাপ শিথিল হলো। ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে, গলা বেয়ে উঠে এল অদম্য একটা কান্না।

খাদের ঢাল বেয়ে হেঁটে আসছে মাইকেল সেভারস, তার সামনে মানুষের নিরেট পাঁচিল ভোজবাজির মত ফাঁক হয়ে গেল।

তার আচরণে কোন রকম মারমুখো ভাব নেই, হেঁটে আসছে প্রায় অলস ভঙ্গিতে, বুকখোলা সাদা শার্টের সঙ্গে গলায় বহুরঙা একটা রুমাল জড়িয়েছে সে। কিন্তু তার মুখের ভাব জীবনে কখনও ভুলবে না অ্যানি। মাইকেলের নাকের দুই ফুটো বরফের মত সাদা, নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বলছে দুই চোখে।

ভাব দেখে বোঝা গেল মাইকেলের দিকে ছুটবে অ্যানি, ফুঁপিয়ে উঠবে পরম স্বস্তিতে, এই সময় আবার তার কর্কশ গলা শুনতে পেল সে, 'ধীরে। বিপদ এখনও কাটেনি।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করল অ্যানি, চিবুক উঁচু করল, সবেগে বেরিয়ে আসবার আগে দমন করল কান্নাটাকে।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল মাইকেল, নীল আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী গালা সর্দারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সরল একটা রেখা ধরে সোজা তার দিকে হেঁটে আসছে। কাছাকাছি এসে অ্যানির বাহু ধরল সে। তার হাতের ছোঁয়া ব্লাউজের নরম কাপড় ভেদ করে সঞ্জীবনী সুধার উষ্ণ স্রোত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অ্যানির সারা শরীরে, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ আর মনোবল ফিরে পেতে শুরু করল সে, জোর পেল হাঁটুতে।

ঘাড় ফিরিয়ে গালা সর্দারের দিকে তাকাল মাইকেল, তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরল। নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ল না লোকটা। অ্যানির মনে হলো, যুগ যুগ ধরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কারও চোখে পলক পড়ছে না। কিন্তু ওদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি আর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষামাত্র পাঁচ সেকেন্ড স্থায়ী হলো। চোখের পাতা কেঁপে উঠল সর্দারের, আড়চোখে পাশে তাকাল সে, দুর্বল গলায় ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল, ঘুরে গিয়ে হেঁড়ে গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করল পাশে দাঁড়ানো

লোকটাকে।

কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে সদ্য তৈরি ফাঁকটা গলে আর্মারড কারের সামনে চলে এল মাইকেল। ‘গাড়ি চালাতে পারবে তো?’ শান্ত সুরে প্রশ্ন করল সে, অ্যানির কোমরে হাত রাখল, তুলে দিল তাকে নিতম্বিনীর মাথায়।

‘এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, ব্যাপারটা এইমাত্র খেয়াল করল সে। স্টার্ট দেওয়ার জন্য ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরানোর ঝুঁকি এখন ওরা নিতে পারে না।

‘ঢালের মাথায় রয়েছে গাড়ি,’ বলল মাইকেল, ঘুরে গিয়ে গালাদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল, ঠেকিয়ে রাখল ভিড়টাকে। ‘গড়িয়ে দিলেই স্টার্ট নেবে।’

ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে নীচে নামছে অ্যানি, দুই ঠোঁটের মাঝখানে সাবলীল ভঙ্গিতে একটা চুরুট ঢোকাল মাইকেল, বারুদে ঘষে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। তার ছোট্ট এই আচরণটুকু অল্প দু'এক সেকেন্ডের জন্য বৈরী গালাদের মনোযোগ কেড়ে নিল, তারা তাকিয়ে থাকল ওর হাতের দিকে। চুরুট ধরাল মাইকেল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল নীলচে ধোঁয়ার লম্বা একটা টিউব, ভিড়টার কাছে পৌঁছে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নাক টেনে তামাকের গন্ধ নিল লোকগুলো।

মাইকেলের পিছনে গড়াতে শুরু করল আর্মারড কার, না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিল সে, শরীরটা ঘুরে যাচ্ছে। আর্মারড কারের একটা লোহার আঙটা ঠেকল হাতে, মুঠোর ভিতর নিল সেটা, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির মাথায়, চুরুট কামড়ে ধরে এখনও তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল নিতম্বিনী, গতি দ্রুত বাড়ছে, তাল সামলে নিয়েই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কপালে একটা হাত তুলে গালাদের স্যালুট

করল মাইকেল। বিরতিহীন দু'মাইল নামল আর্মারড কার, দু'জনের মধ্যে কোন কথা হলো না।

অ্যানির পিছনে আর উপরে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল; সামনের ট্র্যাকের উপর চোখ রেখে অ্যানি বলল, 'তুমি এমনকি ভয়ও পাওনি!'

'নীল হয়ে গিয়েছিলাম, ওল্ড গার্ল। চারদিকে শুধু সর্ষে ফুল দেখছিলাম।'

'আর আমি কিনা তোমাকে কাপুরুষ বলেছি।'

'তা-ও সত্যি।'

'এত তাড়াতাড়ি ওখানে তুমি পৌঁছুলে কীভাবে?'

'শিফটাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তো, কী? পাহাড়ে উঠেছিলাম ডিফেন্সিভ পজিশন খুঁজতে। দেখলাম তোমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা পালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম দেখি তো কী ব্যাপার।'

অ্যানির সামনের ট্র্যাক চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল, অকস্মাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো সে। কীভাবে কী ঘটল বলতে পারবে না, হঠাৎ দেখল মাইকেলের আলিঙ্গনের ভিতর রয়েছে সে, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাইকেলের গায়ে চেপে ধরেছে নিজেকে, অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর থরথর কাঁপছে। 'ওহ্ গড, মাইকেল! জানি না তোমার এই ঋণ কীভাবে শোধ করব আমি!'

'আমি নিশ্চিত, দু'জন মিলে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলব,' বিড়বিড় করে আশ্বাস দিল মাইকেল, অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে উষ্ণ আলিঙ্গনের ভিতর টেনে নিয়েছে অ্যানিকে, পুলকের উৎস আর নিরাপদ আশ্রয় বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে তাকে। অ্যানি উপলব্ধি করল, মাইকেলের এই দৃঢ় বাহুবন্ধন কখনোই সে এড়িয়ে

যেতে চায়নি। মাইকেলের ঠোঁটের দিকে ঠোঁট তুলল সে, মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল পরিচিত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির বদলে এমন একটা স্নেহকোমল ভাব ফুটে রয়েছে মাইকেলের চোখে, যা কখনও সম্ভব বলে আশা করেনি সে।

মাইকেলের ঠোঁট আরও একটা চমক–গরম আর কোমল, পুরুষ-পুরুষ স্বাদ, তার সঙ্গে মিশে আছে তামাকের কড়া সৌরভ। আগে কখনও বোঝেনি সে, মাইকেল এতটা লম্বা আর তার শরীর লোহার মত শক্ত বা হাত দুটো এত শক্তিশালী। শেষ একবার ফুঁপিয়ে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল অ্যানি, ঢিল দিল পেশীতে, শক্ত বাঁধনের ভিতর কেঁপে উঠল নরম তুলতুলে শরীর, রোমাঞ্চ আর পুলকের উৎসমুখ বিস্ফোরিত হলো–আলিঙ্গনের ভিতর নেতিয়ে পড়ল অ্যানি, ভালোবাসা আর আদর পাবার জন্য কাঙাল শরীরটা অবশ হয়ে গেল।

মাত্র এক কি দুই মুহূর্তের জন্য হলেও, শারীরিক চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করবার সন্ধিক্ষণে, রিপোর্টার মেয়েটা তার এই আকস্মিক আবেগের কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করল। তার মনে হলো, নিদ্রাহীন গতরাতের চরম বীভৎসতা, ক্লান্তি ও দিনের আতংকই এই প্রচণ্ড আবেগের উৎস। এরপর আর কারণ অনুসন্ধানে তার আগ্রহ থাকল না, আবেগটাকে স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়তে দিল সারা শরীরে।

দুই

সারডি গিরিসংকটের পাদদেশে, অ্যাকেইশা বনভূমির চার মাইল পরিধি নিয়ে তাঁবু ফেলেছে বৃদ্ধ কামাল হাসানের বাহিনী, পাহাড়চূড়া থেকে দেখে মনে হবে গোটা এলাকা যেন পিঁপড়ে ভর্তি বিশাল একটা পিরিচ, জ্বালানী কাঠের নীলচে ধোঁয়ায় এরইমধ্যে নিজেদের আড়াল করেছে তারা, মানুষ আর পশুর বর্জ্যপদার্থের দুর্গন্ধ ভারি করে তুলেছে পাহাড়ী বাতাস।

রানা আর মাইকেলের ক্যাম্প খানিকটা তফাতে, আলাদাভাবে চেনা যায়। এদিকে বনভূমি আরও গভীর, ফলে ছায়াও ঘন। ক্যাম্পের মাথার উপর পাথুরে জলপ্রপাত, নীচের সমতল প্রান্তরে নামবার আগে এটাই সারডি নদীর সর্বশেষ খাড়া পতন। ক্যাম্পের কাছে ছোট্ট, অস্থির একটা ডোবা তৈরি হয়েছে, এই ডোবায় ডুব দিয়ে শরীরের সমস্ত ধুলো-ময়লা ধুয়ে মনটাকে তাজা করে নিল অ্যানি উইসপার।

ভিজে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে, ঢালু পাড় বেয়ে যখন সে ক্যাম্পে ফিরল, চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যা নেমেছে। ক্যাম্প ফায়ারের গনগনে আগুনের পাশে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে রয়েছে মাইকেল। সদ্য চামড়া ছাড়ানো একটা বাচ্চা ষাঁড় কয়লার আগুনে ভাজা হচ্ছে। সরে বসে অ্যানিকে জায়গা করে দিল সে, হাতে ধরিয়ে দিল পানি মেশানো হুইস্কির মগ। কৃতজ্ঞচিত্তে সেটা গ্রহণ করল অ্যানি, চুমুক দেওয়ার পর মনে হলো হুইস্কির স্বাদ আর কখনও এত ভাল লাগেনি তার।

নিস্তব্ধতার মধ্যে একসঙ্গে বসে থাকল ওরা, পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে অথচ ঠিক ছুঁয়ে নয়, নরম শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে উপভোগ করল পরস্পরের সান্নিধ্য আর আফ্রিকান রাত্রির দ্রুতগতি আগমন। ওরা একা, ওদের নীচে আদিবাসীদের তাঁবুগুলো থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কল-গুঞ্জন ওদের একাকীত্বকে আরও যেন অর্থময় আর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলল।

রানা, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান কামাল হাসান আর আব্বাস খায়ের দুটো আর্মারড কার নিয়ে শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানবার জন্য ওয়েলস অভ চাল্ডিতে ফিরে গেছে। উট আর ঘোড়ায় চড়ে কিছু আদিবাসীও গেছে ওদের সঙ্গে। সময় কম, একসঙ্গে দুটো কাজ সারবে রানা—আদিবাসী যুবকদের ভিকার্স মেশিনগান চালানো শেখাবে। মাইকেল, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে, গিরিখাদ সার্ভে করবার দায়িত্ব নিয়ে রয়ে গেছে। আদিবাসীরা যদি পিছু হটতে বাধ্য হয়, গিরিসংকটে ওঠা ছাড়া তাদের কোন পথ নেই, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য দীর্ঘ একটা সময় শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য সমতল প্রান্তরে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা না হলে পালাতে গিয়ে শয়ে শয়ে মারা পড়বে আদিবাসীরা। পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে রণকৌশল স্থির করছিল মাইকেল, এই সময় প্রিন্স সালের দেহরক্ষীদের পালাতে দেখে সে।

ওদের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাহাড়গুলো, মাথার উপর হঠাৎ অত্যন্ত কালো হয়ে ওঠা আকাশটাকে প্রায় অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। সামনে আগুন, পাশে শক্তিশালী পুরুষ, অ্যানির মনে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়ার ও নিজেকে নিঃশর্তে সঁপে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য একটা অনুভূতি জাগল, যেন ভাগ্য স্বয়ং এই বিশেষ মুহূর্তটির আয়োজন করেছে, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ।

নির্জন নিরিবিলিতে একা হতে চেয়েছে বলেই ওরা একা, দু'জনের একান্ত ইচ্ছার ফসল। গালাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর মাইকেলের স্পর্শে যে শারীরিক উত্তেজনা আর আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা জেগেছিল তা এখনও অ্যানির দেহ-মনে বাসা বেঁধে আছে।

ভাজা মাংস অল্পই খেলো অ্যানি, প্রায় কোন স্বাদই পেল না, একবারও তাকাল না পাশে বসা পুরুষটির দিকে, স্বপ্নভরা চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াল গাঢ় চূড়াগুলোর মাথায় মুক্তোর মত সাদা দ্যুতি নিয়ে জ্বলতে থাকা নক্ষত্রগুলোর উপর, যদিও পাশে তার উপস্থিতি আর নৈকট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন–এত কাছে যে পরস্পরকে এখনও তারা স্পর্শ না করলেও মাইকেলের গায়ের আঁচ অ্যানির বাহুতে যেন মরুবাতাসের কোমল আদর বুলিয়ে দিল। মাইকেলও চুপচাপ, তাকিয়ে আছে অ্যানির দিকে, আর অ্যানি তার দৃষ্টি নিজের শরীরে অনুভব করতে পারছে। মাইকেলের দৃষ্টি এতোই প্রখর আর এমনই গভীরভাবে ছুঁয়ে গেল, সে সচেতন নয় এই ভান করা আর সম্ভব হলো না। মুখ ফেরাল অ্যানি, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল মাইকেলের চোখে।

গনগনে আগুনের গাঢ় আভায় বয়সের ছাপগুলো মাইকেলের চেহারায় ফোটেনি, লালচে-সোনালি চুলে চকচকে ভাব এনে দিয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল অ্যানির, তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো এত সুন্দর পুরুষমানুষ জীবনে কখনও দেখেনি সে। মনের জোর খাটিয়ে চোখ সরাতে হলো।

উঠে দাঁড়ল অ্যানি, ধীর পায়ে হেঁটে এল, অনুভব করল বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, যেন খাঁচা ভেঙে পালাতে চাইছে উন্মত্ত একটা পশু, দুই কানে রক্তের গর্জন শুনতে পাচ্ছে

সে।

তার তাঁবুর ভিতর ক্যানভাস ভেদ করে ঢুকে পড়েছে ক্যাম্প ফায়ারের কোমল আভা। ল্যাম্প জ্বালল না, আধো অন্ধকারে কাপড় ছাড়ল, অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে দিল সেগুলো প্রবেশ পথের পাশে ফোল্ডিং চেয়ারটার দিকে। সরু খাটিয়ার উপর লম্বা হয়ে শুলো সে, নগ্ন পিঠ আর নিতম্বে কর্কশ লাগল উলেন চাদরটা। প্রতিটি নিঃশ্বাস এখন কষ্টকর অভিজ্ঞতা, শরীরের দু'পাশে মুঠো করা শক্ত হাত নিয়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে পড়ে থাকল সে—ভয় ভয় করছে, আবার উল্লসিতও বটে—নিঃসঙ্গ বালিশ থেকে মাথা তুলে নিজের শরীরটা দেখল, যেন এর আগে কখনও এটার উপর এতো সচেতন মনোযোগ ছিল না তার।

আসতে দেরি করল মাইকেল, আবার এতো দেরি করল না যাতে অধৈর্য হয়ে ওঠে অ্যানি। তার পায়ের শব্দ পেল অ্যানি, কাঁকরের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। দম বন্ধ হয়ে এল, আকস্মিক আতংকের সঙ্গে ভাবল নিঃশ্বাস আটকে মারা যেতে পারে সে। এই সময় তাঁবুর পর্দা এক ঝটকায় ফাঁক হয়ে গেল, ঝুঁকে ভিতরে ঢুকল মাইকেল, পিছনে আবার ঝুলে পড়ল পর্দাটা।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে ঢাকল অ্যানি, একটা হাত উঠে এল বুকের উপর, অপর হাতটা নেমে গেল তলপেটের নীচে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল মাইকেল, আগুনের আভায় আলোকিত ক্যানভাসের গায়ে মানুষের একটা কাঠামো। আবার নিয়মিত হলো অ্যানির শ্বাস, তবে দ্রুতগতি আর সংক্ষিপ্ত। তার মনে হলো অনন্তকাল ধরে ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, বোবা ও সতর্ক প্রহরী। তার বাহু আর ঊরুতে ধীরগতি দৃষ্টি অনুভব করল সে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। তারপর বোতাম খুলে শার্টটা

মেঝেতে ফেলে দিল মাইকেল, আগুনের ম্লান আভায় ভিজে মার্বেল পাথরের মত লাগল নগ্ন পেশীগুলো।

অবশেষে অ্যানির বিছানার কাছে সরে এল মাইকেল, তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল। দুই হাত তুলে মাইকেলকে ধরল অ্যানি, টেনে আনল নিজের উপর।

গভীর রাতে একবার মাত্র ঘুম ভাঙল অ্যানির, দেখল তাঁবুর বাইরে নিভে গেছে আগুন, তবে পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে উঠে এসেছে উজ্জ্বল সাদা বড় একটা চাঁদ, ওদের মাথার উপর ক্যানভাস ভেদ করে নেমে এসেছে ম্লান রূপালি শীতল আলো।

অদ্ভুত আলোটা মাইকেলের চেহারা থেকে সব রঙ নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। মুখটা এখন ম্লান, অনেকটা যেন মর্মরমূর্তি বা মড়ার মত। অ্যানির অনুভূতি আর উপলব্ধির জগতে আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। মনের গভীর তলদেশে ছোট্ট ভোঁতা একটা ভার অনুভব করল সে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখবার পর চিনতে পারল—অপরাধবোধ। আর ওই অপরাধবোধের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজকে অভিসম্পাত দিল সে। চাবুকের তীব্র কষাঘাত ব্যতীত একজন পুরুষকে ভোগ করতে পারবে না সে, প্রকৃতি যেভাবে চায় সেভাবে সে তার শরীরটাকে ব্যবহার করতে পারবে না, এ কোন্ সভ্যতায় বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে?

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে—পাশের ঘুমন্ত লোকটাকে যাতে বিরক্ত করা না হয় সে-ব্যাপারে সচেতন, ঝাড়া প্রায় দশ মিনিট ধরে খুঁটিয়ে দেখল মুখটা—অপরাধবোধের নতুন অনুভূতিটার গুরুত্ব আর গভীরতা বুঝবার চেষ্টা করল, মাপজোক করল মাইকেলের প্রতি তার ভালোবাসার পরিধি। ধীরে ধীরে সে

উপলব্ধি করল, দু'জন ওরা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে।

আশপাশে এমন কেউ নেই যে অ্যানির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, মাইকেলের প্রতি তার আবেগ আর অনুভূতিগুলোয় সত্যিকার কোন গভীরতা নেই। ভয় আর আতংকের জোয়ারে দিশেহারা বোধ করায় উদ্ধারকর্তা হিসাবে সামনে যাকে পেয়েছে তাকে সব দিয়ে ফেলবার বিশ্বাসঘাতক একটা প্রবণতাই এর জন্য দায়ী।

এই আবেগ আর অনুভূতির উৎস ভালবাসা নয় বলেই অপরাধবোধ জেগেছে তার মনে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলো না, নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল অ্যানি। দিশেহারা আর বিষণ্ন বোধ করল সে।

মাইকেলের দীর্ঘ শরীরের পাশে শুয়ে পড়ল আবার অ্যানি, তবে এবার সামান্য সরে গেছে সে, যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। তার জানা আছে, প্রেম করবার পর জগতের সব প্রাণীই বিষণ্ন বোধ করে–কিন্তু তার বিষণ্ন বোধ করবার পিছনে আরও কী যেন একটা কারণ আছে, যে-জন্য বেদনার একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে বুকে।

হঠাৎ, সঠিকভাবে জানে না কেন, মাসুদ রানার কথা ভাবল সে। আর সেই সঙ্গে দুঃখ-বেদনার শীতলতা ও গভীরতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। আবার ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো, জেগে উঠে দেখল ক্যানভাসে কড়া রোদ, বাইরে আর্মারড কার আর বহু লোকজনের আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল অ্যানি, চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে, ছোঁ দিয়ে চাদর তুলে বুক ঢাকল। চোখ-মুখ ফুলে আছে তার, শরীরে অদ্ভুত এক অলস ভাব। খাটিয়ায় একা সে, মাইকেল

কখন যেন চলে গেছে। পাশের উলেন চাদরটায় হাত রাখল অ্যানি, মাইকেলের গায়ের ছোঁয়ায় এখনও গরম হয়ে রয়েছে ফাঁকা জায়গাটা। আর রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যথা, অ্যানির হৃদয়ের গভীরে।

ব্যস্ত হাতে কাপড় পরে তাঁবু থেকে রোদে বেরিয়ে এল অ্যানি, হাত দিয়ে তখনও মাথার চুল ঠিকঠাক করছে, শোক মিছিলটাকে পৌঁছুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের গাড়িটা রানার, চঞ্চলা। চকচকে সাদার উপর গাঢ় লাল ক্রসচিহ্ন উধাও হয়েছে গা থেকে, তার বদলে অনুজ্জ্বল ধূসর রঙের উপর কালচে-সবুজ ক্যামোফ্লেজ দাগ টানা হয়েছে। মাউন্টিং থেকে তির্যকভাবে খাড়া হয়ে আছে ভিকার্স মেশিনগানের মোটা ব্যারেল। টারিটের উপর পতপত করে উড়ছে ইথিওপিয়ার জাতীয় পতাকা, পাশে তিন রঙা আরেক পতাকা কামাল হাসান বাহিনীর প্রতীকচিহ্ন বহন করছে—গাঢ় নীল মাঠের উপর সিংহের ঝলমলে সোনালি মাথা।

চঞ্চলার ঠিক পিছু পিছু আসছে টোলাইনে বাঁধা, ভাগ্যদেবী—আব্বাস খায়েরের আর্মারড কার—রঙ বদলানোর পর চঞ্চলার মতই চেহারা পেয়েছে ওটা, জোড়া পতাকা বাতাসে উড়ছে, প্রতিটি গান পোর্ট ভরে আছে আগ্নেয়াস্ত্রে। সব মিলিয়ে ওটাকে যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত সামরিক যান বলে মনে হলেও, পরিত্যক্ত আর বাতিল ভাবটুকু গোপন করা যায়নি। চঞ্চলা ওটাকে টেনে নিয়ে আসছে ক্যাম্পে, ওটার পিছন থেকে কর্কশ ধাতব যে আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে তা কানের পর্দা ফাটানোর জন্য যথেষ্ট, টিকতে না পেরে নিজের তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মাইকেল

সেভারস, কাপড় পরা তখনও শেষ করেনি, ড্রাইভারের হ্যাচে রানার মাথাটা উঁচু হতেই রাগতস্বরে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

'ঘটনাটা কী?'

রাগে লাল আর বিকৃত হয়ে আছে রানার মুখ। 'বুড়ো...!' উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারল না ও, আঙুল তাক করে গোত্রপ্রধান কামাল হাসানকে দেখিয়ে দিল।

তোবড়ানো, ভাঙাচোরা গাড়ির টারিটে সগর্বে বসে আছেন কামাল হাসান, চোহারায় কোন ক্ষোভ বা খেদের লেশমাত্র নেই, দাঁতহীন মাড়ি বের করে বেসুরো গলায় হাসছেন, তাকিয়ে আছেন মাইকেলের দিকে।

'ভিকার্স গানের এক হাজার গুলি ছুঁড়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি,' বলল রানা। 'ড্রাইভারের সিট থেকে আব্বাসকে লাথি মেরে সরিয়ে দেন, তারপর আমাদেরকে দেখান কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়।'

'ওহ্ মাই গড!' গুঙিয়ে উঠল মাইকেল।

'হাউ ডু ইউ ডু?' বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, মাইকেলের আর্তনাদটাকে প্রশংসাসূচক বলে ধরে নিয়েছেন।

'তুমি ওকে থামাওনি কেন?' ব্যাখ্যা দাবি করল মাইকেল।

'থামাব? খোদা! তেড়ে আসা গণ্ডারকে তুমি কখনও থামাতে পেরেছ? উপকূলের দিকে অর্ধেক পথ ধাওয়া করে তারপর নাগাল পাই ওঁর...।'

'ক্ষতি?'

'গিয়ারবক্স গেছে, ক্ল্যাচ পুড়েছে—এখনও ভাল করে দেখার সাহস হয়নি আমার।' হ্যাচ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামল রানা, চোখ থেকে খুলল ডাস্ট গগলস। ক'দিনের না কামানো দাড়ি আর মাথার চুল লাল হয়ে আছে ধুলোয়, চোখের চারপাশের চামড়া শুকনো সাদাটে ঘায়ের মত ম্লান আর নগ্ন দেখাল, চেহারায়

বিস্ময়াভিভূত ও নিরীহ একটা ভাব এনে দিয়েছে। হাত দিয়ে শার্ট আর ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়ছে ও, এখনও খেপে আছে বুড়ো কামাল হাসানের উপর। 'শুয়োরের ছানাকে কাদায় গড়াগড়ি খেতে দেখেছ? উনি ঠিক তাই করেছেন! শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্যে এভাবে কেউ দলবল নিয়ে যায় কখনও? হাসিটা চিনতে পারছ? বদ্ধ একটা উন্মাদ! বলতে পারো একটা সার্কাস পার্টির সাথে গিয়েছিলাম।'

এতক্ষণে অ্যানির উপর চোখ পড়ল রানার, আর সেই সঙ্গে সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল ওর, আনন্দে ঝিক্ করে উঠল চোখ দুটো। ধীরে ধীরে কালো মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল চেহারায়। সবই লক্ষ করল অ্যানি, কী ঘটছে বুঝতে পারবার আগেই মন জুড়ে ফিরে এল অপরাধবোধটা, তলপেটের ভিতর ঠাণ্ডা অসুস্থ একটা অনুভূতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

'অ্যানি!' ডাকল রানা। 'গড, তোমার জন্যে চিন্তায় ছিলাম আমি!'

আগুনের পাশে কফি বানাতে বসল অ্যানি, কাজে ব্যস্ততার কারণে অপরাধবোধ থেকে খানিকটা মুক্তি পেল। বাসি ভাজা মাংস গরম করে পরিবেশন করল সে, তারপর কেক বানাতে বসল। সকালের রোদ এখনও তেতে ওঠেনি, টেবিলটা ফেলা হলো গাছের ছায়ায়। চুলোর ধারে নিজের কাজে ব্যস্ত অ্যানি, টেবিলে বসে রিকনিসন্স্-এর ফলাফল ব্যাখ্যা করছে রানা।

যাবার পথে ভিকার্স মেশিনগান দিয়ে গাছ, পাথর, নদী, পাখি ইত্যাদি সামনে যা পড়েছে সবগুলোর উপর গুলি ছুঁড়েছেন কামাল হাসান। সঙ্গে গুলি ছিল প্রচুর, প্রায় শেষ করে ফেলেছেন তিনি। ঘুরপথ দিয়ে উত্তর দিকে পৌঁছায় ওরা, ধুলো এড়াবার জন্য

কলামের গতি কমিয়ে রাখে। উপত্যকার উপর চমৎকার একটা জায়গা দেখতে পায় ওরা, ওখান থেকে মাসাওয়া আর ওয়েলস অভ চান্ডির মাঝখানের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। রাস্তায় কিছু যানবাহন ছিল, বেশিরভাগ মালামাল পরিবহনে ব্যস্ত, কিন্তু ওখানে বেশিক্ষণ ওরা থাকতে পারেনি–কারণ, কামাল হাসান জেদ ধরেন গাড়িগুলোর উপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবেন তিনি। তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হলেও, ব্যাপারটা যুদ্ধজয়ের মত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রানার নেতৃত্বে পিছিয়ে আসে ওরা, পশ্চিম দিক থেকে কুয়ার দিকে এগোয়।

কফির মগে চুমুক দেওয়ার জন্য থামল রানা, আর মাইকেল ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল। আগুনের ধারে মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটা, গোলাপি মুখে কী ভাব বুঝবার উপায় নেই।

'আজকের ব্রেকফাস্ট কেমন আসছে, বলো তো, মাইডিয়ার ওল্ড চ্যাপ?' হঠাৎ সহাস্যে জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

শব্দগুলো নয়, নয় সম্বোধনও, মাইকেলের বলবার ভঙ্গি আর গলার সুরে এমন কিছু রয়েছে, ঝট্ করে অ্যানির দিকে তাকাল রানা। এই সুর একজন পুরুষ শুধু তার স্ত্রী বা তার মেয়েমানুষ প্রসঙ্গে ব্যবহার করে। এক সেকেন্ডের জন্য রানার চোখে স্থির হয়ে থাকল অ্যানির দৃষ্টি, তারপরই মাথা নামিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, আর রানা চিন্তিতভাবে ধূমায়িত মগের ভিতর তাকাল, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাস।

'কতটা কাছে যেতে পেরেছ তোমরা?' সহজ সুরে জিজ্ঞেস করল মাইকেল। রানা আর অ্যানির দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ করেছে সে। তার হাবভাবে কোন উদ্বেগ নেই, পেশী শিথিল, মনে তৃপ্তি–চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে দু'আঙুলের মাঝখানে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা চুরুট।

ধীরে ধীরে, প্রায় ফিসফিস করে বলে গেল রানা। অসমতল প্রান্তরে গাড়িগুলোকে রেখে পায়ে হেঁটে এগোয় ওরা। কামাল হাসান যাতে শিফটাদের খুব কাছাকাছি যেতে না পারেন সে-ব্যাপারে সতর্ক ছিল ও। একটানা প্রায় দু'ঘণ্টা শিফটা বাহিনীর উপর নজর রাখা হয়। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে তারা। পাহাড়শ্রেণী বরাবর তাদের মেশিনগান আর মর্টারের পজিশনও সুরক্ষিত। তাদের প্রস্তুতি আপাতত প্রতিরক্ষামূলক, কাজেই ওখানে তাদের উপর হামলা করা ওদের জন্য নেহাতই বোকামি হবে। যতক্ষণ তারা না এগোয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সদ্য তৈরি কেক নিয়ে টেবিলের পাশে উঠে এল অ্যানি, সে ঝুঁকে পড়তেই তার নিরাবরণ বাহুতে স্বাভাবিক আদরের একটা হাত রাখল মাইকেল। তাড়াতাড়ি সিধে হলো অ্যানি, দ্রুত পিছিয়ে গেল সেদ্ধ ডিম আনবার জন্য। ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে কোন রকম উত্থান-পতন ঘটল না।

ও চেয়েছিল গোটা এলাকাটা চারদিক থেকে একবার ঘুরে আসবে, তা হলে শিফটাদের পজিশনের উপর পিছন থেকে আক্রমণ করা সম্ভব কিনা জানা যেত। কিন্তু হঠাৎ করে বৃদ্ধ কামাল হাসান একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়েন, জেদ ধরেন কীভাবে গাড়ি চালাতে হয় তা তিনি ওদেরকে দেখিয়ে ছাড়বেন। 'মাই গড, খিদেতে মরে যাচ্ছি!' কেকে কামড় বসাল ও। 'তোমার এদিকের খবর কী, মাইকেল?'

'গিরিখাদের বাইরে নয়, ভেতরে চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশন দেখতে পেয়েছি আমি,' বলল মাইকেল। 'ঢালের ওপর মাটি খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি একটা দলকে। ভিতর দিয়ে

যাবার চেষ্টা করলে শিফটাদের কচুকাটা করব আমরা।'

'শিফটাদের উপর নজর রাখার জন্য কিছু লোককে স্কাউট হিসেবে রেখে এসেছি আমরা,' বলল রানা। 'প্রায় একশোর মত, আব্বাসের বাছাই করা। কুয়ার ওপর থেকে শিফটারা নড়লেই খবর পেয়ে যাব। কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা এগোবার আগে কতটা সময় পাচ্ছি আমরা। প্রস্তুতি নিতে আরও সময় দরকার আমাদের, তা হলে ট্যাকটিক্স সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারব, হারারি আর রাসটাদের ট্রেনিংও শেষ হয়ে আসবে...।'

চুলোর কাছ থেকে উঠে এসে ওদের সঙ্গে টেবিলে বসল অ্যানি। 'সময় তুমি পাবে না,' বলল সে। 'প্রস্তুতি তোমার যা নেয়ার এখুনি নিতে হবে।'

'তারমানে? এ-কথা বলছ কেন?'

'প্লেনে চড়ার আগে প্রিন্সকে আমি খুব চিন্তিত দেখেছি,' বলল অ্যানি। 'তার কারণ সে একটা গোপন মেসেজ পেয়েছে। মেসেজটা হলো, নিজের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে শিফটা বাহিনীকে তাগাদা দিয়ে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন সম্রাট হাইলে সেলাসি। তারমানে যে-কোন মুহূর্তে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এদিকে অ্যাডভান্স করবে শিফটারা। ধরে নাও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

ঠোঁট গোল পাকিয়ে শিস দিল রানা, গলা ফাটিয়ে বলল, 'হিয়ার উই গো!' মাইকেলের দিকে ফিরল ও। 'খবরটা তুমিই বরং কামাল হাসানকে দাও। একমাত্র তুমিই ওকে সামলাতে পারো।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে একটা ধাক্কা খেলাম,' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল মাইকেল।

'কামাল হাসানের কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারি। ছুটে গিয়ে সরাসরি আঘাত করতে চাইবেন তিনি। জানা কথা, সুযোগ দেয়া হলে নিজের বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন। ওঁকে

তোমার শান্ত রাখতে হবে।'

'কীভাবে তা সম্ভব বুদ্ধি দাও–মরফিন ইঞ্জেক্ট করব, নাকি লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারব মাথায়?'

'রামি খেলতে বসাও,' পরামর্শ দিল রানা। সেদ্ধ একটা ডিম মুখে পুরে চেয়ার ছাড়ল ও। 'নাস্তার জন্যে ধন্যবাদ, অ্যানি। যাই, দেখি, ভাগ্যদেবীর কী অবস্থা করেছেন কামাল হাসান।'

অ্যানি সাড়া দিল না, এমনকী মুখ তুলে ওর দিকে একবার তাকালও না। তবে চোখের পাতা ঘন ঘন কেঁপে উঠল তার, সামান্য আড়ষ্ট হয়ে গেল কাঁধ দুটো।

একটানা দু'ঘণ্টা কাজ করল রানা। ভাগ্যদেবীর গোটা গিয়ারবক্স খুলে আনতে হবে। বিশ গজ দূরে নিজের তাঁবুর বাইরে টেবিলে বসে রয়েছে অ্যানি, আপনমনে দ্বিতীয় রিপোর্টটা টাইপ করছে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও, একজন আরেকজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তবে প্রকাশ্যে নয়। ভুলেও কেউ একবার কারও দিকে তাকাল না।

অবশেষে কঠিন কাজটা শেষ করল রানা, সেটিং থেকে বের করে আনল গিয়ারবক্স। পিছিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে হাতের গ্রিজ মুছল, বলল, 'কফি ব্রেক।' হেঁটে আগুনের পাশে চলে এল ও, দুটো মগে কালো কফি ঢেলে টেবিলের সামনে থামল। 'কেমন হচ্ছে তোমার রিপোর্ট?' জিজ্ঞেস করল অ্যানিকে, টাইপরাইটারের সচল কাগজটার উপর চোখ বুলাল একবার। 'পুলিটজার আশা করা যায়?'

হেসে উঠল অ্যানি, হাত বাড়িয়ে কফির মগটা ধরল। 'পুরস্কার কখনও সেরা লোকটি পায় না।'

'কিংবা সত্যি যার দরকার,' সায় দেওয়ার সুরে বলল রানা,

অ্যানির উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল।

রানা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ায় রাগের চেয়ে বরং বিরক্তই বোধ করল অ্যানি। 'দেখো, রানা। তোমাকে বা আর কাউকে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই,' মৃদু, নরম সুরে বলল সে।

'ঠিক,' বলল রানা, 'ঠিক কথা। তুমি এখন আর ছোট্ট খুকিটি নও।' আমিও মাইকেল সেভারসের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, ভাবল রানা, কোনদিন ছিলামও না। মাইকেল যেদিন ওকে বলেছে, অ্যানিকে পেলে সে ভাল হয়ে যাবে, সেদিন থেকেই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে রানা। তবে মাইকেল এ-কথাও বলেছিল, কারও দান করা জিনিস সে নেবে না, নিতে হলে জিতে নেবে–তার মর্যাদা রক্ষার জন্যই এতদিন প্রতিযোগিতার বিশ্বাসযোগ্য ভান করে এসেছে রানা। এখন যখন প্রায় পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যানি আর মাইকেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, লোক দেখানো প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে পারে রানা। অবশ্য হঠাৎ করে এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না ওর, যাতে মাইকেল বুঝতে পারে এতদিন ভান করে এসেছে ও। অ্যানির মনেও কোন আঘাত দেওয়া চলবে না।

'আমার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে, ধর্মাবতার?' দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান নিয়ে মুখ তুলে তাকাল অ্যানি, কিন্তু রানার চোখের ভাব দেখে তার ভিতর ফণা তোলা রাগ মাথা নোয়াল।

'তোমার সাথে কোন রকম ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যেতে চাই না, অ্যানি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'একটা কথা তো ঠিক, তোমার যা ভাল মনে হবে তাই তুমি করবে।' শেষ চুমুক দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখল ও। 'উঠি, কাজ পড়ে আছে।'

‘একটুতেই হাল ছেড়ে দাও, তাই না?’ অ্যানির মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা, শব্দগুলো বেরুবার আগে বোঝেনি কী বলে ফেলেছে। ইচ্ছে হলো ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু ঢিল ছুঁড়বার পর আর কী সেটা ফেরে!

একটা চোখ কুঁচকে অ্যানিকে দেখল রানা, কিশোরসুলভ নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। ‘হাল ছেড়ে দিয়েছি?’ হা-হা করে হেসে উঠল এবার। ‘ওহ্ লেডি! তা যদি বিশ্বাস করো, আমার প্রতি অন্যায় করা হবে–ভয়ানক অবিচার করা হবে।’ টেবিল ঘুরে অ্যানির দিকে এগিয়ে এল ও, ঝুঁকল তার দিকে। চোখ থেকে হাসিটা নিভে গেল, ফিসফিস করে বলল, ‘তুমি সত্যিই খুব সুন্দর।’ একটু বুঝতে চায় রানা। মেয়েটা কি মাইকেলের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে?

‘রানা!’ অ্যানির চোখে পলক পড়ল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার মুখে। ‘ইচ্ছে হয় সব তোমাকে ব্যাখ্যা করি–কিন্তু নিজেকে আমি বুঝতে পারি না।’ আরও একটু ঝুঁকে অ্যানির চিবুক স্পর্শ করল রানা। ‘না, রানা, প্লিজ–না...,’ বলল অ্যানি, যদিও ঠোঁট সরাবার কোন চেষ্টা করল না, বরং রানার দিকে তুলে ধরল একটু। কিন্তু আর এক মিলিমিটারও এগোল না রানা। হঠাৎ শোনা গেল ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ, বনভূমির ভিতর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল ওরা, এখনও দু’জনের দৃষ্টি এক হয়ে আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পের সামনে চলে এল আব্বাস খায়ের, লাগাম টেনে পনি থেকে লাফ দিয়ে নামল, রুদ্ধশ্বাসে বলল, ‘মাসুদ ভাই, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! মাগরেব নদী পেরিয়ে শিফটাদের আরেকটা বাহিনী রওনা হয়ে

গেছে সেলাসি বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে! চান্ডির শিফটারা যে-কোন মুহূর্তে হামলা চালাবে এখন!'

'ঠিক সময়টিতে ভগ্নদূতের আগমন ঘটল,' বিড়বিড় করে বলল অ্যানি, ব্যঙ্গ আর কৌতুকের সুরে বলতে চেষ্টা করলেও, তার গলা সামান্য কেঁপে গেল, হাসিটা আড়ষ্ট।

'আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে, মাসুদ ভাই। গাড়িটা মেরামত করা দরকার। ওটা ছাড়া আমি লড়ব কীভাবে?' তার পিছু নিয়ে আসা একজন আদিবাসীর হাতে লাগামটা ধরিয়ে দিল আব্বাস। দাদু তাঁর সব ক'জন সর্দারকে নিয়ে পরামর্শসভা ডেকেছেন দুপুরে, বলে পাঠিয়েছেন আপনাকেও থাকতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেবীর দিকে হন-হন করে এগোল সে।

এক মুহূর্ত অ্যানির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আব্বাসের পিছু নিল ও।

এক ঘণ্টা পর, গিয়ারবক্স খুলে পার্টসগুলো পরিষ্কার একটা ক্যানভাসে রাখল ওরা। পিছিয়ে এল রানা, বলল, 'না, সম্ভব নয়। তোমার দাদু তাঁর হাঁস জবাই করে ফেলেছেন, এ আর ডিম পাড়বে না।'

'হ্যাঁ,' বলল আব্বাস, কালো হয়ে গেছে তার চেহারা, 'কী বলব, দাদু একটা...!' সময়মত নিজেকে সামলে নিল সে। 'দাদুর উৎসাহ আর প্রাণশক্তি আরেকটু কম হলে খুশি হতাম।'

'দুপুর তো হয়ে এল,' আড়মোড়া ভেঙে বলল রানা। 'চলো, শুনে আসি তিনি কী বলেন।'

হারারি আর রাসটা বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে আস্তানা গেড়েছেন কামাল হাসান। তাঁর সঙ্গে শুধু সর্দার, প্রভাবশালী মাতবর, আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ঠাঁই পেয়েছে।

বেড়া, প্যারাফিন টিন, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তাড়াহুড়োর সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু কুঁড়েঘর, সব মিলিয়ে দুই একর জায়গার উপর ছোটখাট একটা গ্রামই বলা যায়। গলিগুলোয় ন্যাংটো ছেলে-মেয়েরা ঘুর ঘুর করছে, দোরগোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে গোত্রপ্রধানের যুবতী পত্নীরা উকুন বাছছে পরস্পরের। গোটা এলাকায় অবাধে চলছে ছাগল, নেড়ি কুত্তা, গাধা আর উট।

গ্রামের মাঝখানে কামাল হাসানের তাঁবু। তাতে এত বেশি তালি পড়েছে, প্রথম যে ক্যানভাস দিয়ে ওটা বানানো হয়েছিল সেটার প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই। প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেহরক্ষীরা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

গোত্রপ্রধানের তাঁবুর আরও সামনে বড় একটা খোলা মাঠ, অপেক্ষারত আদিবাসী যোদ্ধারা সেটা প্রায় ভরে ফেলেছে।

'মাই গড,' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'পরামর্শসভায় দেখছি সবাই উপস্থিত।'

'সেটাই নিয়ম,' ব্যাখ্যা করল আব্বাস। 'সবাইকে হাজির থাকতে হবে, তবে কথা বলতে পারবে শুধু মাতবর আর সর্দাররা।'

মাঠের একদিকে হারারি আর রাসটা বাহিনী একসঙ্গে বসেছে, আরেক দিকে আলাদাভাবে বসেছে গালা বাহিনী। একটা হাত তুলে রানাকে দেখাল অ্যানি, বলল, 'ওরা গালা গোত্রের লোক, হারারি আর রাসটাদের সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

'একদল জল্লাদ,' বিড়বিড় করল রানা। 'এ-ধরনের বন্ধু থাকলে, শত্রুর দরকার কী?'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে সরাসরি কামাল হাসানের তাঁবুতে নিয়ে এল আব্বাস, সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল দেহরক্ষীরা। ভিতরটা তন্দুরের মত গরম, প্রায় অন্ধকার। ঝাঁঝাল মশলা আর তামাকের

গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের। তাঁবুর শেষ প্রান্তে একদল লোক বৃত্ত রচনা করে বসে আছে, মাঝখানে একজোড়া মূর্তি, মূর্তি দুটোর দিকে আগ্রহের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব ঝুঁকে আছে তারা। মূর্তি দুটোকে চিনতে পারল রানা—একজন গাঢ় রঙের আলখেল্লায় মোড়া কামাল হাসান, অপরজন হালকা নীল সিল্ক শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা মাইকেল সেভারস।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত রানা ভাবল, ওরা দু'জন সারডি গিরিসংকটের প্রতিরক্ষা বিষয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তারপর ওর চোখে পড়ল টাকা আর খুচরো পয়সার স্তূপ। সোনালি একটা কম্বলের উপর বসে আছে ওরা, দু'জনের সামনে তাস।

'মাই গড,' বলল রানা। 'কথার কথা বলেছিলাম, মাইকেল দেখছি গুরুত্বের সাথে নিয়েছে!'

দু'হাতে ধরা তাসের আড়াল থেকে মুখ বের করল মাইকেল। 'থ্যাঙ্ক গড!' রানাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'আরও আগে আসতে পারলে না?'

'সমস্যাটা কী?'

'বুড়ো বেজন্মাটা আমাকে একা পেয়ে চুরি করছে,' বলল মাইকেল। 'মার্কিন ডলারের হিসেবে শালা আমার কাছ থেকে তিনশো ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি হতভম্ব, রানা। আমি স্তম্ভিত! এরা দেখছি মানুষের জাতই নয়! চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ছুরি চালায়, মানে চুরি করে...,' আড়চোখে তাকিয়ে আব্বাসকে দেখতে পেল সে, তারপর সরাসরি তাকাল। 'নো অফেন্স মেনট্, অফকোর্স। তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তোমার দাদু আমাকে খুন করেছে।'

মাইকেলের প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে একবার করে সবেগে মাথা ঝাঁকালেন কামাল হাসান, বিপুল উৎসাহে হাসছেন

তিনি, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে বিজয়ের উল্লাস। রানা আর অ্যানির উদ্দেশে হাত নাড়লেন, ইঙ্গিতে নিজের পাশের খালি গদিটা দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

'উনি যদি চুরি করেন, ওঁর সাথে না খেললেই পারো তুমি,' বলল অ্যানি।

আহত হলো মাইকেল। 'তুমি বুঝতে পারছ না, ওল্ড গার্ল। এখনও আমি ঠিক ধরতে পারিনি কীভাবে অপকর্মটি করছে সে। আমার দৃঢ় সন্দেহ, বিজ্ঞান আর জুয়ার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করছে সে। আদ্যিকালের বুড়োটা যে ভণ্ড সাধু তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে এ-কথাও ঠিক যে অদ্ভুত এক ধরনের প্রতিভা তাকে সাহায্য করছে। তার পদ্ধতিটা কী তা না জানা পর্যন্ত খেলে যেতে হবে আমাকে, এর কোন বিকল্প নেই।' হঠাৎ তার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এবার বাছাধনকে আর দান মারতে হচ্ছে না...,' একটা কার্ড ফেলল সে, হরতনের ছয়।

কার্ডটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন কামাল হাসান, কোমর আর নিতম্ব গদি থেকে তুলে অবিশ্বাস্য এক দেহ-ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করলেন তিনি, হাতের সব কার্ড মেলে দিলেন দামী উলেন কম্বলের উপর।

'যীশুর মা, যীশু আর যীশুর বাপ!' আঁতকে উঠল মাইকেল। 'জোচ্চোরটা আবার জিতেছে!'

হুমড়ি খেয়ে থাকা বয়স্ক সর্দার আর মাতবররা উল্লাসে বিস্ফোরিত হলো, উলু-ধ্বনির মত লু-লু আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা চিরে। তাদের অভিনন্দনের জবাবে আহ্লাদে আটখানা কামাল হাসানের নর্তন-কুর্দনের গতিবেগ বেড়ে গেল। কম্বলের উপর ঝুঁকে

পড়লেন তিনি, বোমা ফাটানোর আওয়াজ তুলে গর্জে উঠলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?' সেই সঙ্গে খেলাচ্ছলে ঘুসি মারলেন মাইকেলের বাহুতে।

ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে আহত বাহুটা ডলতে শুরু করল মাইকেল। 'যতবার জিতবে এই ঘুসি খেতে হবে আমাকে। হাতে মাংস নেই, শুধু হাড়, কাঁটা লাগানো হাড়–রানা, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি!'

'হাউ ডু ইউ ডু?' আবার হাঁক ছাড়লেন কামাল হাসান, আগের চেয়ে জোর গলায়, মুঠো পাকিয়ে তাক করলেন মাইকেলের বাহু লক্ষ্য করে।

তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ বের করল মাইকেল। ইতিমধ্যে তাঞ্জানিয়ান মুদ্রা যা ছিল সব সে হেরে গেছে। মানিব্যাগ দেখে কামাল হাসান হাত নামিয়ে নিলেন।

'যতক্ষণ না টাকা দেই, একের পর এক মারতেই থাকে।' টাকা গুণে কম্বলের উপর রাখল মাইকেল। কামাল হাসান সেগুলো তুলে নিয়ে নিজের থলেতে ভরলেন। 'খেলাটায় আমি কোন মজা পাচ্ছি না,' মুখ হাঁড়ি করে বলল মাইকেল। 'নিজে হারব, তার ওপর আবার মারও খাব...হাতটা যদি ভেঙে যায়? শালার বুড়ো আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে...,' আড়চোখে আব্বাসের দিকে তাকাল সে। 'নো অফেন্স, অফকোর্স। বেজন্মা বুড়ো আমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না– সম্ভবত নিজের মাকেও করে না, সঙ্গত কারণেই। সত্যি আমি বজ্রাহত!' হঠাৎ থামল সে, কারণ তাস গুছিয়ে নিয়ে আবার বাঁটবার জন্য তৈরি হচ্ছেন কামাল হাসান।

'হাউ ডু ইউ ডু?' তারমানে আরও খেলবার জন্য মাইকেলকে উৎসাহ দিচ্ছেন বৃদ্ধ।

আব্বাসের দিকে তাকাল মাইকেল, 'তোমার দাদুকে বলো, বিনা চ্যালেঞ্জে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না, পরে এক সময় শোধ

নেব আমি। তবে এখন তার খানিকটা মেধা উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সময় হয়েছে। শিফটা বাহিনী অপেক্ষা করছে দোরগোড়ায়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের তাস একপাশে সরিয়ে রাখলেন কামাল হাসান, তীক্ষ্ণ গলায় অ্যামহারিক ভাষায় কিছু বললেন–পরামর্শসভা শুরু হয়ে গেল। রানার দিকে ফিরলেন তিনি।

'আমার দাদু তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইছেন, মাসুদ ভাই,' বলল আব্বাস। 'গাড়িগুলো তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর ধারণাঃ ওগুলো ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে শিফটা বাহিনীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যাবে।'

'তাঁকে বলো, উনি তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের সিকি ভাগ যুদ্ধ না করেই ধ্বংস করে ফেলেছেন। আমাদের হাতে এখন মাত্র তিনটে গাড়ি আছে।'

রানার কথায় রাগা তো দূরের কথা, উত্তেজনায় সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন কামাল হাসান, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন ভাগ্যদেবীর ড্রাইভার হিসাবে কী রকম বীরত্ব আর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সর্দাররা মুহুর্মুহু উল্লাসে ফেটে পড়ল। বেশ কয়েক মিনিট পর আবার তিনি রানার দিকে ফিরলেন।

'দাদু বলছেন, শিফটা বাহিনীকে মাটির সাথে শুইয়ে দেয়ার জন্যে তিনটে গাড়িই যথেষ্ট।'

'তাঁর আত্মবিশ্বাসের বহর দেখে আমি মুগ্ধ,' ব্যঙ্গ করল মাইকেল।

রানা বলল, 'আরও সমস্যা আছে–ড্রাইভার আর গানারের অভাব রয়েছে আমাদের। তোমাদের লোককে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে

নিতে দু'এক হপ্তা সময় লাগবে।'

কামাল হাসান প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, যেন রানার বক্তব্য অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারছেন। তাঁকে সমর্থন করে সর্দার আর মাতবররাও চেঁচামেচি শুরু করল।

'দাদু চাইছেন, ওয়েলস অভ চান্ডিতে শিফটাদের পজিশনে হামলা চালাবেন। তাঁর ইচ্ছে, এই মুহূর্তে হামলা চালাতে হবে।'

মাইকেলের দিকে তাকাল রানা, মাইকেল তাঁবুর মাথার দিকে মুখ তুলে চোখ ঘোরাল।

'নির্মম সত্যটা ফাঁস কর, ওল্ড চ্যাপ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার কথা উনি শুনবেন বলে মনে হয়। বুঝিয়ে দেখো।'

বড় করে শ্বাস টানল মাইকেল, তারপর শুরু করল। আর্মারড সাপোর্ট সত্ত্বেও সামনে থেকে আক্রমণ করা আত্মহত্যার সামিল হবে, কারণ শত্রুদের কমান্ডিং পজিশনে ট্রেঞ্চের ভিতর রয়েছে মেশিনগান আর মর্টার। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবার পর সে বলল, 'নিজেদের গরজেই সামনে বাড়তে হবে শিফটাদের। তখন আমরা সুযোগ পাব।'

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আর প্রাণশক্তির অর্ধেকটা ব্যয় করবার পর কামাল হাসানকে রাজি করাতে সমর্থ হলো মাইকেল। শিফটা বাহিনী ওয়েলস অভ চান্ডির মাথা থেকে নিজেদের পজিশন না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। শিফটারা খোলা প্রান্তরে নেমে এলেই আক্রমণ করা হবে। এরপর আবার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তিনটে গাড়ির জন্য যথেষ্ট ড্রাইভার ও গানার নেই।

'আমি ড্রাইভ করতে পারি,' মাঝখান থেকে বলল অ্যানি, হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছে তার কথা কেউ বিবেচনাতেই আনছে না।

রানা আর মাইকেল দৃষ্টি বিনিময় করল, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই সম্পূর্ণ একমত হলো, তবে প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলল মাইকেল, 'শখের ড্রাইভার হিসেবে আর্মারড কার চালানো এক কথা, আর ওটা নিয়ে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা, মাই ডিয়ার। এখানে তুমি আছ যুদ্ধের রিপোর্ট লেখার কাজ নিয়ে, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।'

কটমট করে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, তারপর সমর্থনের আশায় ঝট করে রানার দিকে ফিরল। 'রানা!' শুরু করল সে।

'মাইকেল ঠিকই বলেছে,' অ্যানিকে থামিয়ে দিল রানা। 'ওর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

চুপসে গেল অ্যানি, রাগটা দমন করবার চেষ্টা করল, জানে এই মুহূর্তে তর্ক করে কোন লাভ হবে না। সে যে ওদের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয় সেটা সময় মত দেখিয়ে দেওয়া যাবে, ভাবল সে।

আবার আলোচনা শুরু হলো। রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রানা বলল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিকার্স গানসহ আর্মারড কারগুলো শিফটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, শিফটা বাহিনী যাতে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায়। যে-কোন মূল্যে শিফটাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ফাঁক তৈরি করতে হবে, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকবে কামাল হাসানের অশ্বারোহী সৈনিকরা, বিশৃংখল রাসটা বা হারারি পদাতিক বাহিনীর দুর্বলতা পুষিয়ে নেওয়ার এটাই একমাত্র বিকল্প।

আব্বাস বলল, 'দাদু এখন বলছেন, চান্ডির গুহা পেরিয়ে এলেই শিফটাদের উপর হামলা করতে হবে। হারারি আর গালা, দুই গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধারা এই আক্রমণের দায়িত্ব নেবে, নেতৃত্বে থাকবে দুটো আর্মারড কার। পদাতিক, ভিকার্স গান আর

অবশিষ্ট আর্মারড কার এখানে, এই সারডি গিরিসংকটে রিজার্ভ হিসেবে থাকবে।'

'গাড়িরগুলোর ড্রাইভার থাকবে কারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি আর আমি একটা গাড়িতে, দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভার থাকবেন মেজর মাইকেল সেভারস, গানার থাকবেন দাদু।'

'আমার কপালে এত বড় অভিশাপ নেমে আসছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' গুঙিয়ে উঠল মাইকেল। 'আদ্যিকালের বুড়োটা স্রেফ একটা উন্মাদ। নিজের জন্যে, এবং তার চারপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাকি সবার জন্যে সে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা।'

'শিফটাদের জন্যেও,' সায় দিল রানা। হাসছে।

'তুমি তো হাসবেই,' অভিযোগ করল মাইকেল। 'তোমাকে তো আর একটা টিনের কৌটার ভেতর ম্যানিয়াকটার সাথে থাকতে হচ্ছে না। আব্বাস, শোনাও ওকে...।'

'না, মেজর সেভারস।' মাথা নাড়ল আব্বাস, তার চেহারা নির্লিপ্ত। 'আমার দাদু অর্ডার যা দেয়ার দিয়ে ফেলেছেন, তাঁর কথার উপর আর কোন কথা চলবে না। আপনার প্রতিবাদ আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাব না—তবে আপনি যদি জেদ ধরেন, এইমাত্র তাঁর সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো উচ্চারণ করলেন সেগুলো অনুবাদ করে...।'

'মাই ডিয়ার চ্যাপ,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে আব্বাসকে থামিয়ে দিল মাইকেল। 'তোমার দাদু আমাকে নির্বাচিত করায় ব্যাপারটাকে আমি দুর্লভ সম্মান হিসেবে নিচ্ছি। মন্তব্য যেগুলো করেছি, স্রেফ কৌতুক ছিল, বিলিভ ইট। নো অফেন্স, ওল্ড চ্যাপ, নো অফেন্স অ্যাট অল।' সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, তাস তুলে নিয়ে পরবর্তী দান বাঁটতে শুরু করেছেন কামাল

হাসান। 'এখন আমার একটাই প্রার্থনা—তাড়াতাড়ি মুভ করুক শিফটারা। তাসের পরাজয় আর আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না।'

তাঁবুর মুখ থেকে স্যালুট করল মেজর লুইগি রাকা। 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?'

বিশাল আয়নায় চোখ রেখে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক, পরমুহূর্তে আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মনোযোগ দিল। 'সাতা!' ধমক মারল সে। 'আমার বাঁ বুটের ডগায় ওটা কি ময়লার দাগ?'

সার্জেন্ট/ক্যামেরাম্যান বানানটো সাতা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসল কাউন্টের পায়ের কাছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুটের উপর, বুটের গায়ে তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ায় চকচকে ভাবটা ম্লান হয়ে গেল— তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের হাতা দিয়ে বুটটা পালিশ করল সে। তার খুব ইচ্ছে হলো কাউন্টকে খুশি করবার জন্য বুটের ডগায় একটা চুমো খায়, কিন্তু ঠোঁট লেগে ভিজে গেলে লাথি খেতে হবে ভেবে ইচ্ছেটাকে অতিকষ্টে দমন করল।

চোখ তুলে তাকিয়ে কাউন্ট দেখল এখনও প্রবেশপথের কাছে ইতস্তত করছে মেজর রাকা। তার চেহারা এমনই সীসার মত ভারি আর নীরস, কাউন্ট অনুভব করল তার রাগ ফিরে এসেছে। 'গু-মুত খেয়েছ নাকি, রাকা, তোমার চেহারা অমন তেতো হয়ে আছে কেন?'

'আমার আশংকার কথা আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মাই কর্নেল।'

'বটে!' হুঙ্কার ছাড়ল কাউন্ট। 'সেজন্যেই কি তোমাকে আমি

যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও এখনও তুমি রওনা হওনি?'

'মাই কর্নেল, আমি কি আরেকবার ব্যাখ্যা করতে পারি কেন আমাদের পজিশন ছেড়ে নড়া উচিত হবে না?'

'না, পারো না! আরে খচ্চর, জেনারেল ফাদ স্বয়ং আমার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন! তিনি মেসেজ পাঠিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, বলেছেন সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে শিফটাদের নিয়ে সেলাসি বাহিনীর সাথে যোগ দিতে হবে আমাকে। হাজার হাজার হারারি আর রাসটাদের কে প্রতিহত করল? আমি না? খোলা প্রান্তরে রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে কয়েক হাজার শত্রুর লাশ কে ফেলল? আমি না? কাজেই তিনি যে আমার ওপর আস্থা স্থাপন করবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! শুধু তোমার মত বেআক্কেল...।'

'মাই কর্নেল, শত্রুরা...।'

'বাহ্!' ঘৃণায় কুঁচকে উঠল কাউন্টের চেহারা। 'বাহ্ ছাড়া আর কী বলার আছে আমার? তুমি বলছ শত্রু, আমি বলি বর্বর! আমি বলি জংলী, তুমি বল সৈনিক। বাহ্!'

'আমার কর্নেল যা বলেন, কিন্তু আর্মারড কার...।'

'না! রাকা, না! ওটা কোন আর্মারড ভেহিকেল ছিল না–ছিল একটা অ্যাম্বুলেন্স।' কাউন্ট নিজেকে সত্যিই তাই বুঝিয়েছে। 'বিজয় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, সেটা আমি তোমার কথায় হাত ছাড়া করতে পারি না। ভীতু মেয়েমানুষের মত গর্তের ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকতে অস্বীকার করছি আমি। ভয় পাওয়া আমার স্বভাব নয়, তুমি ভাল করেই জানো। আমি অ্যাকশন, ডিরেক্ট অ্যাকশন পছন্দ করি...।'

হাল ছেড়ে দিয়ে মেজর বলল, 'কর্নেল যা বলেন।'

'আমি কী বলি সেটা বড় কথা নয়, রাকা। বড় কথা হলো,

ঈশ্বর এই গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমি পালন করব।'

এর কোন জবাব হয় না। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে তাঁবু থেকে কাউন্টকে বেরুবার পথ করে দিল মেজর রাকা। কাউন্টের চিবুক উঁচু হয়ে আছে, দৃঢ় পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

সেই ভোর অন্ধকার থাকতে মেজর রাকার স্ট্রাইক ফোর্স তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশটা ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্টার। সামনে বাড়বার আদেশ দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মেজর রাকা।

ইতিমধ্যে রণকৌশল স্থির করে ফেলেছে সে। ওয়েলস অভ চাল্ডির মাথার উপর, ট্রেঞ্চের ভিতর পুরো একটা কোম্পানী রেখে যাওয়া হবে, একজন ক্যাপটেনের অধীনে। বাকি সব ট্রুপস নিয়ে গিরিখাদের দিকে এগোবে তারা, প্রবেশপথ দখল করবে, লড়তে লড়তে উঠে যাবে হাইল্যান্ডের দিকে।

লাইনের প্রথমে পাঁচ ট্রাক ভর্তি রাইফেলম্যান রয়েছে, তার ঠিক পিছনে মেশিনগান সেকশন–কয়েক মিনিটের নোটিসে অ্যাকশনে যেতে পারবে ওগুলো। মেশিনগানের পিছনে বিশটা ট্রাকে রয়েছে পদাতিক বাহিনী, আর লাইনের একেবারে শেষ মাথায় রয়েছে আরও দশটা ট্রাক। ফিল্ড আর্টিলারিকে নিজের চোখ আর হাতের নীচে রেখেছে মেজর রাকা।

কলাম যদি ঘোরতর কোন বিপদে পড়ে, কামান খুলে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে যে মূল্যবান সময় দরকার হবে তার জন্য পদাতিক বাহিনীর উপর নির্ভর করছে সে। কাউন্ট যে তাদেরকে

বিপদের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই, তবে কামানের সুরক্ষিত মাজলের ছত্রছায়ায় থেকে বিপদ মোকাবিলা করা কঠিন হবে না। মেজরের আত্মবিশ্বাস কম হলেও, একেবারে নেই তা নয়।

প্রতিটি স্থির ট্রাকের পাশে বালি মেশানো মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে ক্রু আর ড্রাইভাররা—খালি মাথা, শার্টের বোতাম খোলা, হাতে সিগারেট।

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস টানল মেজর লুইগি রাকা, তার নির্দেশ বজ্রনির্ঘোষের মত ছড়িয়ে পড়ল মরু প্রান্তরে। 'ফল ইন!'

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠল লোকজন, ব্যস্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ইউনিফর্ম ঠিকঠাক করল, প্রতিটি ট্রাকের পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল তারা।

'আমার আদরের সন্তানরা! আমার বুকের মাণিকরা!' উত্তেজিত ভাবে লাইনের সামনে পায়চারি শুরু করল কাউন্ট ডিকানডিয়া। 'তোমরা আমার রক্ত, হে আমার বীর সন্তানরা!' খুঁটিয়ে প্রত্যেককে দেখছে সে, কিন্তু আবেগের বশে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে থাকায় দেখতে পাচ্ছে না শার্টের বোতাম খোলা, সিগারেট ধরা হাত পিছনে লুকানো, মুখে না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'জানি, আমি জানি রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছ তোমরা!' পিছনের বাতাসে হেলান দিয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসল সে। 'বাছারা, তোমাদের আমি বালতি বালতি রক্ত দেব! আজ তোমরা মনের আশ মিটিয়ে তা পান করতে পারবে!'

যারা শুনতে পাবার মত কাছাকাছি রয়েছে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল, অস্বস্তির সঙ্গে মাথা চুলকাল কেউ কেউ। মদ খেয়েছে সবাই, কিন্তু তাই বলে স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি

হারায়নি তারা। ভাবছে, কাউন্ট কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল?

অল্পবয়েসী এক ভাড়াটে সৈনিকের সামনে দাঁড়াল কাউন্ট, হেলমেটের বাইরে তার লম্বা চুল ঝুলে রয়েছে। 'গামবিনো,' বলল কাউন্ট। ছোকরা মাথা নত করে অপ্রতিভ ভাবটুকু লুকানোর চেষ্টা করল। 'তোমাকে আজ আমরা একজন বীরযোদ্ধা বানাব।' রাইফেলম্যান সৈনিকটিকে আলিঙ্গন করল সে। 'তোমাকে শত্রুর হাতে নিহত হয়ে প্রমাণ করতে হবে…কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে, কাউন্ট ডিকানডিয়ার নির্দেশ পেলে হাসতে হাসতে মরতে পারো তুমি।' সৈনিকের লাজুক হাসি দপ করে নিভে গেল, মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুলল সে।

'গাও, গামবিনো, গাও!' চেঁচিয়ে উঠল কাউন্ট, নিজেই হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করল, 'কাউন্ট ডিকানডিয়ার অপর নাম, দুর্জয় সাহস/সামনে যাকে পাও কেটে করো সাফ, মানুষ কিংবা মোষ…।' লাইনের সামনে মার্চ করতে করতে গেয়ে চলল সে, তার পায়ের নীচে মাটি থরথর করে কাঁপতে লাগল, লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছুবার পর তার গান থামল। মেজর রাকার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, মেজর আবার একটা হুংকার ছাড়ল।

'মাউন্ট আপ!'

কালো শার্ট পরা ট্রুপারদের ঝাঁকটা ভেঙে গেল, যে-যার ট্রাকের দিকে ছুটল সবাই।

কলামের মাথায় সম্মানসূচক জায়গাটি দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টের রোলস-রয়েস, ড্রাইভারের সিটে আগেই উঠে বসেছে ডিনো, তার পাশে বানানটো সাতা, হাতে ক্যামেরা।

রোলস-রয়েসের এঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া রয়েছে, কাউন্টের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রে পিছনের সিট ভর্তি। স্পোর্টস রাইফেল,

শটগান, ট্রাভেলিং ব্যাগ, পিকনিক বক্স, বেতের তৈরি ওয়াইন ক্যারিয়ার. বিনকিউলার, টেবিল ঘড়িসহ আরও কত কী। গাড়িতে চড়ে প্যাড লাগানো নরম সিটে হেলান দিল কাউন্ট, তাকাল মেজরের দিকে। 'মনে রেখো, রাকা, আমার রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য হলো গতি আর চমক। শত্রুর হৃৎপিণ্ডে বজ্রাঘাত হানো—কাউন্ট ডিকানডিয়ার নামে।'

কলামের সর্বশেষ ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসে রয়েছে মেজর লুইগি রাকা, সামনের ঊনপঞ্চাশটা ট্রাকের ধুলো খাচ্ছে আর দরদর করে ঘামছে। হাতঘড়ি দেখল সে। 'সর্বনাশ, এরইমধ্যে এগারোটা পেরিয়ে গেছে!'

এই সময় কাকে যেন অভিশাপ দিয়ে কষে ব্রেক করল ড্রাইভার, ট্রাক পুরোপুরি থামবার আগেই লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে বেরিয়ে এল মেজর, সেখান থেকে আরেক লাফে উঠে পড়ল ক্যাবের ছাদে। 'কী ব্যাপার?' সামনের ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল সে।

'কী জানি, মেজর, কিছু বুঝতে পারছি না,' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল লোকটা।

তাদের সামনে গোটা কলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হতে মাথা নিচু করে নিল মেজর, তার ধারণা হলো, সরাসরি একটা অ্যামবুশের ভিতর এসে পড়েছে তারা। চারদিক থেকে প্রশ্ন আর মন্তব্য শোনা গেল। প্রায় সব ট্রাক থেকেই নেমে এল ড্রাইভার আর হেলপাররা। সামনে কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ হয়েছে।

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল মেজর রাকা। মরু বিস্তৃতি পেরিয়ে আবার ভেসে এল গুলির শব্দ। এতক্ষণে রোলস-

রয়েসটাকে বিনকিউলারের লেন্সে ধরতে পারল সে।

কলাম থেকে বেরিয়ে বাম দিকের খোলা প্রান্তর ধরে ছুটছে রোলস-রয়েস। ব্যাক সিটের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, তার হাতে শটগান। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মেজর রাকাও তাকাল। পাখির পালক উড়ছে বাতাসে, নিহত পাখিটা ডিগবাজি খেতে খেতে রোলস-রয়েসের খানিকটা সামনে পড়ল। পাখির ঝাঁকটা এখনও রয়েছে নাগালের মধ্যে। কাউন্টের শটগান আবার গর্জে উঠল। নীল আগুনের ফুলকি বেরুল মাজল থেকে। আকাশে বিস্ফোরিত হলো আরও দুটো পাখি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল পালকগুলো। ব্রেক করল ড্রাইভার।

বানানটো সাতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেজর, গাড়ি থেকে নেমে নিহত পাখি নিয়ে দৌড়ে কাউন্টের কাছে ফিরে এল সে। সাতার হাত থেকে পাখি নিয়ে পোজ দিল কাউন্ট, হাঁটু গেড়ে বসে চোখে ক্যামেরা তুলল বানানটো সাতা। তার ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল। এত দূর থেকে শুনতে না পেলেও কী বলছে সে বুঝতে পারল লুইগি রাকা–'আরেকটু হাসুন, মাই কাউন্ট।' সত্যিই তাই, পর মুহূর্তে দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো কাউন্টের ঠোঁট।

'শালা বানচোত ডোবাবে!' দাঁতে দাঁত চেপে ঝাল ঝাড়ল মেজর রাকা।

তিন

আদিবাসী যোদ্ধাদের মধ্যে বিপজ্জনক একটা অস্থিরতা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই সকাল থেকে খুলি ফাটানো রোদের মধ্যে

বসে অপেক্ষা করছে তারা অথচ যুদ্ধ শুরুর কোন আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

সকাল দশটার দিকে স্কাউটরা এসে রিপোর্ট করে গেছে, শিফটারা পজিশন ছেড়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কামাল হাসানের আদিবাসী বাহিনী সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত পজিশনে চলে এসেছে, কিন্তু তারপর আর কোন খবর নেই।

শিফটাদের প্রথম আক্রমণটা কোথায় ঠেকানো হবে মাইকেল আগেই তা ঠিক করে রেখেছিল, সম্ভাব্য ভাল পজিশন খুঁজে বের করবার জন্য তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। আদিবাসীদের অশ্বারোহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃংখল, অল্প সময়ের ভিতর যতটা সম্ভব ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদের, সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে, চোখ-কান খোলা না রাখলে অ্যামবুশের ফাঁদে পড়তে হবে।

নির্বাচিত জায়গাটা দুই গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে–সরু সারডি গিরিসংকট যেখানে চওড়া হতে শুরু করে একটা ফানেল-এর সৃষ্টি করেছে, তার মুখের কাছে। জানা কথা, শিফটাদের সামনে এটাই একমাত্র খোলা পথ, দৈর্ঘ্যে সেটা প্রায় বারো মাইলের মত।

আক্রমণকারীদের কোনভাবে দক্ষিণ শৃঙ্গের কাছাকাছি টেনে আনতে হবে, ওদিকে পাথুরে ঢালের উপর ভিকার্স মেশিনগানগুলো বসানো হয়েছে, ওখান থেকে পাথুরে ঢাল বেয়ে ছোট্ট একটা পানিপথও নেমে গেছে খোলা প্রান্তরে। নালাটা এখন শুকনো, এঁকেবেঁকে পাঁচ মাইল এগিয়ে মরুভূমির সঙ্গে মিশে গেছে, তবে গালা, হারারি আর রাসটা অশ্বারোহী সৈনিকদের লুকিয়ে থাকবার জন্য যথেষ্ট গভীর আর চওড়া ওটা।

নালার মেঝেতে বালি যেন সাদা চিনি, পাশে ঘোড়া নিয়ে সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করল বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী। বুদ্ধি

করে দুটো দলকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে—রাসটা আর হারারিরা পজিশন নিয়ে আছে ফাঁদের মাথায়, পাহাড়ের পাথুরে ঢালের সবচেয়ে কাছিকাছি, ওখানে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে ভিকার্স গানাররা। আর গালারা পজিশন নিয়েছে নালার আরও সামনে, নালাটা যেখানে খোলা প্রান্তরে বেরুবার পর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে শুকনো ঘাসজমির দিকে। ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে গালাদের একজন সর্দার, দাগী কাপুলা। কাপুলা গালার মুখে, চোখের কোণ থেকে চিবুক পর্যন্ত লম্বা, একটা কাটা দাগ আছে, সেজন্যই তার নামের আগে ওই শব্দটা বসেছে। গালা অশ্বারোহীদের পরনে নীল আলখেল্লা।

নালার বাঁকটার কাছে। পাড় এত উঁচু যে বারোশো অশ্বারোহীকে লুকিয়ে রাখতে কোন অসুবিধে হলো না। হারারি আর রাসটা অশ্বারোহীদের সংখ্যাও কম নয়, প্রায় তিন হাজার। বিজয় বা পরাজয় নির্ভর করছে দুটো প্রশ্নের উপর, শৃংখলা আর ধৈর্যের সঙ্গে কতক্ষণ নালার ভিতর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারবে ওরা, বিদেশী কমান্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কিনা। সন্দেহ নেই, খোলা মরু ধরে এগিয়ে আসার সময় শিফটারা বিশৃংখল আর এলামেলো অবস্থায় থাকবে, অতির্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। সারাদিন সূর্যের অত্যাচার সহ্য করে সবাই ক্লান্ত আর মেজাজী হয়ে উঠেছে, দানা-পানির অভাবে ছটফট করছে ঘোড়াগুলো।

অদৃশ্য একটা জাল ফেলে রেখেছে মাইকেল সেভারস, সেই জালে শিফটা বাহিনীকে আটকাতে চায় সে। জালের মুখ হিসাবে বেছে নিয়েছে নালার চওড়া একটা বাঁক, তার আশা টোপ গিলিয়ে

এখানে তাদেরকে আনতে পারবে সে। খোলা প্রান্তরের আরও দু'মাইল সামনে, মাটির একটা চওড়া আর উঁচু ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অশ্বারোহীদের ছোট্ট একটা দল, মাইকেলের টোপ। এই মুহূর্তে ভাঁজটার কাছ থেকে খানিকটা পিছনে, গরবিনীর টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল। আজ সকালে প্রথম যখন খবর এল শিফটারা মুভ করছে, সেই থেকে ওখানে পজিশন নিয়েছে ছোট্ট দলটা। আর সবার মত তারাও অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একঘেয়েমির শিকার। ওরা স্বাধীনচেতা, উচ্ছৃঙ্খল, বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী, এখনও যে ওরা জোট ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েনি সেটাই আশ্চর্য লাগল মাইকেলের। যে-কোন মুহূর্তে ধুত্তোর বলে বাড়ির পথ ধরলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

নিজের কাজে ব্যস্ত এবং খুশি, এমন লোক মাত্র একজনকেই দেখতে পেল মাইকেল। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে অকারণ অস্বস্তির সঙ্গে ভদ্রলোকের দৃশ্যমান অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। চঞ্চলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের ভিতর কোমর থেকে উপরের অংশ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে রানার, বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু পা আর ঊরুর পিছনটা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিরতিহীন শিস।

'ওখানে তোমার সাফল্যের পরিমাণ কি উল্লেখ করার মত?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল, স্রেফ শিসটা থামানোর জন্য, কারণ সুরটা একেবারেই অর্থহীন লাগছে তার।

এলোমেলো চুলসহ মাথাটা বের করল রানা, একদিকের গালে কালো তেলের দাগ। 'সমস্যাটা বোধহয় ধরতে পেরেছি,' বলল ও। 'কার্বন রডে খানিকটা ময়লা ঢুকে পড়েছে।' আব্বাসের হাত থেকে ন্যাকড়া নিয়ে হাত মুছল। 'শিফটাদের মতলবটা কী বুঝতে পারছ কিছু?'

‘একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওল্ড চ্যাপ।’ চোখে বিনকিউলার তুলে চারদিকটা আবার একবার দেখে নিল মাইকেল, চোহারায় গাম্ভীর্য আর উদ্বেগ। ‘স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভেবেছিলাম মরার জন্যে পঙ্গপালের মত ছুটে আসবে শালারা, সামনে পিছনে ভুলেও তাকাবে না।’

ধীর পায়ে হেঁটে এল রানা, গরবিনীর টারিটে মাইকেলের পাশে উঠে পড়ল। নালা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কার দুটো, খানিক সামনেই সীমাহীন ঘাস আর ঢেউ তোলা বালির পাহাড়ের ভিতর অস্তিত্ব হারিয়েছে নালাটা। এখানে নালার পাড় খুব কম উঁচু, কার দুটোর খোল আড়াল করা গেলেও, টারিটের উপরের অংশ পাড়ের কিনারা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। গাছপালার শুকনো ডাল দিয়ে ঢাকা হয়েছে ওগুলো, ক্রুদের অবজারভেশন পোস্ট হিসাবে কাজ করছে।

রানার হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল মাইকেল। ‘আমার ধারণা, শত্রুদের কমান্ডার লোকটা কুঁড়ের বাদশা অথবা ভীতুর ডিম। দু’পা এগোয় তো এক পা পিছোয়।’ উদ্বেগের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে। ‘ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।’

‘আবার থেমেছে দেখছি,’ বলল রানা, দূরের ধূলিমেঘ দেখে কলামের মাথার পজিশন ঠাহর করল ও। ধুলোর পাহাড় সামনে এগোচ্ছে না, ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে আকারে।

‘ওহ মাই গড!’ গুঙিয়ে উঠল মাইকেল, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল বিনকিউলার। ‘শালার ব্যাটা শালা নির্ঘাত কোন ফন্দি এঁটেছে! এবার নিয়ে সাতবার থামল অথচ সহজবোধ্য কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্লভ কোন সামরিক প্রতিভার খপ্পরে পড়েছি আমরা—নেপোলিয়ানের আধুনিক

সংস্করণ। আক্রমণ না করেই শালা আমার নার্ভের দফারফা করে দিয়েছে!'

স্মিত হেসে রানা পরামর্শ দিল, 'তোমার আসলে যা দরকার তা হলো খানিকটা অবসর সময়, রামি খেলার জন্যে। কামাল হাসান অপেক্ষা করছেন, সে খবর রাখো?' যেন অনুবাদ ছাড়াই রানার কথা বুঝতে পারলেন, চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে গরবিনীর পাশ থেকে ওদের দিকে মুখ তুললেন গোত্রপ্রধান কামাল হাসান। আর্মারড কারের পাশে সামান্য ছায়া পড়েছে, সেখানে একটা অ্যামুনিশন বক্স রাখা হয়েছে, ঢাকনির উপর তাস সাজিয়ে বসে আছেন তিনি। তাঁর পিছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা, তারাও আগ্রহের সঙ্গে মুখ তুলল।

'ওরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে,' হাঁসফাঁস করে উঠল মাইকেল। 'জানি না কোন্ দল বেশি বিপজ্জনক–বেজন্মা বুড়োটা, নাকি কুঁড়ের বাদশা শিফটাদের কমান্ডার!' আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সে, পাহাড়শ্রেণীর লম্বা পাদদেশের উপর দৃষ্টি বুলাল। ধুলোর কোন চিহ্নমাত্র দেখল না সে। 'শালারা করছেটা কী?'

সপ্তম যাত্রাবিরতির নির্দেশটা কাউন্ট ডিকানডিয়ার তরফ থেকেই এল। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার আদৌ কোন উপায় ছিল না।

যে-কোন বিচারে যাত্রাবিরতির কারণটাকে জরুরী বলে অভিহিত করা যায়। কাউন্টের পোর্টেবল কমোড অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে একটা ট্রাক থেকে নামানো হলো, ওটাতেই তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহন করা হচ্ছে। ওদিকে রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে মোচড় খাচ্ছে কাউন্টের শরীর, গোঙাচ্ছে সে, প্রকৃতির ডাকে এখুনি সাড়া দিতে না পারলে তার শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়বে,

লেজেগোবরে হয়ে যাবে আভিজাত্য আর প্রাইভেসী। 'আরেকটু ধৈর্য ধরুন, মাই কাউন্ট,' পাশ থেকে তাকে সান্ত্বনা দিল বানানটো সাতা, কাউন্টের দুর্দশা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী। 'জানি, এর কারণ কি আমি জানি,' ধরা গলায় বলল সে। 'কুয়ার পানি, মাই কাউন্ট! কুয়ার দূষিত পানি!'

কমোডটা এমনভাবে বসানো হলো, ব্যক্তিগত কাজটি সারবার মুহূর্তে কাউন্ট যাতে একই সঙ্গে পাহাড়শ্রেণীর সৌন্দর্য অবলোকনের সুযোগ পায়। কমোডের তিন দিকে ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো হলো, পাঁচশো পদাতিক সৈনিকের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আসনটি আড়াল করবার জন্য।

আয়োজন শেষ হলো একেবারে চরম মুহূর্তে। তিনজন লোকের ঘাড়ে চেপে রোলস-রয়েস থেকে নামল কাউন্ট, অবিরাম কাতরাচ্ছে সে। গোটা কলাম স্থির হয়ে গেল, শ্রদ্ধা ও আগ্রহসূচক নিস্তব্ধতা নেমে এল সৈনিকদের মধ্যে। তিনজন লোক কাউন্টকে কমোডের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল সে, এমনভাবে ছুটল যেন অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চায়। চোখের পলকে ক্যানভাস পর্দার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মাত্র দু'এক সেকেন্ড পরই ভিতর থেকে হুংকার ভেসে এল।

'ডাক্তার ডাকো!'

রহস্যে ভরপুর ছায়াছবির শেষ দৃশ্যে দর্শকরা যেমন উত্তেজনাবোধ করে, সম্মোহিত হয়ে পড়ে, পাঁচশো যোদ্ধারও সেই একই অবস্থা হলো। কাউন্ট চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ল, এক কান থেকে আরেক কান হয়ে শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছুল মেজর লুইগির কানে। বিশ্বাস আর

অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে ছুটে এল সে, ব্যাপারটার তদন্ত হওয়া দরকার।

পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সে দেখল, কাউন্ট আর তার মেডিকেল অ্যাডভাইজাররা কমোডটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কমোডের মাঝখানে পড়ে থাকা পদার্থ সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছে। কাউন্টকে ম্লান দেখাল, কিন্তু তবু সে সদ্য মাতৃত্ব অর্জনকারিণীর মত গর্বিত, যার সন্তান সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

দোরগোড়ায় নড়াচড়া লক্ষ করে সেদিকে তাকাল কাউন্ট, মেজর রাকাকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর হলো। তাকেও কমোডে পড়ে থাকা পদার্থ পরীক্ষার জন্য ডাকা হতে পারে, এই ভয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল মেজর। তাড়াহুড়োর সঙ্গে স্যালুট করল সে, পিছিয়ে গেল এক পা। 'ইওর এক্সেলেন্সী আমাকে কি তলব করেছেন?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ, রাকা,' বলেই একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলল কাউন্ট—শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল, আলগাভাবে দুলতে লাগল মাথা। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধ শক্ত করল সে, উঁচু করল চিবুক। টান পড়ল ঠোঁটে, দুর্বল হাসি ফুটল সামান্য। 'কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমরা অগ্রসর হব, রাকা। শত্রুর দুর্জয় দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব! আমার বাহিনীকে বলো, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। সত্যি কথাটা তাদের কাছে গোপন করে যাও। আমি অসুস্থ জানলে ওদের মনোবল ভেঙে যাবে, ওরা আতংকিত হয়ে পড়বে।'

আবার স্যালুট করল মেজর। 'আপনি যা বলেন, মাই কর্নেল।'

'আমাকে সাহায্য করো, রাকা,' নির্দেশ দিল কাউন্ট। 'আমি গাড়িতে ফিরব।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউন্টের একটা হাত ধরল লুইগি রাকা, তার কাঁধের উপর মাথার ভার চাপিয়ে দিল কাউন্ট।

ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, মেজরের কাঁধ থেকে মাথা তুলে অপেক্ষারত সৈনিকদের উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ল কাউন্ট। 'বাছারা!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমার অসুস্থতার কথা জানতে পারলে কেঁদে বুক ভাসাবে ওরা। না, ওদেরকে জানানো চলবে না। ওদেরকে আমি বিজয়ের পথে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যাব।'

'ওখানে ছাই ঘটছেটা কী, বলবে আমাকে?' টারিটে দাঁড়ানো রানার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল মাইকেল, ভারি উদ্বিগ্ন।

'কিচ্ছু না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কোন নড়াচড়া নেই।'

'লক্ষণটা ভাল মনে করছি না।' গম্ভীর হলো মাইকেল, আর ঠিক তখনই বিজয়ীর উল্লাস বেরিয়ে এল কামাল হাসানের গলা থেকে, কোমর আর নিতম্ব তুলে নৃত্য শুরু করলেন, মাইকেলের সামনে মেলে দিলেন হাতের সব ক'টা তাস। 'এটা আরও খারাপ লক্ষণ,' বলে ঘুসি খাওয়ার আগেই পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করল, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ আবার তাস ফাঁটতে শুরু করেছেন। 'অ্যানির ব্যাপারটা, তার কী খবর?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ছায়া পর্যন্ত দেখছি না,' আবার আশ্বস্ত করল রানা। 'দেখব বলে আশাও করি না।'

'তার আচরণ আমার ভাল লাগেনি। নিষেধটা অমন শান্তভাবে নিল কেন? আমার হিসেবে বলে, অনেক আগেই তার উদয় হওয়ার কথা ছিল।'

'ধরে নাও হিসেবে ভুল করেছ,' বলল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে ফাঁকা দিগন্তে দৃষ্টি বুলাল।

'আমার হিসেবে সাধারণত ভুল হয় না বলেই তো চিন্তা হচ্ছে,'

বলে তাসগুলো তুলে নিল মাইকেল। 'যে-কোন মুহূর্তে তার গাড়িটা আমরা দেখতে পাব। ক্যাম্পে অলস সময় কাটাবে, তেমন মেয়েই সে নয়, বিশেষ করে এখানে যখন পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধ লাগতে যাচ্ছে। কোথাও কিছু ঘটলে, সামনের সারিতে থাকা তার স্বভাব।'

'তা ঠিক,' একমত হলো রানা। 'গিরিখাদে থাকতে রাজি হলো বটে, কিন্তু তার ভাবসাব আমারও ভাল ঠেকেনি। তাই এমন ব্যবস্থা করে এসেছি, নিতম্বিনী নড়বে না একচুল।'

'মানে?'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রড খুলে নিয়ে এসেছি।'

ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করল মাইকেল। 'সারাদিনে এই একটাই সুখবর পেলাম। বাঁচা গেল, দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে অ্যানিকে দেখা যাবে না।'

'ভাড়াটে ইটালিয়ানদের কপাল মন্দ,' মন্তব্য করল রানা। দু'জনেই হেসে উঠল।

'মাঝে মধ্যে তুমি আমাকে সত্যিই অবাক করে দাও, তা জানো কি, ওল্ড চ্যাপ?' পকেট থেকে চুরুট বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল মাইকেল। 'আমার সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকটায় তুমিও লক্ষ রাখছ, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ,' বলল সে। 'সত্যি, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল।'

চুরুটের গোড়া কামড়ে ছিঁড়ল রানা, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেটা ধরাবার সময় চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মাইকেলের দিকে। 'র‍্যাঞ্চের নিয়ম দেখছি কিছুই তুমি জানো না হে,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল ও। 'মালিকানার ছাপ না মারা পর্যন্ত সব গরুই বেওয়ারিস।' ওর অভিনয় দারুণ বিশ্বাসযোগ্য হলো।

তাগড়া যোয়ান দেখে আদিবাসী পাঁচজন যুবককে বেছে নিল অ্যানি উইসপার, এরা সবাই কামাল হাসানের ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার জন্য রয়ে গেছে। প্রত্যেককে এক ডলার করে মজুরি দিল, খাটিয়ে নিল গাধার খাটনি। প্রতিবার একজন করে নিতম্বিনীর ক্র্যাঙ্কহ্যান্ডেল ঘোরাল তারা, পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উৎসাহ দিল অ্যানি, রাগ আর হতাশায় টকটকে লাল হয়ে আছে তার চেহারা।

এভাবে এক ঘণ্টা কাটবার পর সে বুঝল, তাকে নিরাপদ দূরত্বে আটকে রাখবার জন্য স্যাবোটাজ করা হয়েছে, অর্থাৎ নিতম্বিনীর এঞ্জিনে কোথাও কলকাঠি নাড়া হয়েছে। অ্যানি উইসপার হলো সেই দুর্লভ প্রজাতির মেয়ে যে কিনা কোথায় কী ঘটছে জানবার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে বা যে-কোন ঝুঁকি নিতে সদা প্রস্তুত। সে তার অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক মেটানোর জন্য সারাটা জীবন অসংখ্য বন্ধু, মেকানিক, আর ইন্সট্রাকটরদের অজস্র প্রশ্ন করে শুধু যে বিরক্ত করেছে তাই নয়, শিখেছেও প্রচুর। বোতাম টিপে একটা মেশিন বা এঞ্জিন চালু করতে পারাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। ড্রাইভার আর পাইলট হয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে, গাড়ি আর প্লেনের এঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তা-ও সে শিখেছে। 'ঠিক আছে, জনাব মাসুদ রানা, দেখা যাক তোমার কুকীর্তি ধরতে পারি কিনা,' গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলল সে। 'প্রথমে পরীক্ষা করা যাক ফুয়েল সিস্টেম।'

চুলগুলো এক করে মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধল সে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ল। প্রকাণ্ডদেহী পাঁচজন হেলপার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল। এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে কাউলিংটা তুলে ফেলল অ্যানি। পাঁচজনই তারা এবার

ভিড় করে এগিয়ে এল পরামর্শ আর সাহায্য নিয়ে। কাজ শুরু করবার আগে তাড়া করে তাদের খেদাতে হলো অ্যানির। একবার কাজ শুরু করবার পর চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আর কোন খেয়ালই থাকল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফুয়েল সিস্টেম টেস্ট করা হয়ে গেল, নিশ্চিতভাবে বুঝল ট্যাংক থেকে কোন বাধা ছাড়াই কারবুরেটর আর সিলিন্ডারে পৌঁছুচ্ছে ফুয়েল, পাম্পটাও কাজ করছে সুষ্ঠুভাবে।

এরপর ইলেকট্রিক সিস্টেম পরীক্ষা করা দরকার। শুরু করতে যাবে, তার শার্টের প্রান্ত ধরে টান দিল কেউ। বিরক্ত হলো অ্যানি, কিন্তু তাকাল না, বলল, 'হ্যাঁ, শুনছি, বলো কী বলতে চাও।'

কোন জবাব না পেয়ে রাগের সঙ্গে ঘাড় ফেরাল সে, অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। 'বানু!' দুষ্ট বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে আনল অ্যানি। 'ফর গডস সেক, এখানে তুমি এলে কীভাবে!'

'পালিয়েছি, মিস অ্যানি। হাসপাতাল তো একটা কয়েদখানা, আমার মত ছাগলছানা ওখানে কী করে থাকে, বলো?'

'মাই গড! কিন্তু এলে কীভাবে?'

'বাবার এক লোককে বললাম, একটা ঘোড়া চাই আমার। জানালা দিয়ে বেরিয়ে ওটার পিঠে চড়লাম। তারপর গিরিখাদ বেয়ে নামা, সে তো আমার জন্যে পানি।'

'তোমার সেই বন্ধুর কী হলো? যুবক ডাক্তার?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল অ্যানি, এখনও বানুর হাত ধরে আছে, মেয়েটির প্রতি তার দরদ আর ভালবাসা উপলব্ধি করে মনে মনে নিজেই খানিকটা বিস্মিত।

'ও, সে!' বানুর স্বরে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা। 'গোটা হাসপাতালে সেই ছিল সবচেয়ে নীরস আর একঘেয়ে। ডাক্তার! হুঁহ্! একটা

মেয়ে কি চায় তাই সে জানে না! আমি শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এমন কী শেখার আগ্রহও তার নেই।'

হাসি চেপে অ্যানি জিজ্ঞেস করল, 'আর তোমার পা? পা কেমন আছে?'

'ও কিছু না, ঠিক হয়ে গেছে।' জখমটাকে কোন গুরুত্বই দিল না বানু, যদিও অ্যানি লক্ষ করল আগের চেয়ে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। দীর্ঘ, দুর্গম গিরিখাদ বেয়ে নামতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল অ্যানি, একটা গাছের নীচে ছায়ায় বসাল।

'শুনলাম যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে,' বলল বানু। 'সেজন্যেই চলে এলাম।' চেহারাই বলে দেয় তার পায়ে এখনও ব্যথা আছে, কিন্তু সেটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে সে। 'শিফটারা নাকি মুভ করেছে?' চারদিকে চোখ বুলাল একবার। 'রানা, মাইকেল, ওদের দেখছি না যে? আব্বাসই বা কোথায়?'

'ওরা যুদ্ধে গেছে,' মৃদুকণ্ঠে বলল অ্যানি।

'যুদ্ধে গেছে? আর আমরা? আমরা এখানে কী করছি, মিস অ্যানি?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল বানুর।

'আমরা যাতে যেতে না পারি তার ব্যবস্থাও করে গেছে...।'

'কী!'

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল অ্যানি। সব শুনবার পর মাথায় হাত দিল বানু।

'পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করেছ কি মরেছ!' অবশেষে মন্তব্য করল সে। 'তবে আমাদেরও ওরা চেনে না—দাঁড়াও, ভেলকি দেখিয়ে ছাড়ব।' খানিকক্ষণ চিন্তা করল সে, ধীরে ধীরে হতাশার

ছায়া নামল চেহারায়। ‘কিন্তু আমার মাথায় যে কোন বুদ্ধি আসছে না! তবে কি ওরা শুধু একাই মজা লুটবে? আমরা যুদ্ধে যাব না?’

‘যাব, অবশ্যই যাব!’

বানুকে পাশে নিয়ে আর্মারড কারের এঞ্জিন পরীক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার, না চাইতেই সাহায্য করতে গিয়ে সে শুধু কাজে বিঘ্নই সৃষ্টি করল। ছয়বারের বার কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়ার পর অ্যানি জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে ভিকার্স মেশিনগান চালাতে হয় জানো তুমি?’

‘আমি পাহাড়ী মেয়ে, মিস অ্যানি,’ সগর্বে বলল বানু। ‘আমার জন্মই হয়েছে হাতে বন্দুক আর দু’পায়ের মাঝখানে ঘোড়া নিয়ে।’

‘দ্বিতীয়টা অবশ্য ঘন ঘন বদলাও,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, শুনতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল বানু। ‘না, আমি জিজ্ঞেস করছি, ভিকার্স মেশিনগান কখনও চালিয়েছ কিনা।’

‘না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল বানু, পরমুহূর্তে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘কিন্তু কীভাবে চালাতে হয় শিখতে এক মিনিটও লাগবে না আমার! অন্তত কীভাবে কাজ করে সেটা বলে দিতে পারব...।’

‘ওই যে!’ টারিটে খাড়া হয়ে থাকা ব্যারেলটা ইঙ্গিতে দেখাল অ্যানি। ‘চেষ্টা করে দেখো!’

আঁচড়াআঁচড়ি করে নিতম্বিনীর টারিটে উঠে পড়ল বানু, এতক্ষণে মন দিয়ে কাজ করবার সুযোগ পেল অ্যানি। আধঘণ্টা পর সবিস্ময়ে বলল সে, ‘বানু, পেয়ে গেছি! ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রডটা খুলে নিয়ে গেছে ও। তুমি শালা ভেবেছিলে...।’

টারিট থেকে মাথা তুলে তাকাল বানু। ‘কে? মাইকেল?’ জানতে চাইল সে।

‘না,’ জবাব দিল অ্যানি। ‘রানা।’

‘রানা?’ ভুরু কুঁচকে উঠল বানুর। ‘তার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি।’ নিতম্বিনীর টারিট থেকে নেমে এসে অ্যানির পাশে দাঁড়াল সে, কতটুকু কী ক্ষতি হয়েছে বুঝতে চায়।

‘ওরা সবাই সমান,’ বলেই অ্যানি উপলব্ধি করল, রানার প্রতি অবিচার করা হলো।

‘খুলে নিয়েছে, বলছ? তারমানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রাখতে পারে বলে তোমার ধারণা?’

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যানি। ‘ওর কাজে কোন খুঁত থাকে বলে তো মনে হয় না। সম্ভবত নিজের পকেটে।’

‘আমরা তা হলে কী করব এখন?’ হতাশায় হাত ছুঁড়ল বানু। ‘যুদ্ধটা তো আর বাদ দিতে পারি না!’

‘তা পারি না,’ অ্যানি অন্যমনস্ক। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করবার পর আবার মুখ তুলল সে। ‘তাঁবুর ভেতর, আমার ব্যাগে, একটা এভার-রেডি ফ্ল্যাশলাইট আছে। আর আছে একটা কসমেটিক কেস। দুটোই নিয়ে এসো, প্লিজ।’

বানুর কোমর থেকে ড্যাগারটা টেনে নিল অ্যানি, বাঁকা ফলা দিয়ে একটা ড্রাই-সেল ব্যাটারি খুলে ভিতর থেকে বের করল কার্বন রড। কসমেটিক কেস থেকে বেরুল নেইল-ফাইল, সেটা দিয়ে সাবধানে ঘষে রডটাকে সরু করল, তারপর ঢুকিয়ে দিল ডিসট্রিবিউটরের শ্যাফটে—প্রথমবার ক্র্যাঙ্ক-হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

‘তুমি দেখছি ভারি চালাক, মিস অ্যানি!’ বানুর বলবার সুরে এমন আন্তরিক প্রশংসা ফুটল, সারা শরীরে কোমল আদরের মধুর স্পর্শ অনুভব করল অ্যানি, চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক নিয়ে মুখ তুলল সে। ড্রাইভারের সিটের উপর দাঁড়িয়ে আছে বানু, মাথা

আর কাঁধ টারিটে, হাঁটু জোড়া ঠেকে আছে সিটের পিঠে।

'মেশিনগান কীভাবে কাজ করে শেখা হলো?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

অনিশ্চিতভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বানু, সরু একটা হাত রাখল মেহগনি পিস্তল গ্রিপে, পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে চোখ রাখল সাইটে। 'তুমি শুধু ওদের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও, মিস অ্যানি।'

ক্লাচ ছেড়ে দিল অ্যানি, গাছের ছায়া থেকে বাঁক নিয়ে পাথুরে ঢালের দিকে ছুট দিল নিতম্বিনী। ঢালটা নেমে গেছে ফানেল-এর ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তরে।

'রানার ওপর আমি খুব রেগে আছি,' ঘোষণা করল বানু, এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথের উপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে নিতম্বিনী, একবার এটা একবার ওটা ধরে স্থির থাকবার চেষ্টা করছে সে। 'দেখা হোক, মজাটা টের পাওয়াব! আমি তার কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার আশা করি না। কী? না, কার্বন রড খুলে নিয়েছে। ছি-ছিহ্! হ্যাঁ, মাইকেলের পক্ষে কাজটা শোভা পায়। কিন্তু রানা··· নাহ্, সে আমাকে হতাশ করেছে!'

'তাই?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা তাকে আমাদের শায়েস্তা করা উচিত।'

'কীভাবে?'

'খুব সহজেই বিচার করা যায় ওর। তুমি মাইকেলকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করো,' গম্ভীর সুরে পরামর্শ দিল বানু। 'আমার ধারণা, এভাবেই আমরা রানাকে শাস্তি দিতে পারি।'

ভারি স্টিয়ারিঙটাকে বুকের সঙ্গে প্রায় সেঁটে রেখেছে অ্যানি, গ্যাসপেডাল আর ক্লাচের উপর নাচছে তার পা, এত ব্যস্ততার মধ্যেও রানা সম্পর্কে বানুর কথাটা নিয়ে চিন্তা করল সে। ভাবতে গিয়ে বারবার বাধা পেল, কারণ চোখের সামনে বারবার ভেসে

উঠতে লাগল কিশোরসুলভ আন্তরিক হাসি নিয়ে রানার মুখ আর মায়াভরা চোখ, তার পুরুষালি কাঁধ আর পেশীবহুল শরীর, মাথা ভর্তি কালো চুল আর টিকালো নাক। তারপর ওর ব্যবহার, আচরণ, রুচি আর পরিমিতিবোধের কথা মনে পড়ল অ্যানির। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, এই মুহূর্তে একটা জিনিসই তার চাওয়ার আছে, আর তা হলো রানার সঙ্গ। উপলব্ধি করল, গিয়ে যদি দেখে রানা নেই, চলে গেছে, হতাশায় দম আটকে মারা যেতে পারে সে। 'প্রেমিক বাছাইয়ের কাজটা আমার হয়ে তুমি করে দেয়ায়, বানু, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ,' বলল সে। 'মানলাম, এব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা।'

'ধ্যেৎ, আমার লজ্জা লাগছে, মিস অ্যানি,' পাল্টা চিৎকার করল বানু। 'এ-সব ব্যাপার আমি ভাল বুঝি, এই আর কী।'

চার

বিকেলের দিকে বিদ্যুতের চমক আর গর্জন নিয়ে পশ্চিম দিকে উদয় হলো ঘন কালো মেঘ, অথচ খোলা প্রান্তরের মাথার উপর ঝকঝকে ইস্পাতকঠিন নীল আকাশে সূর্য গনগনে আগুন জ্বেলে রেখেছে, তাকিয়ে থাকা যায় না। প্রখর রোদে পুড়ছে মাটি, চারদিক থেকে ভাপ উঠছে, তাপ-তরঙ্গের ভিতর প্রতিটি বস্তু নাচছে, দূরে দৃষ্টি চলে না। এক পর্যায়ে পাহাড়গুলোকে এত কাছে মনে হলো, ওগুলো যেন আকাশ ছুঁয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে নির্ঘাত কাত হয়ে পড়ে যাবে লুকিয়ে রাখা জোড়া আর্মারড কারের উপর,

পরমুহূর্তে দূরে সরে গেল, সেই সঙ্গে ছোট হয়ে গেল আকারে।

রোদ লেগে গরম হয়ে আছে আর্মারড কারের খোল, ছুঁলে ফোস্কা পড়বে চামড়ায়। যারা অপেক্ষা করছে, রানা আর মাইকেল বাদে, বড় কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া আহতদের মত হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার সন্ধানে ব্যস্ত, রোদ হয়ে উঠেছে অত্যাচারী শত্রু।

প্রচণ্ড গরমের কারণে অনেক আগেই রামি খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লান্ত একজোড়া কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে রানা আর মাইকেল, লোমকূপ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, সাদা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আর মিহি লবণের প্রলেপ জমছে চামড়ায়।

পশ্চিম পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে মেঘের উপর চোখ বুলাল আব্বাস, বিড়বিড় করে বলল, 'একটু পরই বৃষ্টি হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, চঞ্চলার টারিটে নিষ্প্রাণ মর্মরমূর্তির মত বসে আছে ও।

সাদা একটা লম্বা কাপড় দিয়ে মাথা, বুক আর কাঁধ জড়িয়ে নিয়েছে রানা, বিনকিউলারটা রেখেছে কোলের উপর। কয়েক মিনিট পর পর চোখে তুলছে সেটা, নজর বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে সামনের প্রান্তর, তারপর আবার জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে আর্মারড কারগুলোর নীচ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল ছায়া, পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ল সূর্য, হারাতে শুরু করল চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতা, রোদে যোগ হলো লালচে আর হলদেটে ভাব। বিনকিউলারের লেন্সে দূরবর্তী আকাশের গায়ে সেঁটে থাকা কালো মেঘ মোচড় খেলো। আরও নীচে ম্লান আকাশ, তার নীচে ধূসর দিগন্তরেখা–সবই অস্পষ্ট, আন্দাজ করে নিতে হয়। মনে

হলো ধুলোর একটা মেঘ ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে দেখল রানা, তাপ-তরঙ্গের থামগুলো বাধা হয়ে আছে, আরও দূরে কী আছে দেখবার কোন উপায় নেই।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল রানা, কপালের চুল থেকে ঘামের স্রোত নেমে এসে চোখে পড়ল, লবণ লেগে জ্বালা করে উঠল চোখ। লিনেনের কাপড়টা দিয়ে চোখ ডলল ও, ঘন ঘন চোখ পিটপিট করল, তারপর আবার গ্লাস তুলল চোখে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল।

উত্তপ্ত বাতাসের খেয়ালি ঘূর্ণি হঠাৎ করে অদৃশ্য হলো। মাত্র ক'মিনিট আগে ধুলোর যে মেঘটাকে বহু দূরে ছোট দেখাচ্ছিল, এখন সেটা এত কাছে আর স্পষ্ট আকৃতি নিয়েছে যে লেন্সটা প্রায় ভরে উঠল। দ্বিতীয়বার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক—সচল ঢেউয়ের মত ধুলোর নীচে সচল যানবাহনগুলো যেন কালো পোকা। এক নিমেষে আবার দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তাপ-তরঙ্গ, সেই সঙ্গে অগ্রসরমান কলামের আকৃতি বদলে গেল, হয়ে উঠল দানবীয়, ঝুলে আছে ধুলোর কুয়াশার ভিতর—কাছে, প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে।

রানার চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে পাশে চলে এল মাইকেল।

'পাগল হয়েছ! এক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে!' হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, প্রতিবাদ জানাল সে।

'স্টার্ট দাও!' আবার কড়া ধমক দিল রানা। 'যা বলছি করো!' হড়কে ড্রাইভারের হ্যাচ গলে নীচে নামল ও।

গাড়ি দুটোর চারপাশে ছুটোছুটি পড়ে গেল। ক্র্যাঙ্ক ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিবাদমুখর এঞ্জিন ব্যাকফায়ার করছে, কারণ বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ায় ফুয়েল সাপ্লাই যথেষ্ট নয়।

অক্লান্তভাবে বারবার চেষ্টা করবার পর অবশেষে স্টার্ট দেওয়া গেল।

সশস্ত্র ছ'জন দেহরক্ষীর কাঁধে চড়ে মাইকেলের আর্মারড কারে উঠলেন কামাল হাসান, তাঁকে নামানো হলো ভিকার্স গানের পিছনে। কাজ শেষ করে নিজেদের পনিগুলোর কাছে ফিরে গেল তারা, লাফ দিয়ে পিঠে চড়ল, এই সময় কামাল হাসান আর্তনাদ করে উঠলেন।

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কামাল হাসান হাঁ করে আছেন, তর্জনী দিয়ে নিজের মুখের ভিতরটা দেখাচ্ছেন ওদেরকে। হাঁ-টা দাঁতহীন, এত বড় যে ছোটখাট একটা সিংহের বাচ্চা অনায়াসে ঢুকে যাবে বলে মনে হলো।

দেহরক্ষীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর প্রবীণদের মধ্য থেকে একজন তার স্যাডল ব্যাগ থেকে চামড়া মোড়া একটা বাক্স বের করল, সেটা নিয়ে ছুটে এল আর্মারড কারের দিকে। বাক্সটা খুলে উঁচু করে মাথার উপর তুলল সে, আহ্লাদে আটখানা চেহারা নিয়ে কামাল হাসান বাক্সের ভিতর হাত গলিয়ে বের করে নিলেন এক প্রস্থ কৃত্রিম দাঁত—প্রতিটি দাঁত মুক্তোর মত সাদা আর কোদাল আকৃতির, লাল মাড়ি সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দাঁতগুলো মুখে ফিট করতে সামান্যই ঝামেলা হলো, এবার তাঁর হাসিটা দেখতে হলো ঠিক ভূতের মত—কালো তোবড়ানো ফুটবল আকৃতির মুখের মাঝখানে ঝকঝকে সাদা দাঁত।

গোত্রপ্রধানের ভক্তরা উল্লাসে ফেটে পড়ল, আর আব্বাস খায়ের রানাকে জানাল, 'দাদু শুধু যুদ্ধ আর নতুন বিয়ে করার সময় দাঁত ব্যবহার করেন।' ছুটে আসা শিফটা কলামের দিক থেকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ ধাঁধানো দন্ত প্রদর্শনীর উপর

রানাও একবার চোখ বুলাল।

‘দাঁত থাকায় ওঁর বয়স অনেক কম দেখাচ্ছে,’ মন্তব্য করল ও। ‘নব্বুইয়ের চেয়ে একদিনও বেশি মনে হচ্ছে না।’ আর্মারড কার পিছিয়ে এনে গর্তের আরও নীচে নেমে এল, এখন শুধু উঁকি দিলে খোলা প্রান্তরে দেখতে পাবে শিফটাদের। অপর গাড়িটাকে পাশে আনল মাইকেল, খোলা হ্যাচ থেকে রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল সে। দুষ্টলোকের সকৌতুক হাসি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সমাগতপ্রায় সংঘর্ষ চুটিয়ে উপভোগ করবার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সে।

এখন আর বিনকিউলার ব্যবহার করবার দরকার নেই। শিফটা কলাম মাত্র দু’মাইল দূরে, ছুটে চলেছে শুকনো নালার সঙ্গে সমান্তরাল একটা পথের দিকে, যে পথটা অ্যামবুশের বাঁকা শৃঙ্গ ছাড়িয়ে, পাহাড়গুলোর মাঝখানে খোলা অরক্ষিত সমতল প্রান্তরে নিয়ে যাবে তাদেরকে। এই গতিতে এগোতে থাকলে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে কামাল হাসান বাহিনীর নাগালের বাইরে দিয়ে পাশ কাটাবে তারা, কোন বাধার সামনে না পড়েই পৌঁছে যাবে গিরিসংকটের মুখে।

নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে উদ্বেগের সীমা নেই রানার। উচ্ছৃংখল অশ্বারোহীরা একবার যদি ঝাঁক ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরকে আবার এক জায়গায় জড়ো করা অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাদের উপর আস্থা আছে রানার, বিশাল জনারণ্যের স্রোত তাদেরকে সামনের দিকে ঠেলে দিলে এক একজন অসুরের মত লড়বে, কিন্তু একবার যদি স্রোতের গতি রুদ্ধ হয় বা পিছু হটে, গোটা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, যে-যার প্রাণ নিয়ে ছুটবে পাহাড়ের দিকে আশ্রয় পাবার আশায়, কারও বাপের

সাধ্য নেই তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে।

উরুর উপর একটা ঘুসি মারল রানা, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টোপটা পরিবেশন করা না হলে ওদের রণকৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে, আদিবাসীরা মারা পড়বে পাইকারী হারে।

আদিবাসীদের পাইকারী হারে মরতে দেখেছে রানা, কিন্তু ওদেরকে যুদ্ধ করতে দেখেনি। ওরা একা, কারও সাহায্য পাবার আশায় না থেকে, যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত; যুদ্ধের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন এড়িয়ে চলে। কিন্তু যে-কোন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ামাত্র তা ছিনিয়ে নিতে ওস্তাদ, ক্রোধান্ধ সাপের মত ক্ষিপ্র।

একা যুদ্ধ করে বলেই প্রতিটি লোক তার নিজের কমান্ডার, সাধারণত নিজেকে নির্ভুল নির্দেশ দিতে তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। রানার উদ্বেগের কোন কারণ এইজন্যও নেই যে আদিবাসী যোদ্ধারা অ্যামবুশ পাতার বা ফাঁদে ফেলবার কৌশল ছোটবেলা থেকেই শেখে, প্রথম যখন তাদের হাতে রাইফেল আসে।

দূর থেকে দেখে মনে হলো সামনের সারির শিফটা যানবাহনের চাকা থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে ছুটন্ত একদল রাসটা ঘোড়সওয়ার, মাটির উপর এক ঝাঁক পাখির মত ভাসছে, কাঁপা কাঁপা আর ভোঁতা আকৃতি, ধুলোর ম্লান আবরণে মোড়া। তারপর দেখা গেল, শিফটা লাইনের সামনে রয়েছে ঘোড়সওয়াররা, তির্যক একটা পথ ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে লুকিয়ে থাকা আদিবাসী বাহিনীর মধ্যভাগ লক্ষ্য করে।

প্রায় সেই মুহূর্তে কলামের মাথা থেকে একটা গাড়ি আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল, উড়ন্ত ঘোড়সওয়ারদের সামনের পথ লক্ষ্য করে ছুটল। গাড়িটার গতি ভীতিকর, এত দ্রুত কাছে চলে এল যে অশ্বারোহীরা দিক বদলাতে বাধ্য হলো, বাধ্য হলো লুকিয়ে রাখা

আর্মারড কার দু'টোর দিকে সরে আসতে।

তীব্রগতি নিঃসঙ্গ গাড়িটার পিছনে শিফটা কলাম তার নিরেট আকৃতি হারাল। সামনের অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হলো, দীর্ঘ আগোছাল একটা রেখার আকৃতি নিয়ে ধাওয়া করল ঘোড়সওয়ারদের। ওগুলো সব ক'টা ভারি যান, ক্যানভাসে মোড়া মাথা আর ছাদ, গতি মন্থর—এতই মন্থর যে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর নাগাল পাবার সাধ্য নেই।

তবে ছোট গাড়িটা মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমিয়ে আনল। ভাল করে দেখবার জন্য একটু উঁচু হলো রানা, বিনকিউলার তুলল চোখে। প্রথমবার ওয়েলস অভ চাল্ডিতে দেখেছিল ও, রোলস-রয়েসটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না। পালিশ করা গা চকচক করছে রোদে, পিছনের চাকায় ধুলোর ঘূর্ণি যেন টগবগ করে ফুটছে।

হঠাৎ ব্রেক করল ড্রাইভার, চাকা পিছলে যাওয়ায় রানার দিকে আড়াআড়ি হয়ে গেল রোলস-রয়েস, ধুলোর পাহাড় তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনের সিট থেকে নীচে ঢলে পড়ল একটা শরীর।

লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখল রানা, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরপর সাতটা গুলি করল সে।

অশ্বারোহীরা দ্রুত রোলস-রয়েস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ধুলোর পর্দা বা দূরত্ব মার্কসম্যানকে বিভ্রান্ত করেত পারল না। প্রতিটি গুলির শব্দের সঙ্গে একটা করে ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, আকাশের দিকে পা তুলে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, গড়াগড়ি খেলো মাটিতে, অবশেষে স্থির হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে রোলস-রয়েসে উঠে পড়ল লোকটা, আবার শুরু হলো ধাওয়া, বেঁচে যাওয়া অশ্বারোহীরা নাগালের মধ্যে চলে আসছে,

গাড়ির পিছনে ঝুলে আছে অতিকায় ট্রাক আর ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্টার বহর–মানুষ, ঘোড়া, গাড়ি সমস্ত কিছু নিয়ে অব্যাহত গতিতে গড়াতে গড়াতে রানা ও মাইকেল সেভারসের রচিত নিধন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে।

'বাস্টার্ড!' রাগে কেঁপে উঠল রানা, রোলস-রয়েসটাকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল। ইটালিয়ান লোকটা অশ্বারোহীদের খুব বেশি কাছে যাবার ঝুঁকি নেয় না। আদিবাসীদের মান্ধাতা আমলের রাইফেল-রেঞ্জের বাইরে থাকছে সে, প্রতিবার একজন করে লোককে ফেলছে, পাখি শিকারের মত অলস ভঙ্গিতে, প্রায় কৌতুকের সঙ্গে। রানার কাছ থেকে কম করেও হাজার গজ দূরে, তবু ইটালিয়ান মার্কসম্যানের নড়াচড়ার মধ্যে রক্ত পান করবার একটা ব্যাকুলতা পরিষ্কার অনুভব করতে পারল ও। স্রেফ আনন্দ পাবার জন্য খুন করছে সে, খুন করবার রোমাঞ্চ আর উত্তেজনাটুকু সারা শরীরে উপভোগ করবার নেশায়।

এখন যদি বাধা দেয় ওরা, এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা বিশৃংখল কলামের পাশ থেকে, পলায়নপর অশ্বারোহীদের বেশ ক'জনকে বাঁচানো সম্ভব হবে। কিন্তু শিফটা কলাম এখনও পুরোপুরি ফাঁদের ভিতর ঢোকেনি। বিনকিউলার ঘুরিয়ে তাপ-তরঙ্গ আর ধুলোর ভিতর অস্পষ্ট প্রান্তরের দিকে চোখ বুলাল রানা, এই প্রথম লক্ষ করল একেবারে পিছন দিকে শিফটাদের দশটা ট্রাক রয়েছে, অশ্বারোহীদের পিছু ধাওয়ায় অংশগ্রহণ করেনি।

ছোট্ট একটা গ্রুপ, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে যেন ওগুলোকে খুব কড়া নিয়ন্ত্রণের ভিতর আটকে রেখেছে, ধুলোর পাহাড়ের ভিতর অস্পষ্ট ভারি যানবাহনগুলো থেকে দু'মাইল পিছনে।

গ্রুপটার দিকে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারল না রানা,

কারণ এদিকে আবার পাখি শিকার শুরু হয়েছে—ইটালিয়ান মার্কসম্যান একটা করে গুলি ছোঁড়ে, অশ্বারোহীদের একজন বাহন নিয়ে ধরাশায়ী হয়, সেই পুরনো দৃশ্য।

বাধা দেওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা এবার অস্থির করে তুলল রানাকে। নিজের সঙ্গে তর্ক করছে ও। জানে, এখনও সময় হয়নি। কিন্তু নিজেকে বোঝাল, সময় হয়নি বলে লোকগুলোকে অসহায় ভাবে মরতে দেওয়া যায় না। ডান পা সজোরে চেপে ধরল থ্রটলে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এঞ্জিন, কিন্তু মাইকেল ওকে দেরি করিয়ে দিল। রানাকে আগে থেকেই লক্ষ করছিল সে, ওর চেহারায় ভাবাবেগ ফুটে উঠতে দেখে তৈরি ছিল মনে মনে। চঞ্চলা রওনা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গরবিনীও স্টার্ট নিল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রানার সামনে চলে এসেছে মাইকেল, একেবারে রাস্তা বন্ধ।

'মরার খুব শখ, কী?' চিৎকার করে বলল সে। 'তোমার ভেতর হিংস্র পশুটাকে দমন করো, ওল্ড চ্যাপ। পুরো অনুষ্ঠানটা তুমি ভণ্ডুল করতে চাইছ।'

'ঘোড়ার পিঠে ওরা...তুমি দেখতে পাচ্ছ না?' রাগের সঙ্গে পাল্টা চিৎকার করল রানা।

'যার যা ঝুঁকি তাকে তা নিতেই হবে,' রানাকে থামিয়ে দিল মাইকেল। 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, তোমার সেকেলে সেন্টিমেন্ট আমাদের দু'জনকেই বিপদে ফেলবে।'

এই পর্যায়ে তর্কযুদ্ধে আরও একজন নাম লেখাল। মাইকেলের উপর টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কামাল হাসান। হাতের অস্ত্র হিসাবে তিনি একটা তরোয়াল বেছে নিয়েছেন—ফলাটা লম্বা আর অসম্ভব চওড়া, কোপ মারবার সময় দু'হাতে ধরতে হয়। উত্তেজনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এরপর আর তাঁর পক্ষে চুপ করে থাকা

সম্ভব হলো না। বুকের রক্ত ছলকানো বিকট রণোল্লাস বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে, মাথার পিছনে তরোয়ালটা বনবন করে ঘোরালেন–তরোয়ালের ফলা আর কৃত্রিম দাঁত, দুটোই ঝিক করে উঠল রোদ লেগে।

তিনি তাঁর উন্মত্ত রণহুংকারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়লেন, প্রতিটি লাথি তাঁর ড্রাইভারকে লাগল। তাকে তিনি কাপুরুষ ইত্যাদি বলে গালিগালাচ করছেন আর সাহস দিয়ে বলছেন, ভয় নেই, আমি একাই শত্রু নিধন করব, তুমি শুধু ওখানে পৌঁছে দাও আমাকে। তার উড়ন্ত পা থেকে বাঁচবার জন্য মাথা সরিয়ে নিল মাইকেল।

'উন্মাদ!' ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'আমি একদল উন্মাদের খপ্পরে পড়েছি!'

'মেজর সেভারস,' হাঁক ছাড়ল আব্বাস খায়ের, তারও তর সইছে না। 'আমার দাদু আপনাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'

'তোমার দাদুকে বলো জাহান্নামে...' কিন্তু পাঁজরে আরেকটা লাথি খেয়ে জবাবটা শেষ করতে পারল না মাইকেল।

'অ্যাডভান্স!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল আব্বাস।

'খোদার দোহাই, পথ ছাড়ো!' দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

'ইয়া-আ-আ-হু!' গর্জে উঠলেন কামাল হাসান, টারিটে আধপাক ঘুরে তাঁর দেহরক্ষীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে আদেশ দিলেন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। আর কিছু জানবার বা বুঝবার ইচ্ছে হলো না, গোত্রপ্রধানের নির্দেশ পেয়ে তারাও বিকট রণহুংকার ছাড়ল, গুঁতো মারল পনির পাঁজরে, পাথুরে নালার মেঝেতে খটাখট খটাখট পায়ের আওয়াজ তুলে ঝড়ের বেগে আর্মারড কার দুটোর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলো।

আরোহীরা মাথার উপর হাতে ধরা রাইফেলগুলো নাচাচ্ছে, বাতাসে পত পত করে উড়ছে আলখেল্লার প্রান্ত, নালার প্রায় খাড়া পাড় টপকে উঠে পড়ল খোলা প্রান্তরে, তীরবেগে ছুটল শিফটা কলামের এলোমেলো একটা পাশ লক্ষ্য করে।

'ওহ্, মাই গড!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাইকেল। 'সব শালা এক একজন জেনারেল...!'

'দেখো! ওদিকে দেখো!' হাত তুলে নালার পিছন দিকটা দেখাল রানা, পরমুহূর্তে সবাই ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখে মনে হলো মাটি যেন দু'ফাঁক হয়ে গেছে, উগরে দিচ্ছে সারির পর সারি ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার। পাহাড়ের নীচেটা একটু আগে যেখানে খাঁ খাঁ করছিল, এখন সেখানে মানুষ আর ঘোড়া গিজ গিজ করছে, শয়ে শয়ে, সামনে মাথা দিয়ে নাক বরাবর সোজা ছুটে যাচ্ছে শিফটা কলামের দিকে।

গোটা দৃশ্যের উপর ঝুলে আছে ধুলোর পাহাড়, মোচড় খাচ্ছে, ঢেকে দিচ্ছে সূর্যটাকে, ফলে ঘোড়া আর বাহনগুলো থমথমে মেঘের নীচে কালো কাঠামো মাত্র, ম্লান রোদ লেগে রাইফেল আর তরোয়াল ঝলসে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

'তোমরাই জিতলে,' তিক্ত কণ্ঠে রাজি হলো মাইকেল, চঞ্চলার সামনে থেকে গরবিনীকে পিছিয়ে আনল সে, তারপর নালার খাড়া পাড়ের দিকে নাক ঘোরাল।

পাড় বেয়ে একসঙ্গে উঠে এল দুটো গাড়ি, সামনের দু'জোড়া চাকা পাশাপাশি থাকল।

ওদের সামনে কোন বাধা নেই, দূরে রয়েছে আড়াআড়িভাবে শিফটা কলাম—এক লাইনে বহু যানবাহন, প্রতিটির গা নরম ধাতুর তৈরি—অত্যন্ত লোভনীয় টার্গেট। দুই লৌহমানবী সগর্জনে সামনে

ছুটল, এঞ্জিনের শব্দে নতুন একটা সুর শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো রানার—ওগুলোও যেন অনেকদিন পর আবার নিজেদের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। চট করে একবার গরবিনীর উপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। গরবিনীর চেহারা গাঢ় রঙ মেখে আগের চেয়ে কুৎসিত হয়েছে, তবে তার চাকাগুলোয় যোগ হয়েছে নতুন প্রাণশক্তি।

'আগে বাড়ো, আয়রন লেডিস!' জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল রানা, গরবিনীর হ্যাচ থেকে মাথা তুলে ওর দিকে ঘাড় ফেরাল মাইকেল। তার ঠোঁটের কোণে সদ্য ধরানো একটা চরুট ঝুলছে, ওটা যেন আপন গুণেই লটকে আছে ওখানে, চারধারে ফুটে আছে নিঃশব্দ হাসি।

'কচুকাটা করো শালাদের,' অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা, মাইকেলের শেষ কথাটা এঞ্জিন আর বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ে গেল। ওর সামনে অকস্মাৎ আলোড়ন আর গতিবির্ধির প্যাটার্নটা বদলে গেল। নিঃশঙ্কচিত্তে ধাওয়ারত শিফটা যোদ্ধারা হঠাৎ করে টের পেয়েছে, সুনিপুণ কৌশলে পাল্টে দেওয়া হয়েছে ভূমিকা।

পাঁচ

রাইফেল তুলল কাউন্ট ডিকানডিয়া, অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিশানা স্থির করল, দম আটকে রেখেছে, টেনে দিল ট্রিগার। ম্যানলিকার হাই-ভেলোসিটি রাইফেল, দূরত্ব একশো মিটারের বেশি নয়।

লেগেছে, পরিষ্কার দেখতে পেল সে। লোকটা ঝাঁকি খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়ার ঘাড়ে, কিন্তু পিঠ থেকে খসে মাটিতে

পড়ল না। হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল, মাটিতে ডিগবাজি খেলো সেটা, অথচ লোকটা ঠিকই কেশর আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকল ঘোড়ার পিঠে, তার নোংরা সাদা আলখেল্লা শ্রুতি রাঙা হয়ে উঠল।

'কী! এত বড় স্পর্ধা! আমাকে অপমান করে!' হাঁসফাঁস করতে করতে আবার রাইফেল তুলল কাউন্ট, লক্ষ্যস্থির করল ঘোড়ার কাঁধ আর ঘাড় যেখানে মিলিত হয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ঘোড়া, ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে পড়ল আরোহীর গায়ের উপর, এত দূর থেকেও আরোহীর ফুসফুস ফেটে যাওয়ার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল সে।

হেসে উঠল কাউন্ট, উত্তেজনায় উন্মাদ। 'ক'টা, সাতা? এটা নিয়ে ক'টা হলো?'

'আটটা, মাই কর্নেল!'

'মুখে মুখে হিসাব রাখছ? অ্যাই বেজন্মা, লিখে রাখতে কী হয়েছে? লেখো...বাইশটা!'

'জ্বে-আজ্ঞে,' বুক পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লিখবার সময় সংখ্যাটা পড়ল সার্জেন্ট বানানটো সাতা,... 'বত্রিশটা!'

'তোমার ভাতা দ্বিগুণ করে দেয়া হবে...,' আশ্বাস দিল কাউন্ট।

'হবে? হয়নি? মাই কর্নেল...!'

'লিখতে থাকো, লিখতে থাকো,' বাধা দিয়ে আবার রাইফেল তুলল কাউন্ট, সাইটে চোখ রেখে পরবর্তী টার্গেট খুঁজছে। হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেল সে, রাইফেলের ব্যারেল নড়ে গেল, নেমে এল মাটির দিকে, মাজল্‌টা তার জুতোর চকচকে ডগার দিকে হাঁ করে থাকল। যেন কব্জা খুলে পড়ায় তার নীচের চোয়াল ঝুলে

পড়ল, রাইফেল ব্যারেলের সঙ্গে সহানুভূতিসূচক প্রতিক্রিয়ায়। ধাওয়া করবার উত্তেজনায় সে ভুলেই গিয়েছিল ভয় কাকে বলে, অকস্মাৎ প্রবল বন্যার তোড়ের মত ফিরে এল সেটা দেহ-মনে। অনুভব করল, পেটে পানি ছাড়া কিছু নেই, পা দুটো রাবারের। 'ঈশ্বরের মা!' বিড়বিড় করে উঠল সে।

গোটা দিগন্তরেখা জ্যান্ত আর সচল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিসীমার এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন একটা রেখা সবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। কী দেখছে, বুঝতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল তার। আগে ছিল বারোজন ঘোড়সওয়ার, তাদের ধাওয়া করছিল সে, এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার অশ্বারোহী আদিবাসী, আর ধাওয়া করে এমন দুর্বার গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে যে চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। চোখ ফেরানোর সাধ্য নেই, সে দেখতে পেল সারির পর সারি শত্রুরা যেন তার সামনের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে, ধুলোর পাতলা একটা আবরণ ভেদ করে। সূর্যের লাল রোদে তরোয়ালের নগ্ন ফলাগুলো রক্তমাখা লাগল, আর ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর পায়ের আওয়াজ বজ্রপাতের মত শোনাল। অস্পষ্টভাবে কানে এল অসংখ্য মানুষের রণহুংকার।

'ডিনো! ডিনো!' আর্তনাদ করে উঠল কাউন্ট। 'তোমার হাতে আমার প্রাণ, আমার হাতে তোমার প্রাণ! এখান থেকে নিয়ে চলো আমাকে–জলদি!' এ-ধরনের আবেদন সরাসরি ড্রাইভারের হৃদয় স্পর্শ করে, কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ি ঘোরাল সে, ঝাঁকি খেয়ে কাউন্টের দুর্বল পা ভাঁজ হয়ে গেল, ধপাস করে ব্যাক সিটের নরম গদিতে পড়ে গেল সে। 'সময়মত নিরাপদ জায়গায় ফিরতে না পারলে তোমাকে আমি গুলি করব!'

রোলস-রয়েসের পিছনে আর দু'পাশে সিকি মাইল ব্যাপ্তি নিয়ে

ত্রিশটা ধূসর রঙের ফিয়াট ট্রুপ-ক্যারিয়ার ছুটে আসছিল। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবার পরও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল ড্রাইভাররা, রোলস-রয়েসকে ধরতে পারেনি, শেষ পর্যায়ে দূরত্ব থেকে যায় এক হাজার গজের মত। তবে ধাওয়া করে শিকার বধের উত্তেজনা শিফটা সৈনিকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, কাউন্ট ডিকানডিয়ার প্রতিটি সাফল্য তাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলে, ট্রাকের উপর ধেই ধেই করে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দেয় তারা।

ট্রাক বহরের এই নিরেট মিছিল, যেন চাকার সঙ্গে লেগে আছে চাকা, এমন পবলবেগে ছুটছে যে ফিয়াট কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী দেখতে পেলে নির্ঘাত মূর্ছা যাবে। ঠিক এই সময়, গতি না কমিয়ে উল্টোদিকে ছুটবার জরুরী একটা তাগাদা অনুভব করল ড্রাইভাররা।

সামনের সারির দু'জন ট্রাক ড্রাইভার বাকি সবার চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাকুল মনের ডাকে সাড়া দিল, বন বন করে ঘুরিয়ে লক করে দিল হুইল, একজন বাঁ দিকে এবং অপরজন ডান দিকে, ফলে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধাবমান দুটো ট্রাক পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হলো। সগর্জনে মাথাচাড়া দিল বাষ্প, আর কাঁচের গুঁড়ো। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ধাক্কায় কর্কশ যে আওয়াজ উঠল তাতে ভয় পেয়ে পাহাড়ের গর্তে মুখ লাকাল ইঁদুর আর শিয়ালের দল। দুই ট্রাকের আরোহীরা, যারা প্রথম ধাক্কায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়নি, গমের দানার মত ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে, যারা পড়ল না তারা বাহনের গায়ে খাড়া হয়ে থাকা ইস্পাতের খুঁটি বা অন্য কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাল বা মারা পড়ল। ট্রাক দুটোকে এখন আর আলাদাভাবে চিনবার উপায় নেই, জোড়া লেগে গেছে, সবটুকু ধুলো সরে যাবার আগেই হুপ করে বিকট

একটা আওয়াজের সঙ্গে পায়ের তলায় কেঁপে উঠল মাটি, বিস্ফোরিত হলো তোবড়ানো ফুয়েল ট্যাংক, টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠল আগুন আর কালো ধোঁয়া।

বাকি ট্রাকগুলো বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনায় পড়ল না, দিক বদলে নিজেদের তৈরি ধুলোর পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটল, রণহুংকার তুলে পিছু ধাওয়া করে আসছে আদিবাসী অশ্বারোহী বাহিনী।

শত চেষ্টা করেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকানোর সাহস হলো না কাউন্টের, নিশ্চিতভাবে জানে তাকালেই সে দেখতে পাবে তার কুঁকড়ে থাকা নিতম্বের দিকে তাক করা রয়েছে ধারাল আর লম্বা একটা তরোয়াল। তার ঘুসি হাতুড়ির বাড়ির মত, অনবরত পড়ছে ড্রাইভারের ঘাড়, কাঁধ আর মাথায়।

'জোরে! আরও জোরে! তোর সাথে মেয়ের বিয়ে দেব, আমাকে বাঁচা, ভাই!' প্রলাপ বকছে কাউন্ট। 'জোরে! আরও জোরে! তা না হলে তোকে আগুনে পোড়াব!' ড্রাইভারের একটা কানের পিছনে আবার ঘুসি মারল সে, এলোমেলো বহরের একটা ট্রাককে রোলস-রয়েস ওভারটেক করছে দেখে খানিকটা স্বস্তির পরশ অনুভব করল।

এতক্ষণে তার মনে হলো, এবার পিছনে তাকানো নিরাপদ, কারণ হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেছে দৌড় প্রতিযোগিতায় যে-কোন অশ্বারোহীকে হারিয়ে দেবে রোলস-রয়েস। চোখে-মুখে রক্ত আর মনে সাহস ফিরে আসায় গরম একটা অনুভূতি হলো তার।

'আমার রাইফেল, সাতা!' হাঁক ছাড়ল কাউন্ট। 'রাইফেলটা দাও আমাকে!'

কিন্তু পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহীদের ছবি তুলবার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত বানানটো সাতা।

কাউন্ট তার হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল সার্জেন্টের কোমরে। ‘খচ্চরের বাচ্চা, এটা যুদ্ধ!’ গর্জে উঠল সে। ‘আর আমি একজন বীরযোদ্ধা। দে, রাইফেল দে!’

কথাটা শুনে ড্রাইভার ডিনোর ধারণা হলো, কাউন্ট বোধহয় আশা করছে গাড়ির গতি কমানো হবে, তা না হলে সে যোদ্ধাসুলভ বীরত্ব কীভাবে প্রদর্শন করবে। কিন্তু গাড়ির গতি একটু কমতেই, আবার তাকে কাউন্টের ঘুসি খেতে হলো।

‘খচ্চরের বাচ্চা! মরার ইচ্ছে হলে তুই নিজে মর, আমাকে নিয়ে কেন!’

অঢেল স্বস্তি অনুভব করল ড্রাইভার, থ্রটলে পা চেপে ধরল সে, লাফ দিয়ে আবার সামনে ছুটল রোলস-রয়েস।

কাউন্টের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে বানানটো সাতা, রাইফেলটা খুঁজে পেয়ে সিধে হলো সে। তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল কাউন্ট।

‘লোড করা, মাই কাউন্ট।’

‘সাহসী বালক, ধন্যবাদ।’ নাভির নীচে বাঁট ঠেকিয়ে রাইফেলটা খাড়া করে রাখল কাউন্ট, গুলি করবার জন্য লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে।

ইতিমধ্যে আদিবাসী অশ্বারোহীরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে, রোলস-রয়েসও প্রায় সব ক’টা ট্রুপ-ক্যারিয়ারকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এসেছে–ক্যারিয়ারগুলো এখন অশ্বারোহী আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে। ড্রাইভারকে একপাশে সরে যাবার নির্দেশ দেবে কিনা ভাবল কাউন্ট, তা হলে শত্রুদের দিকে গুলি করবার জন্য সুযোগ পাবে সে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে অশ্বারোহীদের গুলি করে ফেলে দিতে কী যে মজা, মনে পড়ে গেল

তার। ব্যাকসিটের পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে, তাকাল সেদিকে।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল কাউন্ট। অদ্ভুত একজোড়া আকৃতি, পিঠে কুঁজ, খোলা ঘাসজমির উপর দিয়ে ধেয়ে আসছে। বিকলাঙ্গ দুটো উটের মত লাগল ওগুলোকে, এমন ভারসাম্যহীন আলগা একটা বিদঘুটে ভাব নিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে যে একাধারে কৌতুককর এবং ভীতিকর মনে হলো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে একটা ঝাঁকি খেলো কাউন্ট, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল, ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে সে উপলব্ধি করল, কিম্ভূতকিমাকার মেশিন দুটো তির্যক পথ ধরে তার পালানোর পথ বন্ধ করতে আসছে।

'ডিনো!' করুণসুরে কেঁদে উঠল কাউন্ট ডিকানডিয়া, ম্যানলিকারের বাঁট দিয়ে ড্রাইভারকে মারল। জোরাল কোন আঘাত নয়, স্রেফ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, তবে ইতিমধ্যে আরও অনেক মার খেয়ে বেচারা রক্তাক্ত হয়ে আছে। শক্ত করে হুইল ধরে থাকল সে, আঙুলের গাঁট আর ডগা সাদা হয়ে আছে, সরাসরি নবাগত শত্রুদের দিকে সগর্জনে ছুটে চলল রোলস-রয়েস।

'ডিনো!' কান্না ভুলে গেল কাউন্ট, আর্তনাদ করে উঠল সে, সামনের আর্মারড কারের মাথায় লম্বাটে আর মোটা কী যেন একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে সে, সিলিন্ডারের মত, পাইপ আকৃতির মাজল ভারি ওয়াটার-জ্যাকেট থেকে বেরিয়ে আছে।

'ও আমার ঈশ্বরের দয়াবতী মা!' আর্মারড কার সামান্য ঘুরে গেল, সেই সঙ্গে ভিকার্স মেশিনগানের মাজল সরাসরি কাউন্টের দিকে হাঁ করল। 'ইউ ফুল !' ড্রাইভার ডিনোকে আবার রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারল সে। 'ঘোরো!' ঈশ্বর সাক্ষী, আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী! বাঁক নাও! ঘোরো!'

ডিনো আসলে মার খেয়ে কাঁদছে, তার চোখে পানি, দৃষ্টি

ঝাপসা। তার দুঃখ, মার খেয়ে কাঁদছে, অথচ তারপরও কাউন্ট তাকে মারছে। মনের দুঃখে গাড়ি চালাচ্ছে সে, সামনে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। অশ্রুমুক্ত হবার জন্য চোখ পিট পিট করল সে, সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, ভীষণ আতংকের সঙ্গে দেখতে পেল উট সদৃশ একটা বিশাল বাহন ঝুলে রয়েছে তার সামনে। বন বন করে হুইল ঘোরাল ডিনো, ঠিক যখন বিস্ফোরিত হলো ভিকার্স মেশিনগানের মাজল। পরমুহূর্তে রোলস-রয়েসের চারদিকের বাতাস হিস হিস শব্দে ছিঁড়তে শুরু করল, মনে হলো শত শত চাবুকের বাড়ি মেরে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে প্রকৃতিকে।

একটা ট্রাকের ক্যাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর লুইগি রাকা, চোখে বিনকিউলার, চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে বহুদূর প্রান্তরে আলোড়িত ধুলোর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে—ধুলোর ভিতর অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া কিছু আকৃতি আপাতদৃষ্টিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দশটা ট্রাককে আটকে রাখবার জন্য শারীরিক উপস্থিতি আর কর্তৃত্বের সবটুকু কাজে লাগাতে হয়েছে মেজর রাকাকে। ওগুলোয় আর্টিলারির লোকজন রয়েছে, প্রতিটির পিছনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে চাকা লাগানো ফিল্ড পীস। আর সবার মত শত্রুপক্ষের ছোট্ট অশ্বারোহী দলটার দিকে ছুটে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আর্টিলারির লোকজন, অনেক কষ্টে তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে।

ধুলোর ভিতর কী ঘটছে পরিষ্কার নয়, মেজর ভাবল মাউন্ট আপ-এর অর্ডার দেবে কিনা। এই সময় আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সে। মনে হলো, ধুলোর ভিতর ছুটোছুটির

নকশাটা বদলে গেছে। ধুলোর কিনারায় বেরিয়ে আসা একটা আকৃতি হঠাৎ চিনতে পারল সে, ফিয়াট ট্র্যান্সপোর্ট, সবেগে তার দিকে ফিরে আসছে সেটা, ক্যানভাস ছাদে উপচে পড়ছে লোকজন, সবাই তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

বিনকিউলার আরেক দিকে ঘোরাল মেজর। ধুলোর রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এল আরেকটা ট্রাক, সরাসরি তার দিকেই ছুটে আসছে। ওটার ছাদ থেকে এক সৈনিক তার পিছনের ধুলো লক্ষ্য করে গুলি করছে, আশপাশে ছাদের কিনারা ধরে ঝুলে রয়েছে তার সঙ্গী-সাথীরা, ঝুলে থাকবার ভঙ্গি আড়ষ্ট, তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

একটা আওয়াজ শুনল মেজর, চিনতে পেরে তার চামড়ার নীচে ভয়ের অনুভূতি কিলবিল করে উঠল। ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না, ব্রিটেনে তৈরি ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ চেনে সে। শব্দের উৎসের দিকে ছুটল তার দৃষ্টি। ডান দিকে প্রসারিত শিফটা কলামও এখন লেজ তুলে পালিয়ে আসছে, সম্পূর্ণ দিশেহারা আর বিশৃংখল। কুঁজ বিশিষ্ট আকৃতিটা দেখতে পেল সে, হেলেদুলে অথচ তীব্রবেগে সরাসরি শিফটা ট্র্যান্সপোর্টার বহরের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ছুটছে। ওটা একটা আর্মারড কার, জানে সে। জানে ফিয়াট ট্রাকগুলোর গা ওটার তুলনায় নরম তুলতুলে।

'কামানের ঢাকনি খোলো!' অকস্মাৎ নির্দেশ দিল মেজর রাকা। 'শত্রুর আর্মার মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হও!'

আর্মারড কারের টারিটে ভিকার্স মেশিনগানের রয়েছে বল-টাইপ মাউন্টিং। ব্যারেল তোলা বা নামানো যায়, কিন্তু ডান বা বাম দিকে দশ ডিগ্রির বেশি ঘোরানো যায় না—বল-টাইপ মাউন্টিঙের এটা একটা দুর্বলতা। তাই ড্রাইভারকে গানলেয়ার-এর ভূমিকাও পালন করতে হয়, অস্ত্র তাক করবার জন্য তাকে প্রয়োজনমত

গাড়ি ঘোরাতে হবে।

ব্যাপারটা কামাল হাসানের জন্য সহ্যসীমার বাইরে উৎকট একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিবার একটা করে টার্গেট নির্বাচন করে সে, বিশুদ্ধ অ্যামহারিক ভাষায় ড্রাইভারের উদ্দেশে হুংকার ছাড়ে, ওদিকে ড্রাইভার মাইকেল সেভারস অ্যামহারিক ভাষার কিছুই বোঝে না, ইতিমধ্যে নিজেই অন্য একটা টার্গেট বাছাই করেছে। টার্গেটের দিকে নিশানা স্থির করছে সে, কিডনিতে দমাদম লাথি খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দশা হলো তার, কামাল হাসান বোঝাতে চাইছেন তাঁর টার্গেটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ফলশ্রুতিতে গরবিনী তার সমস্ত গুণাগুণ বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠল উন্মাদিনী, শিফটা কলামের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রত্যাশিত পথ ধরে ছুটল, মাঝে মধ্যে পাক খেলো, তিক্ত ভাষায় ক্রুরা পরস্পরের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ একরকম প্রায় গ্রাহ্যই করল না।

ওদিকে চঞ্চলা রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রোলস-রয়েসকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলির প্রথম ঝাঁকটা কাজে লাগেনি, ধুলো আর অস্থির ট্রাক বহরের আড়ালে হারিয়ে গেছে গাড়িটা। কিন্তু তার পর থেকে রানা আর আব্বাস পারস্পরিক সমঝোতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে সাফল্য।

'বাঁ দিকে, মাসুদ ভাই! বাঁ দিকে!' চেঁচিয়ে বলল আব্বাস, ভিকার্সের সাইটে চোখ, সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শিফটাদের একটা ট্রাক, মাত্র একশো গজ দূরে।

'হয়েছে, ব্যাটাচ্ছেলে আমার নাক বরাবর সামনে!' ভাইজরে ট্রাকটা উদয় হতেই পাল্টা চিৎকার করল রানা। ভাইজরটা সরু, গায়ে কয়েকটা ফুটো নিয়ে ইস্পাতের একটা পাত, শুধু সামনের

খানিকটা দেখা যায়, তবে টার্গেটকে একবার দেখতে পেলে পিছু ছাড়বার নাম করে না রানা, ধাওয়া করে বিশ গজের মধ্যে চলে আসে—এবারও তাই হলো।

ট্রাকের গা থেকে কালো শার্ট পরা পদাতিক সৈনিক উপচে পড়ছে, তাদের কেউ কেউ চঞ্চলাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। ইস্পাতের খোলে লেগে পিছলে আরেক দিকে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। ট্রাকের ভিতর যত না সৈনিক, তারচেয়ে বেশি ঝুলে আছে গায়ে। ট্রাকের কিনারায় দু'হাত, আড়ষ্ট ভঙ্গি, রক্তহীন সাদা মুখে তাকিয়ে আছে পিছনে, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা অথবা ঝাঁঝরা হবার অপেক্ষায় আছে।

'শূট, আব্বাস!' অনুমতি দিল রানা। আব্বাসের প্রতি খুশি ও, নির্দেশ না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত একটাও গুলি করেনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে নির্দেশ পাওয়ায় আব্বাসের একটা গুলিও অপব্যয় হলো না, টার্গেট এত কাছে যে সব ক'টা ট্রাকে লাগল—ক্যানভাস, মাংস, হাড় আর ইস্পাত ভেদ করে ভিতরে ঢুকল মিনিটে সাতশো রাউন্ড।

অকস্মাৎ ঘুরে গেল ট্রাকটা, ধসে পড়ল সামনের অংশ, কাত হয়ে উল্টে গেল, ডিগবাজি খেলো বারবার, প্রতিবার গা থেকে ছিটকে চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মানুষ, যেন একটা কুকুর পুকুর থেকে পাড়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরাল।

'মাসুদ ভাই, ডান দিকে!' সঙ্গে সঙ্গে বলল আব্বাস। 'আরেকটা ট্রাক, ডান দিকে, আরও একটু ডানে—হয়েছে!' আতংকিত সৈনিকে ভর্তি আরেকটা ট্রাকের পিছু ধাওয়া করল ওরা।

ওদের পাশে একশো গজ দূরে গরবিনী তার প্রথম সাফল্যের মুখ দেখল। কামাল হাসানের অসম্মানজনক লাথি খেতে আর রাজি

নয় মাইকেল সেভারস, রাজি নয় দুবোর্ধ্যভাষার নির্দেশ মানতে, ছুটন্ত আর্মারড কারের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে গোত্রপ্রধানকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল সে।

'তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, ওল্ড চ্যাপ,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'ভুলে গেছ আমরা একই দলে, কী?'

নিয়ন্ত্রণহীন আর্মারড কার আপন খুশিতে ছুটল, প্রায় পাশাপাশি একই সঙ্গে ছুটছে একটা ফিয়াট ট্রাক, শিফটা পদাতিকে ভর্তি, কিন্তু ড্রাইভার টের পায়নি পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়াও অন্য আরেক শত্রুর অস্তিত্ব আছে। তার ঘাড় অবিশ্বাস্য ভঙ্গীতে মোচড় খেয়ে আছে, মাথাটা যেন ঘাড়ের উপর উল্টো করে বসানো, তাকিয়ে আছে পিছিয়ে পড়া অশ্বারোহীদের দিকে, ট্রাক কোন দিকে যাচ্ছে জানে না বা আরেক পাশে কী রয়েছে দেখেনি।

নিয়ন্ত্রণহীন দুটো গাড়ি তির্যকভাবে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে দুটো গাড়িই কাত হতে শুরু করল, উল্টে পড়ছে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো গরবিনীও উল্টে পড়বে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কাত হওয়ার গতি রুদ্ধ হলো, একপাশের দুটো চাকা ফিরে এল মাটিতে, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হলো আর্মারড কার, ভিতরের ক্রুরা ইস্পাতের দেয়ালে ঘন ঘন বাড়ি খেয়ে রক্তাক্ত হলো। এঞ্জিন বন্ধ হয়নি, আবার ছুটল গরবিনী, নাকে রক্ত নিয়ে কন্ট্রোল সামলানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল মাইকেল।

ফিয়াট ট্রাকটা তুলনায় হালকা ও উঁচু, আর্মারড কার ওটার ক্যাবের নীচে ধাক্কা মেরেছে, এক ধাক্কাতেই চিৎ, মাটিতে পিঠ

দিয়ে পড়ল, চারটে চাকা তারপরও বন বন করে ঘুরছে। ক্যাব আর ক্যানভাস ঢাকা হুড ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, ওগুলোর নীচে যারা ছিল সব ক'টা ইস্পাত আর শক্ত মাটির মাঝখানে পড়ে ছাতু হয়ে গেছে।

কামাল হাসানের জন্য পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠল। গরম ধাতব বাক্সের ভিতর বন্দী থাকবে সে, বাইরে কী ঘটছে তার প্রায় কিছুই দেখতে পাবে না, নাকের ডগা দিয়ে শয়ে শয়ে জন্মশত্রু কোন বাধা না পেয়ে পালিয়ে যাবে, তা কী করে হয়! টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুলল সে, সবেগে মাথা আর কাঁধ বের করে খাড়া হলো। রক্তপিপাসায়, রাগে, দুঃখে, হতাশায় আর উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল সে।

এই সময় খোলা একটা নীল আর কালো রোলস-রয়েস গরবিনীর সামনে দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানির মত ছুটে গেল। পিছনের সিটে রয়েছে শিফটাদের একজন শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসার, ইউনিফর্মে পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি, সঙ্গে সঙ্গে গোত্রপ্রধান আর মাইকেলের মধ্যে মতের মিল ঘটে গেল আবার। দু'জনের জন্যই ভয়ানকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা টার্গেট পেয়েছে ওরা।

'সেই চিৎকারটা ছাড়ছ না কেন, ওল্ড চ্যাপ?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল, অপেক্ষায় না থেকে নিজেই অনুকরণ করল, 'ইয়া-আ-আ-হু!'

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা উত্তর দিলেন কামাল হাসান, 'হাউ ডু ইউ ডু?' মাইকেলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে ঠিক যেন একটা মোরগ ডেকে উঠল।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়তে আর গালিগালাজ করছে কাউন্ট ডিকানডিয়া, কারণ পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে

ড্রাইভার। আরও মার খেয়ে ক্ষতের সংখ্যা বেড়ে গেছে শরীরে, ডান দিকে বাঁক ঘুরে সরাসরি পলায়নপর শিফটা কলামের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে সে। বোকামিটা অসংখ্য আইসবার্গের ভিতর দিয়ে ফুলস্পীডে জাহাজ চালানোর মত। আলোড়িত ধুলোর পাহাড় দৃষ্টিসীমা কমিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ ফুটে, আর এই খয়েরী রঙের কুয়াশা ভেদ করে বিনা নোটিসে হেলেদুলে বেরিয়ে আসছে বিশালকায় ট্রুপ-ক্যারিয়ার, একজন ড্রাইভারেরও সময়মত দিক বদলানোর বা ব্রেক করবার মানসিক অবস্থা নেই, তা ছাড়া সবাই তারা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

রোলস-রয়েসের সামনে দানবীয় আরও দুটো আকৃতি ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এল—একটা নিজেদের ট্রাক, অপরটা উটের মত কুঁজ নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা বাহন, টারিটে উড়ছে দুটো পতাকা, তার মধ্যে একটা ইথিওপিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। টারিট থেকে আরও একটা জিনিস বেরিয়ে আছে, সেটা হলো ভিকার্স মেশিনগানের ব্যারেল।

হঠাৎ করে আর্মারড কার ঘুরে গেল, প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ট্রাকের গায়ে, উল্টে পড়ল ট্রাক। আবার ঘুরে গিয়ে সরাসরি রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এল আর্মারড কার। চোখের পলকে এত কাছে চলে এল সেটা, ওদের উপর এখন হুমকির ভাব নিয়ে ঝুলে রয়েছে, এমনকী সীমিত দৃষ্টিসীমার ভিতর ডিনোও সেটাকে দেখতে পেল।

ভোজবাজির মত প্রতিক্রিয়া হলো। সিটের উপর ছেড়ে দেওয়া স্প্রিংের মত টান টান হলো ডিনো। অবিরাম হুইল ঘোরাল। মাত্র দু'চাকার সাহায্যে দিক বদলাল রোলস-রয়েস, আর্মারড কারের সামনে দিয়ে, প্রায় নাক ছুঁয়ে, নিপুণভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই

মুহূর্তে টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুলে গিয়ে বেরিয়ে এল বাদামি একটা প্রাচীন চেহারা, মুখ ভরে আছে বিশাল হাসিতে—এমন শুভ্র আর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল হাসি জীবনে কখনও দেখেনি কাউন্ট। আর্মারড কারের সামনে থেকে রোলস-রয়েস সরে আসবার আগেই প্রাচীন চেহারা থেকে বিদায় নিল হাসিটা, তার পরিবর্তে গলা চিরে বেরিয়ে এল এমন রক্ত পানি করা রণহুংকার, যে কাউন্টের পেটের ভিতর থলিগুলো ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল।

সবেগে রোলসের দিকে ঘুরল ভিকার্সের ব্যারেল, গানার কামাল হাসান টারিটের নীচে নামিয়ে নিয়েছেন মাথাটা, ব্যারেল খানিকটা উঁচু হলো, সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করছেন তিনি। আয়নায় চোখ রেখে সবই দেখল ডিনো, আবার স্যাঁৎ করে দিক বদলাল সে, ভিকার্সের গুলি রোলস-রয়েসের বাঁ দিকে লাগল, ধুলো আর পাথরের ঘূর্ণি ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

ঘুরে গেল আর্মারড কারও, তারই সঙ্গে ঘুরল ধাবমান ধুলোর মেঘ, দুই গাড়ির মাঝখানের ফাঁক চোখের পলকে ছোট হয়ে আসছে। আবার গুলি হবে, দেখতে পেল ডিনো, অনিবার্য মৃত্যু এড়াবার জন্য ভীষণ এক ঝুঁকি নিয়ে ফেলল সে—সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক করল। ব্যাকসিটে উল্টে গেল কাউন্ট ডিকানডিয়া, প্রতিবাদমুখর, কালো কাপড়ে ঢাকা তার নিতম্ব আকাশের দিকে উঁচু হয়ে থাকল, চকচকে বুট সহ পা দুটো অনবরত ছুঁড়ছে।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট রোলস-রয়েসের মাথার কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে উড়ে গেল, আবার উল্টোদিকে অবিরাম ঘুরিয়ে হুইল লক করে দিল ডিনো, ব্রেক রিলিজ করল, পায়ের চাপে মেঝের সঙ্গে সেঁটে ধরল থ্রটল। খানিকটা জায়গা লাফ দিয়ে পোরিয়ে গেল রোলস-রয়েস, বন বন করে ঘুরছে চাকা, মাটির স্পর্শ পেয়ে এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকির সঙ্গে দ্রুতগতি লাভ করল যে আবার পিছন

দিকে নিক্ষিপ্ত হলো কাউন্ট, পিছনের লেদার সিটে কেউ যেন ঠুকে বসিয়ে দিল তাকে, খটাখট বাড়ি খেলো হাড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে, মাথার হেলমেট নেমে এল চোখের উপর।

'তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলাম,' হাঁপিয়ে উঠে বলল কাউন্ট, হেলমেট ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এত ব্যস্ত, তার কথা শুনবার সময় নেই ডিনোর। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিল সে, জানে হয় কাউন্টের ঘুসি খেতে হবে, নয়তো ভিকার্স মেশিনগানের বুলেট। তবু কর্তব্যের কথা ভোলেনি লোকটা, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে রোলস-রয়েসকে, সাফল্যের সঙ্গে পালাচ্ছে। রোলসের গতি আর্মারড কারের চেয়ে বেশি, মাঝখানের ফাঁকটা ক্রমশ বাড়ল। গুলি হলেও রোলস-রয়েসের গায়ে একটাও লাগল না।

দুটো গাড়ির খানিক সামনে আরেকটা উঁচু ট্রুপ-ট্র্যান্সপোর্টারের কাঠামো ধুলোর ভিতর ঝুলে রয়েছে, ওদের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়, তবে গায়ে গতরে সৈনিকদের বোঝা থাকায় গতি মন্থর।

ঘন ঘন হুইল ঘুরিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এড়াবার চেষ্টা করল ডিনো, তারপর আবার একটা ভয়াবহ ঝুঁকি নিল। ট্রুপ-ক্যারিয়ারের নাকের সামনে বাঁক নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল, একটুর জন্য সংঘর্ষ বাধল না, আর্মারড কারের ঘাতক মেশিনগান ওটাকে এখন আর ছুঁতে পারবে না। তবে এক শিকার হারিয়ে বৃদ্ধ কামাল হাসান আরও মরিয়া হয়ে উঠলেন, আরেক শিকার দেখতে পেয়ে বিকট রণহুংকার ছাড়লেন তিনি, টেনে ধরে থাকলেন ভিকার্সের ট্রিগার।

ট্রাকের ক্যানভাস শতচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল বাতাসে, ক্যানভাসের নীচে মানুষের নিরেট ভিড় ফুটোয় ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে

গেল, ট্রাকের আড়ালে দ্রুত দূরে সরে গেল রোলস-রয়েস। হঠাৎ করে ধুলোর রাজ্য ভেদ করে স্ফটিক-স্বচ্ছ মরু বাতাসে বেরিয়ে গেল সেটা, সামনে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তর। বোঝার ভারে ধুঁকতে থাকা ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো পিছনে পড়ে থাকল। এই মুহূর্তে কাউন্ট ডিকানডিয়ার যা মনোভাব, ওয়েলস অভ চাল্ডির উপর ডিফেন্সিভ পজিশনে না পৌঁছে থামবে না রোলস-রয়েস। তারপর হঠাৎ করেই, তার সামনে খোলা প্রান্তরে সাজানো কামানগুলোর দিকে চোখ পড়ল। তিনটে কামান, প্রতিটির পিছনে গানাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরম আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কাউন্ট, সদ্য দেখা দুঃস্বপ্ন ভুলে গেল, বুকের সাহস ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনিধনের তীব্র লালসা জেগে উঠল তার অন্তরে।

'ডিনো, জামাই বাবাজী, তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ,' আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'শুধু মেয়ে নয়, তোমাকে আমি একটা মেডেলও দেব।' মৃত্যুদণ্ড সম্ভবত বাতিল করা হয়েছে। 'কামানের কাছে নিয়ে চলো, আমার বীর সন্তান। যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে তুমি কৃতজ্ঞ কর্নেল হিসেবে পাশে দেখতে পাবে।'

ডিনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল, এত কথার জবাবে চুপ করেই থাকবে সে, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা, কাউন্টকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, মাই কর্নেল, আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়েটা কী...?'

'দেব যখন বলেছি, অবশ্যই হবে,' আশ্বস্ত করল কাউন্ট। 'আগে কর্নেল পদটা দখল করো, কারণ আমার মেয়ে আবার কর্নেল ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করবে না...।'

এতক্ষণে, কথাবার্তা শুনে যখন বুঝল বিপদ কেটে গেছে,

কাউন্টের পায়ের নীচ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলল সার্জেন্ট বানানটো সাতা, ভয়ে ভয়ে রোলস-রয়েসের কিনারা থেকে পিছন দিকে উঁকি দিল। সে যা দেখল, নিজেকে সামলানোর সময় পেল না, তার গলা চিরে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল, চোখের পলকে আবার আগের জায়াগায় ফিরে গেল সে।

ওদের পিছনে ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে আদিবাসীদের আর্মারড কার, সবেগে ছুটে আসছে রোলস-রয়েসের দিকে।

কাউন্টও একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, ডিনোর ঘাড়ে-গর্দানে ঘুসি মারল দমাদম। 'জোরে, ডিনো, জোরে!' হুংকার ছাড়ল সে। 'এখন যদি মারা পড়ি, জেনারেল হয়েও আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। তোমাকে আমি নিজের হাতে গুলি করব...।'

তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে কামানগুলোর দিকে ছুটল রোলস-রয়েস।

'শান্ত থাকো, বাছারা,' একঘেয়ে সুরে একই কথা বারবার আওড়ে যাচ্ছে মেজর লুইগি রাকা। 'হোল্ড ইওর ফায়ার! হোল্ড ইওর ফায়ার!'

গোলন্দাজবাহিনীর অস্থিরতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে, কামান দাগবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে প্রত্যেকটি লোক।

'ট্রেনিঙের কথা মনে করো,' বলে চলেছে সে। দৃঢ় পায়ে হেঁটে এসে থামল একজন গান-লেয়ারের পাশে, চোখে বিনকিউলার তুলে সামনের প্রান্তরে চোখ বুলাল। 'শান্ত থাকো! হোল্ড ইওর ফায়ার!'

ধুলোর মেঘ গড়াতে গড়াতে দ্রুত এদিকে সরে আসছে, কিন্তু ভিতরে কী ঘটছে পরিষ্কার নয়।

'তোমার কামানে হাই-এক্সপ্লোসিভ লোড করা?' গান-লেয়ারকে জিজ্ঞেস করল মেজর। মস্ত একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল ছোকরা।

'মনে রেখো, প্রথম শটটাই শুধু মনোযোগ দিয়ে তাক করার সময় পাবে তুমি।'

'স্যার!' ছোকরার গলা কেঁপে গেল, লক্ষ করে রাগ আর ঘৃণায় গা জ্বালা করে উঠল মেজরের। ভাড়াটে সৈনিকদেরই যদি এই অবস্থা হয়, আনাড়ি শিফটাদের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। নার্ভাস, নার্ভাস, সবাই বড়বেশি নার্ভাস! কম পয়সা খরচ করলে যা হয়, প্রায় অনভিজ্ঞ ছোকরাদের ধরে আনা হয়েছে কামান দাগবার জন্য। কামানের পিছনে দাঁড়াতে গিয়ে বুক কাঁপে ওদের। ঝট্ করে ঘুরে পরবর্তী ব্যাটারির দিকে এগোল সে।

'স্টেডি, স্টেডি! সময় না হওয়া পর্যন্ত শান্ত থাকো!'

একজন গানারকে দেখে মনে হলো ছোকরা কেঁদে ফেলবে।

'তোমরা শুধু একজনকে ভয় পাবে—আমাকে,' হেঁড়ে গলায় সতর্ক করল মেজর। 'আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যদি ফায়ার ওপেন করো, আমি তার...।'

চিৎকার হলো, বাধা পেয়ে থেমে গেল মেজর রাকা। একজন লোডার হাত তুলে প্রান্তরের দিকটা দেখাল।

'লোকটার নাম জেনে রাখো!' কঠিন সুরে বলল মেজর, আচরণে ব্যস্ততার বদলে মর্যাদা আর কর্তৃত্ব ফোটাবার জন্য মাথা নিচু করে বিনকিউলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করল, তারপর সেটা চোখে তুলল।

নিজের বাহিনীকে পিছনে ফেলে পালিয়ে আসায় এতই

উৎসাহী কাউন্ট ডিকানডিয়া, পিছন ফিরে তাকাবার কথা তার মনে থাকল না। ইতিমধ্যে শিফটা কলাম আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে আধ মাইলের একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেটা। সরাসরি আর্টিলারি ব্যাটারির দিকে গাড়ি চালাচ্ছে ডিনো, ঘুসি খেয়ে কানের নীচে মাংস ফুলে গেছে তার, রক্ত গড়াচ্ছে আঁচড়ের দাগগুলো থেকে। এই মুহূর্তে পিছনের সিটে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, হাত দুটো এত ঘন ঘন নাড়ছে যে মনে হতে পারে এক ঝাঁক মৌমাছি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর।

গাঢ় রঙের ধুলোর পাহাড় ভেদ করে আরও একটা কিম্ভূতকিমাকার বাহন ছিটকে বেরিয়ে এল, দেখবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোটা চিনতে পারল মেজর রাকা, নতুন রঙ বা টারিটে বসানো নতুন অস্ত্র তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। টারিটে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বুড়োটা যে শত্রুপক্ষের একজন, তাও তাকে বলে দিতে হলো না।

‘ভেরি ওয়েল, ল্যাডস,’ শান্ত সুরে বলল মেজর। ‘হিয়ার দে কাম। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যান্ড ওয়েট ফর দা অর্ডার। নট আ মোমেন্ট বিফোর।’

ছুটন্ত আর্মারড কার থেকে গুলি হলো, বিরতি ছাড়া দীর্ঘ বিস্ফোরণের শব্দ। বড় বেশি দীর্ঘ, ভাল–মেজর, হাসল নিঃশব্দে। সন্দেহ নেই মেশিনগানটা গরম হয়ে উঠছে, যে-কোন মুহূর্তে জ্যাম হয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞ একজন গানার থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করবে–তারমানে শত্রুপক্ষও অনভিজ্ঞ উপলব্ধি করল সে।

‘শান্ত থাকো, ধৈর্য ধরো,’ ধমকে উঠল মেজর, নিজের লোকদের অস্থিরতা অনুভব করতে পারছে সে। পরস্পরের দিকে

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে তারা।

আর্মারড কার আবার গুলি করল, রোলস-রয়েসের চারদিকে লাফিয়ে উঠল পাথুরে মাটি—এবারও দীর্ঘ বিস্ফোরণের একটানা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা হঠাৎ করে থেমে গেল, তারপর আর শোনা গেল না।

'হাহ্!' মেজরের গলা থেকে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল। 'ওদের মেশিনগান জ্যাম হয়ে গেছে!' তার নার্ভাস গানাররা শত্রুপক্ষের কোন গুলি খাবে না। স্বভাবতই সাহস বেড়ে যাবে তাদের।

'স্টেডি, মাই বয়েজ। অল স্টেডি। নট লং টু ওয়েট। নাইস অ্যান্ড স্টেডি! ইজি!'

কী ঘটেছে বুঝতে পারলেন না কামাল হাসান। পিস্তল গ্রিপ আর ট্রিগার ধরে টানাটানি কম করলেন না, কিন্তু হঠাৎ থেমে যাওয়া মেশিনগান থেকে আর কোন শব্দ বেরুল না। খেপে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করলেন তিনি, এমনই অশ্রাব্য যে কোন মানুষকে করা হলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন না করে উপায় থাকত না, আর দু'জনের একজনকে অবশ্যই মরতে হত।

তাতেও যখন কাজ হলো না, তরোয়াল হাতে টারিটের উপর উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ, সামনে পিছনে না তাকিয়ে মাথার উপর বন বন করে ঘোরালেন সেটা, সেই সঙ্গে রণহুংকার তো আছেই।

একশো মিলিমিটার ফিল্ড গান কী জিনিস সে-সম্পর্কে কামাল হাসানের কোন ধারণা নেই, ধারণা যদি থাকতও, এই মুহূর্তে তিনি ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে রোলস-রয়েসের দিকে, বিদেশী আরোহীদের নিয়ে তাঁর সামনে দিয়ে পালাচ্ছে সেটা।

তাঁর নীচে ভাইজরের দিকে ঝুঁকে সামনেটা দেখবার চেষ্টা করল মাইকেল সেভারস। সরু ভাইজর, খুব বেশি কিছু দেখবার উপায় নেই, তা ছাড়া করডাইটের ধোঁয়ায় চোখ ভরে উঠেছে পানিতে, ফলে দৃষ্টিও ঝাপসা। চোখ পিট পিট করে রোলস-রয়েসটাকে দেখতে পেল সে, সেটাকেই অনুসরণ করল। ‘গুলি করো, বুড়ো খচ্চর্!’ হাঁক ছেড়ে বলল সে। ‘ওপরে করছটা কী তুমি, অ্যাই ব্যাটা, বেল্লিক!’ কিন্তু না, আগের মতই স্তব্ধ হয়ে থাকল মেশিনগান।

ইস্পাতের খোলের ভিতর মাইকেলের সিটটা নীচের দিকে, আর মেজর রাকা বুদ্ধি করে মাটির একটা ভাঁজে কামানগুলো বসানোয় আর্মারড কার থেকে ওগুলোকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। সগর্বে কামানের দিকে ছুটে চলল গরবিনী, মাইকেলের চোখের সামনে টোপ হিসাবে রয়েছে রোলস-রয়েস। অবধারিত মৃত্যুর কত কাছে চলে এসেছে, তার জানা নেই।

ছয়

‘চমৎকার!’ তুমুল গতিতে আর্মারড কারটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তৃপ্তির সঙ্গে বলল মেজর রাকা। এরইমধ্যে সেটা অভিজ্ঞ একজন গানারের জন্য লোভনীয় নাগালের ভিতর চলে এসেছে। তবে এখন যে দূরত্ব, তার আরও অর্ধেকটা ওটাকে পেরিয়ে আসতে দেবে সে, তা হলে তার অনভিজ্ঞ ক্রুরা টার্গেট প্র্যাকটিসে অবশ্যই সাফল্যের পরিচয় দেবে বলে আশা করা যায়।

কামানের দুশো মিটার সামনে রয়েছে রোলস-রয়েস, ছুটে

আসছে কম করেও ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল বেগে। তিনটে আতংক নীল মুখ তার দিকে আবেদনভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, প্রাণ বাঁচানোর আকুল আর্তনাদের প্রতিযোগিতায় তিনটে কণ্ঠস্বরই প্রথম হতে চায়। তাদেরকে অগ্রাহ্য করে ঝট্ করে শত্রুপক্ষের দিকে তাকাল মেজর রাকা। আর্মারড কার এখনও দু'হাজার মিটার দূরে, তবে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। অস্থির গানারদের শান্ত থাকবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় ফাঁক ফাঁক করে বসানো কামানগুলোর মাঝখান দিয়ে সবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল রোলস-রয়েস।

রোলসের পিছনের সিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, এক হাত দিয়ে মাথায় ধরে আছে হেলমেট, অপর হাত দিয়ে শাসাচ্ছে গানারদের। 'ওপেন ফায়ার, ইউ বাস্টার্ডস! এই মুহূর্তে ফায়ার ওপেন কর, তা না হলে তোদের সব ক'টাকে আমি গুলি করে মারব!' দুই কামানের মধ্যবর্তী সরু পথে চলে এল রোলস-রয়েস, হঠাৎ কাউন্টের খেয়াল হলো গানারদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তারা যার যার পোস্ট ছেড়ে না পালায়, পালালে আর্মারড কারটাকে তার পিছনে ঠেকাবে কে! 'পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়!' গর্জে উঠল সে। 'প্রাণ দাও, কিন্তু মান দিয়ো না—খবরদার!' কামান আর গানারদের পিছনে ফেলে এখনও ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল গতিতে ছুটছে রোলস-রয়েস, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত খাঁ-খাঁ করছে প্রান্তর।

কাউন্টের নির্দেশটাকে বাতিল ঘোষণা করবার জন্য গলার সমস্ত জোর একত্রিত করল মেজর রাকা, কিন্তু তিনটে ফিল্ড গানের সম্মিলিত গর্জনের তুলনায় তার কণ্ঠস্বর পিঁপড়ের কান্নার মত, কেউ শুনতে পেল না। তিনটে কামান একসঙ্গে গর্জে ইঠল, শত চেষ্টাতেও গানারদের এই সাফল্য ট্রেনিঙের সময় অর্জিত হয়নি।

কর্নেলের ‘এই মুহূর্ত’টাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে তারা, দ্রুত গোলাবর্ষণের স্বার্থে লক্ষ্যস্থির বা ভুল সংশোধনের কথা ভুলে গেছে।

এই যখন পরিস্থিতি, দিকভ্রান্ত গোলাগুলোর একটা যদি টার্গেট খুঁজে পায় তা হলে সেটাকে ভাগ্যগুণই বলতে হবে। একটা ফিয়াট ট্রুপ-ক্যারিয়ার, আর্মারড কারের সিকি মাইল পিছনে এই মাত্র ধুলোর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওটার রেডিয়েটর চুরমার করে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গোলা, গুঁড়িয়ে দিল এঞ্জিন ব্লক, ছিন্নভিন্ন করল ড্রাইভারকে, তারপর বিস্ফোরিত হলো ক্যানভাস হুডের নীচে পদাতিক সৈনিকদের নিরেট ভিড়ের ঠিক মাঝখানে। এঞ্জিন আর সামনের চাকা কয়েক সেকেন্ড সচল থাকল, সামনের এবড়োখেবড়ো মাটিতে এসে উল্টে গেল, শুরু করল ডিগবাজি খেতে–মাটিতে নাক দিয়ে সটান খাড়া হলো ট্রাক, যন্ত্রদানব যেন শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করছে প্রথম পুরস্কারটি পাবার আশায়।

শত্রুপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছুল মাত্র একটা শেল। গরবিনীর দশ ফুট সামনে বিস্ফোরিত হলো সেটা, হলুদ মাটি আর আগুনের শিখা নিয়ে মাথাচাড়া দিল একটা টাওয়ার, মাটিতে তৈরি হলো গোলাকার একটা গভীর গর্ত, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ফুট চারেকের কম নয়, ওই গর্তে পড়ে অচল হয়ে গেল আর্মারড কার।

টারিট থেকে বেরিয়ে আছে কামাল হাসানের মাথা, মুখ আর বিস্ফারিত চোখ, শরীরের এই তিনটে জায়গাই শেল বিস্ফোরণজনিত ধুলো আর কাঁকরে ভরে উঠল, গলা চিরে বেরিয়ে আসা রণহুংকার থেমে গেল মাঝপথে। বাতাসের অভাবে হাঁপাতে লাগলেন তিনি, দু’হাতে রগড়াচ্ছেন ভেজা চোখ।

আগুন আর মাটির টাওয়ার মাইকেলের দৃষ্টিপথেও বাধা হয়ে

দাঁড়াল, অন্ধের মত গর্তের ভিতর গাড়ি নিয়ে পড়ল সে। প্রচণ্ড ধাক্কায় সিট থেকে ছিটকে পড়ল, স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে ঠুকে গেল বুক, নীচের মেঝেতে ঢলে পড়বার আগে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এল সমস্ত বাতাস।

আরেকটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে গর্তটা থেকে উঠে এল গরবিনী, ওটার চারদিকে আগুন আর গুঁড়ো মাটি বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল। আর্মারড কারের স্প্রিঙ ছিঁড়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে আছে গাড়ি, সামনের চাকা দুটো এমন ভঙ্গিতে বাঁকা আর কাত হয়ে পড়েছে যে আর কোন দিন সিধে হবে বলে মনে হয় না, যদিও এঞ্জিন সগর্জনে চালু রয়েছে, ফলে ট্রেনিং পাওয়া সার্কাসের পশুর মত ডান দিকে ঘুরছে গরবিনী, বিরতিহীন পাক খাচ্ছে।

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে ড্রাইভারের সিটে সিধে হয়ে বসল মাইকেল, দেখল স্টিয়ারিং কলামের কোন অস্তিত্বই নেই, আর থ্রটল এমনভাবে আটকে গেছে যে দু'হাতে ধরে ঝাঁকালেও এক চুল নড়ে না। মাথাটা পরিষ্কার হবার অপেক্ষায় দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল চুপচাপ, এখনও হাঁপাচ্ছে, কারণ খোলের ভিতরটা ভরে আছে ধোঁয়া আর ধুলোয়। ছি-ছি, ভাবল সে, কী কুক্ষণেই না বিপদতারিণীর নাম বদলে গরবিনী রেখেছিল! বিপদতারিণী নামটা রানার দেওয়া ছিল, ওটার কারবুরেটর সংগ্রহ করবার সময় মাইকেলের গাধার খাটনির কথা স্মরণ রেখে। রানাকে হাফ ডজন চুরুট ঘুষ দিয়ে নামটা বদলাবার অনুমতি আদায় করে সে, বিপদতারিণী নামটা শুনলেই সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাবে এই ভয়ে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, রানার দেওয়া নামটাই বোধহয় ঠিক ছিল!

আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো খোলের কাছাকাছি কোথাও। উঠতে যাচ্ছিল, সিটের উপর ঠুকে বসিয়ে দেওয়া হলো তাকে।

নিতম্বে ব্যথা নিয়ে মাথার উপর হাত তুলল সে, হ্যাচের ঢাকনি খুলে মাথা তুলল ফাঁকটায়, তাজা বাতাস বুক ভরে নিল। তারপর চোখ মেলল মাইকেল, দেখল তিনটে কামান সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করছে।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠল মাইকেল, দ্রুত বৃত্ত রচনায় ব্যস্ত আর্মারড কারের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হলো শেলগুলো, প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে ঝাঁকি খেলো মাথা, দু'সারি দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো।

'চলো বাড়ি ফিরি!' সরু হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আসছে মাইকেল। পা দুটো কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ইস্পাতের মেঝে ত্যাগ করল, তা না হলে দুটো পায়েরই হাঁটু থেকে নীচের সব ক'টা হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত।

দু'হাজার গজ দূরে অন্য আরেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মেজর লুইগি রাকা, কাউন্ট ডিকানডিয়া গানারদের মধ্যে যে আতংক ছড়িয়ে গেছে সেটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নামিয়ে আনবার জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে সে। গানাররা যন্ত্রচালিতের মত লোডিং আর ফায়ারিঙে এতই ব্যস্ত যে কামান দাগবার বাকি সব সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত নিয়ম বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে। লেয়াররা এমনকী টার্গেটের নিশানা স্থির করবার ভানও করছে না, ব্রিচ ব্লক সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্র হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে ল্যানিয়ার্ডে।

রাকার হুংকার গর্জন তাদের বন্ধ কানে ঢুকলোই না, ইতিমধ্যে তারা কী এক নেশায় যেন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কাউন্টের মুখ থেকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি শুনবার পর তাদের স্নায়ু একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সহজবোধ্য যুক্তি বা বিচার-বিবেচনা বোধ

হারিয়ে বসেছে সবাই।

একজন লেয়ারকে তার সিট থেকে হিঁচড়ে টেনে আনল মেজর, হাতের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মুঠো থেকে ছাড়াল ল্যানিয়ার্ডটা। অযোগ্য লোকদের অভিশাপ দিল সে, সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে কামানের হ্যান্ডেলগুলো দ্রুত ঘোরাল। মোটা ব্যারেল নীচে নামাল, সঁ্যাৎ করে সরে এল একপাশে, বড়সড় ম্যাগিনিফাইং গানসাইটে ছোট্ট পোকার মত আর্মারড কার হঠাৎ বিশাল হয়ে দেখা দিল। উন্মত্ত একটা গতিবেগের সঙ্গে পাক খাচ্ছে ওটা, বোঝাই যায় কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পাক খাওয়ার ছন্দটা লক্ষ করল মেজর, কব্জির কঠিন আর সংক্ষিপ্ত একটা ঝাঁকিতে ল্যানিয়ার্ড টানল।

সবেগে পিছিয়ে এল ব্যারেল, শক অ্যাবজরবার-এর হাইড্রলিক পিস্টনে বাধা পেয়ে অবশেষে রুদ্ধ হলো ওটার গতি, পনেরো পাউন্ড ওজনের ইস্পাত শেল প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রায় সরল একটা পথ ধরে ছুটল বিদ্যুৎবেগে।

সামান্য একটু নীচে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছিল। সামনের দুই চাকার মাঝখান দিয়ে ভিতরে ঢুকল শেল, আঘাত করল সরাসরি ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের নীচের মাটিতে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় খোলের নরম তলপেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেটিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এঞ্জিন ব্লক, প্রকাণ্ড সামনের চাকা জোড়া গাড়ির গা থেকে রোস্ট করা মুরগির ডানার মত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো যেন, খোলের মোটা ইস্পাতের মেঝে ফুলে গম্বুজ আকৃতি পেল।

ড্রাইভারের হ্যাচে ঝুলছে মাইকেল। অর্ধেক উপরে, অর্ধেক নীচে। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা উঠে এল সদ্য খোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মত–মাইকেল যেন একটা ছিপি, হ্যাচ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো তাকে, পা দুটো তখনও ছন্দহীন নাচানাচি করছে।

একই অবস্থা হলো কামাল হাসানের। টারিট থেকে ছিটকে নিক্ষিপ্ত হলেন তিনি, শূন্যে উত্থানের শেষ সীমায় পৌঁছে মাইকেলের সঙ্গে মিলিত হলেন। দুটি দেহ এক সঙ্গে নেমে এল মাটিতে, প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়, ডিগবাজি খেতে খেতে। মাটিতে পড়বার পর দেখা গেল মাইকেলের পিঠে, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে আয়েশ করে বসে রয়েছেন বৃদ্ধ—সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটি হলো, দু'জনের কাউকেই তরোয়ালের সামান্য একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, অথচ ওদের সঙ্গেই ছিল সেটা, নেমে এসে মাইকেলের কানের লতি থেকে এক ইঞ্চি দূরে গভীরভাবে গেঁথে গেছে মাটিতে।

দুর্বল মাইকেল আস্তে ধীরে পিঠ থেকে নামাতে চেষ্টা করল কামাল হাসানকে। 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওল্ড চ্যাপ,' বলল সে, গলায় জোর কম। 'এভাবে যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকো, বসার সময় যদি হুঁশ না থাকে, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

কিন্তু বসবার পর মাংসের নরম গদিতে আরাম পেয়ে গেছেন গোত্রপ্রধান, উঠবার কোন ইচ্ছে নেই তাঁর।

'তরোয়ালটা ঘোরাবে না? শুনতে পাচ্ছ না, ওরা আসছে?'

ভোজবাজির মত কাজ হলো, এক লাফে মাইকেলের পিঠ থেকে সরে গেলেন কামাল হাসান, হ্যাঁচকা টানে তরোয়াল তুলে মাথার উপর বিপুলবেগে ঘোরাতে শুরু করলেন।

তবে মিথ্যে বলেনি মাইকেল, সত্যি ওরা আসছে। একটা নয়, কয়েক ডজন এঞ্জিনের আওয়াজ পেল। পিঠ ভারমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল সে, থেঁতলানো ঠোঁট থেকে চারদিকে ধুলো আর রক্ত ছড়াল, মুখ তুলে দেখল রণেভঙ্গ দিয়ে শিফটাদের ট্রাকগুলো

সগর্জনে পালিয়ে আসছে।

'ওহ্, মাই গড!' হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, হামাগুড়ি দিয়ে বিধ্বস্ত গরবিনীর আড়ালে আশ্রয় নিল, এখনও আর্মারড কারের গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কুঁকড়ে শরীরটাকে ছোট করে আনছে মাইকেল, এই সময় খেয়াল হলো আশপাশে কোথাও কামাল হাসানকে দেখা যাচ্ছে না।

'কামাইল্ল্যা, ও-ই ধাড়ি বজ্জাত–ফিরে এসো বলছি!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল।

বকের মত সরু, কাঁপা কাঁপা পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন কামাল হাসান। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া থেকে এখনও তিনি মুক্ত হতে পারেননি, মাথার ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করছে, কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রক্তে পুরোপুরি অটুট রয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা। তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারল মাইকেল। তিনি একাই গোটা শিফটা কলামকে এক হাত দেখিয়ে দিতে চান, সেদিকেই হিংস্র ভঙ্গিতে এগোচ্ছেন তিনি, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিৎকার করছেন, দু'হাতে ধরে মাথার উপর বন বন করে ঘোরাচ্ছেন তরোয়ালটা।

ছুটে এল মাইকেল, তরোয়ালের নীচে মাথা নামিয়ে জাপটে ধরল কামাল হাসানকে, টেনে-হিঁচড়ে বৃদ্ধ যোদ্ধাকে ফিরিয়ে আনল গরবিনীর আড়ালে, আগোছাল একটা স্তূপের মত ফেলে রাখল মাটিতে। মাইকেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন তিনি, ভাঙা স্টীল খোলের ভিতর একটা হিংস্র বাঘের সঙ্গে লড়তে হলো মাইকেলকে। ওদের পাশ ঘেঁষে শিফটা কলামের প্রথম ট্রাকটা বেরিয়ে গেল।

আতংকিত শিফটা সৈনিকরা ওদের দিকে ভাল করে একবার তাকালও না, নিজেদের কর্নেলকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন

ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই।

'চুপ! চুপ বলছি! শান্ত হও!' গর্জে উঠল মাইকেল, যদিও তাতে কোন কাজ হলো না, অ্যামহারিক ভাষায় মাইকেলকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে চলেছেন কামাল হাসান। ভাগ্যিস একটারও কোন অর্থ করতে পারছে না মাইকেল, তা যদি পারত, প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মুহূর্তে এখানে একটি খুনোখুনি হয়ে যেত। শুধু গালিগালাজ নয়, সেই সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ছেন বৃদ্ধ, অগত্যা বাধ্য হয়ে মাইকেল তাঁর মাথার চারদিকে ঢোলা আলখেল্লার খানিকটা জড়িয়ে দিল, তারপর বসল ওটার উপর। ওদিকে মিছিলের মত শিফটা ট্রাকগুলো পাশ কাটাচ্ছে গরবিনীকে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

ধুলোর আলোড়ন একটু কমবার পর, মাইকেলের মনে হলো, দূরে কিম্ভূতকিমাকার আকৃতিটা সম্ভবত চঞ্চলা। কামাল হাসানের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নেমে চিৎকারের সঙ্গে হাত নাড়ল সে, কিন্তু গাড়িটা চোখের পলকে আবার হারিয়ে গেল ধুলোর ভিতর, একটা ফিয়াট ট্রাকের পিছু নিয়ে। ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল মাইকেল, চারদিকে অসংখ্য এঞ্জিনের শব্দ সত্ত্বেও।

তারপর হঠাৎ করে ট্রাক মিছিল শেষ হলো, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ, হালকা হয়ে এল ধুলো। খানিক পরই আরেকটা শব্দ ভেসে এল—অস্পষ্ট কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে।

তিন গোত্রের বেশিরভাগ অশ্বারোহী যোদ্ধাই অনেকক্ষণ হলো আর পলায়নরত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করছে না, তারচেয়ে অনেক উপভোগ্য ও লাভজনক একটা কাজে এই মুহূর্তে ব্যস্ত তারা। উল্টে পড়া অথবা অচল শিফটা ট্রাকগুলো লুঠ হয়ে যাচ্ছে, তবে কিছু অশ্বারোহী সৈনিক লুঠপাটে অংশগ্রহণ না করে এখনও ধাওয়া করে

আসছে শিফটাদের।

বিধ্বস্ত ট্রাক থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া অনেক শিফটাই ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে, অশ্বারোহীরা তাদেরকে কচু-কাটা করতে করতে ছুটে আসছে।

'কী বলছি শোনো, কামাইল্ল্যা,' গোত্রপ্রধানের মাথা থেকে আলখেল্লার প্যাঁচ ছাড়াল মাইকেল। 'দয়া করে এবার বেরিয়ে এসো। তোমার লোকদের ডাকো, এখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে বলো।'

তিনটে কামানের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো দিয়ে শিফটা কলাম ঢুকে পড়ল, এই সুযোগে এক কামান থেকে আরেক কামানে ছুটে গিয়ে ক্রুদের মন থেকে আতংক দূর করবার শেষ চেষ্টা চালাল মেজর লুইগি রাকা। অনেক কষ্টে গানারদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনল সে, আর ঠিক তখনই ধুলোর মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এল আদিবাসীদের দ্বিতীয় আর্মারড কার।

ওটার আকস্মিক আগমন গান ক্রুদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত বোধবুদ্ধি আর সুস্থতা ধ্বংস করবার জন্য যথেষ্ট। নাক ঘুরিয়ে আর্মারড কার সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এল, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু করল। লোডাররা হাতের শেল ফেলে দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল, সিট থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লেয়ারদের, ডাইভ দিয়ে পড়ল কামানের আর্মার শিল্ডের পিছনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সবাই তারা গাদাগাদি করে পড়ে থাকল সেখানে। এরপর আর্মারড কারের গানার আর মাত্র এক পশলা গুলি করল, গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে ফিরে এল ধুলোর আড়ালে। গানাররা যেমন হতচকিত হয়ে পড়েছিল, তেমনি আর্মারড কারের ভিতর রানাও–একটা ফিয়াট ট্রাককে ধাওয়া

করছিল ও, হঠাৎ তার বদলে সামনে তিন তিনটে কামান দেখতে পেলে আঁতকে ওঠাই স্বাভাবিক।

'মাই গড, আব্বাস, কামানের একেবারে মুখে গিয়ে পড়েছিলাম!'

'ভোলীড অ্যান্ড থানডার্ড—কবিতাটা মনে আছে আপনার, মাসুদ ভাই?' পাল্টা চিৎকার করল আব্বাস।

'কবিতা, এই সময়?' রানার গলা থেকে কাতর একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল, পা চেপে ধরল চঞ্চলার অ্যাকসিলারেটরে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল আব্বাস।

'ঘরের ছেলে ঘরে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়—ওগুলো আমাদের দিকে আগ্নেয়গিরি তাক করে রয়েছে, আব্বাস।'

'মাসুদ ভাই...!' প্রতিবাদে মুখর হতে চাইল আব্বাস, কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো, এমনকী ধুলোর ঘন মেঘের ভিতরও মুহূর্তের জন্য এক ঝলক আগুন দেখতে পেল ওরা, একশো মিলিমিটার শেলটা উঁচু টারিটের মাথার পাশ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল। বাতাসের চড় খেলো ওরা, কানের ভিতর ঝড় উঠল, শেলের তীক্ষ্ণ শব্দে কুঁকড়ে গেল শরীর! আধমাইল দূরে বিস্ফোরিত হলো সেটা, আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল মাটি আর আগুন।

'কী বলছি বুঝতে পারছ, বৎস?' প্রশ্ন করল রানা।

'জ্বী-জ্বী, হ্যাঁ!'

ধুলোর মেঘ নিরাপত্তার একটা বেষ্টনী হিসাবে কাজ করছিল, হঠাৎ সেটা আকারে ছোট হয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় কামানগুলোর লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো চঞ্চলা। শুধু চঞ্চলা নয়, উপাদেয় আরও একটা টার্গেট দেখতে পেল শিফটাদের ভাড়াটে মেজর। আদিবাসী অশ্বারোহীরা তখনও ছুটে

আসছে।

আর্মারড কারকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গোলা ছুঁড়ে যখন কাজ হলো না, মেজর লুইগি রাকা তখন টার্গেট বদল করল। 'শ্র্যাপনেল,' হুংকার ছাড়ল সে। 'লোড উইথ শ্র্যাপনেল, ফিউজ ফর এয়ার বার্স্ট!'

ইথিওপিয়ার পনি আকারে ছোটখাট, গায়ে প্রচুর পশম, পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠা-নামায় ভারি দক্ষ, তবে খোলা প্রান্তরে তীরবেগে শত্রুর পিছু ধাওয়া করা তার জন্য অস্বস্তিকর। তা ছাড়া কয়েকহপ্তা ধরে সমতল মরুর শুকনো ঘাসজমিতে আটকে রাখা হয়েছে ওগুলোকে, ফলে ইতিমধ্যে তাদের শক্তি-সমার্থ্য সব খরচ হয়ে গেছে।

প্রথম সারির অশ্বারোহীদের মাথা থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে বিস্ফোরিত হলো শ্র্যাপনেল। ঘন নীল আকাশের গায়ে ভীতিকর একটা উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ল, আওয়াজটা শুনে মনে হলো গোটা আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার উপর, সেই সঙ্গে উড়ন্ত ছুরির মত অসংখ্য শ্র্যাপনেলের বিদ্যুৎগতি ছুটোছুটিতে হিসহিস আওয়াজ উঠল বাতাসে।

প্রথম বিস্ফোরণে বারোটা ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, মাটিতে মাথা দিয়ে সামনের দিকে আছাড় খেলো ওগুলো, পিঠ থেকে ছুঁড়ে দিল আরোহীদের। পরমুহূর্তে আকাশ ভরে উঠল ভয়াবহ আগুনে গোলায়। অবিরাম বিস্ফোণের আওয়াজে চিঁহিহি ডাক ছেড়ে দিকভ্রান্ত ঘোড়াগুলো গা ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে আরোহীদের ফেলে দিতে চেষ্টা করল, আরোহীরা প্রাণপণে কেশর ধরে ঝুলে থাকল। আহত ঘোড়াগুলোর নীচে চাপা পড়ল আরোহীরা। দু'একজন অতি সাহসী ঘোড়সওয়ার লাগাম টেনে নীচের দিকে ঝুঁকল, আহত সৈনিককে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে। মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যে, গোটা আদিবাসী বাহিনী, সচল আর্মারড কারসহ রক্ষা পাওয়া অশ্বারোহীদের নিয়ে, পিছু হটল। যুদ্ধক্ষেত্র রয়ে গেল মেজর লুইগি রাকার গোলন্দাজ বাহিনীর দখলে, আর মাঝখানে অচল পড়ে থাকল ক্রুদের নিয়ে গরবিনী।

বিধ্বস্ত খোলের আশ্রয় থেকে, চোখে বিষাদ নিয়ে, আদিবাসী বাহিনীর পলায়ন চাক্ষুস করল মাইকেল সেভারস। দ্রুত উদ্ধার পাবার শেষ আশাটা কেরোসিন ফুরিয়ে আসা কুপির মত ধীরে ধীরে নিভে গেল। 'ওদের কোন দোস দেই না, সত্যিই দেই না,' কামাল হাসানকে বলল সে, আর তারপরই তার চোখ পড়ল দ্রুতগতি আর্মারড কারের ওপর। অশ্বারোহী বাহিনীকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাচ্ছে রানার চঞ্চলা।

'ওর কথা আলাদা,' বিড়বিড় করে আবার বলল মাইকেল। 'ও আমাদের দেখেছে–আমি জানি দেখেছে।' এক পর্যায়ে চঞ্চলা ওদের সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছিল। শুধু তাই নয়, নাক ঘুরিয়ে ওদের দিকে রওনাও হয়েছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর আবার বাঁক নিয়ে দূরে সরে যায় সেটা। 'কী জানো, ভাই কামাল হাসান, এ-কথা বিশ্বাস করার ভূরি ভূরি কারণ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরকে একজোড়া ছাগল হিসেবে উৎসর্গ করে যাওয়া হয়েছে।' আড়চোখে কামাল হাসানের দিকে তাকাল সে।

মাইকেলের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন কামাল হাসান, শিকারী কুকুরের মত হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে বুকটা, নাকের ফুটো দিয়ে শিসের শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাসগুলো।

'মুখের ভেতর থেকে ওই সাদা কোদালগুলো বের করে নিলে ভাল করবে, ওল্ড চ্যাপ–তা না হলে কখন গিলে ফেলবে জানতেও

পারবে না। আজকের মত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চেষ্টা করে দেখো শান্ত হতে পারো কিনা। বাড়ি ফিরতে হলে রাতের অন্ধকারে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার প্রান্তরের দূর প্রান্তে তাকাল মাইকেল। এখনও দেখা যাচ্ছে চঞ্চলাকে, অস্পষ্ট। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক কাঁপিয়ে। 'মহৎপ্রাণ মাসুদ রানা এখানে ফেলে যাচ্ছে আমাদেরক। ফিরে গিয়ে বীরত্বের কাহিনী শোনাবে, তারিয়ে তারিয়ে খাবে...কী খাবে? মধু, মধু! আহ্, মধু!' অ্যানি উইসপারের আপেল-রাঙা চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাইকেল, সবচেয়ে খারাপটা কী ঘটতে পারে আন্দাজ করে নিয়েছে, চরম পরিণতির জন্য মানসিকভাবে তৈরি। 'ভাই কামাল, ওল্ড চ্যাপ, এক অর্থে রানাকে আমি শুধু শুধু দোষ দিচ্ছি, তাই না? মনে রেখো ওর জায়গায় আমি হলেও সম্ভবত এই-ই করতাম। কিন্তু পার্থক্যটা তোমাকে বুঝতে হবে, ভাই কামাল হাসান। আমি মাইকেল আর তুমি মাসুদ রানা এক কথা হলো, কী? ভদ্রলোক এবং মহৎ হৃদয় মাসুদ রানার কাছ থেকে এই আচরণ সত্যি আমি আশা করিনি–যাও, মনের কথাটা ফাঁস করে দিলাম!'

মাইকেলের একটা কথাও শুনছেন না কামাল হাসান। দুই সেনা বাহিনীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। তিনি শুধু সামান্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন–হঠাৎ আচমকা মস্ত একটা লাফ দিয়ে উঠে তরোয়াল হাতে সিধে হলেন, রণহুংকার ছেড়ে ছুটলেন মেজর রাকার কামানগুলোর দিকে। হতভম্ব হয়ে পড়ল মাইকেল, কী ঘটছে বুঝতে খানিকটা সময় লাগল তার। শত্রুর পজিশনে পৌঁছুবার জন্য

প্রয়োজনীয় দু'হাজার গজের মধ্যে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছেন কামাল হাসান, এই সময় তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরবার সুযোগ হলো মাইকেলের।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে একজন গানার দু' হাতে বিনকিউলার তুলে অচল আর্মারড কারের উপর চোখ বুলাল।

প্রথম শেলটা গরবিনীর কাছাকাছি পড়ল, আরও সামনে মাইকেল পিছন থেকে জড়িয়ে ধরায় কামাল হাসান তখন ধস্তাধস্তি শুরু করছেন। কৃত্রিম দাঁত, ওগুলোর সাহায্যে কামড়ানো যায় না, তাই আঙুলের নখ দিয়ে মাইকেলের উপর হামলা চালালেন বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান। হার মানল মাইকেল, ছেড়ে দিল তাকে, ঝুঁকে একটা পাথর তুলে নিল হাতে। আকারে সেটা ক্রিকেট বলের মত। তরোয়াল বাগিয়ে ধরে আবার ছুটলেন কামাল হাসান, তার পিছু নিল মাইকেল। বুড়ো মানুষ, খুলিটা কী পরিমাণ ভঙ্গুর আন্দাজ পাবার চেষ্টা করল সে। কানের পিছনে, খানিকটা উপরে, একটা জায়গা পছন্দ হলো তার, ওখানটায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। মারল প্রায় আদর করবার ভঙ্গিতে, আবার এত আস্তে নয় যে ব্যথা পাবেন অথচ জ্ঞান হারাবেন না। তা যদি ঘটে, মাইকেলের কপালে খারাবি আছে। কুলিটা সামান্য ডেবে গেল ভিতর দিকে, বিনাবাক্যব্যয়ে ঢলে পড়লেন কামাল হাসান, মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগেই তাকে দু'হাতের মধ্যে ধরে ফেলল মাইকেল।

গোত্রপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছে সে, তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে যেন ঘুমন্ত একটা শিশু। মাইকেল ছুটছে, ওদের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে শেলগুলো। বিধ্বস্ত আর্মারড কারের পাশে পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে।

খালি মাঠে কামানের গোলা পড়ে কেন? ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার! 'ওহে, আব্বাস, ব্যাপার কি দেখো তো?'

রানার চিৎকার শুনে টারিটের আরও উপরে উঠে পড়ল আব্বাস, পিছন দিকে তাকিয়ে কী ঘটছে বুঝবার চেষ্টা করল। এতদূর থেকে বিধ্বস্ত গরবিনীর খোলটা দেখতে পাবার কথা নয়, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথর বা ঘাসের একটা চাপড়া বলে মনে হবে। গত কয়েক মিনিটে ওরা দু'জন অন্তত পঞ্চাশ বার ওদিকে তাকিয়েছে, ওটাকে আর্মারড কার বলে চিনতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটার চারদিকে অসংখ্য শেল বিস্ফোরিত হতে দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল আব্বাস। 'আমার দাদু!' প্রায় কেঁদে ফেলল সে। 'ওখানে আমার দাদু রয়েছেন, মাসুদ ভাই! হায় খোদা, ওরা গোলা খেয়েছে!'

চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক করল রানা, উঠে এল হ্যাচ থেকে, শার্টের প্রান্ত দিয়ে বিনকিউলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করল। সেটা চোখে তুলতেই লাফ দিয়ে কাছে চলে এল গরবিনী, সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত মূর্তিটাকে চিনতে পারল সে। টুইডের সুট পরনে, নিশ্চয় মাইকেল। বুকের সঙ্গে কাকে যেন ধরে রয়েছে, বাতাসে উড়ছে সাদা আলখেল্লা। তারমানে কামাল হাসান আহত হয়েছেন! নিহত হলে...না মারা গেলে লাশটা বয়ে আনত না মাইকেল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা, বিধ্বস্ত গরবিনীর খোলের আড়ালে পৌঁছে গেছে মাইকেল।

'ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে, মাসুদ ভাই!' ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাল আব্বাস। 'কেউ সাহায্য না করলে মারা পড়বে ওরা!'

'চলো যাই,' বলল রানা, হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে পড়ল

ড্রাইভারের সিটে, থ্রটলে চাপ পড়তেই লাফ দিয়ে ছুটল চঞ্চলা।

একটা গোলাও ওদের দিকে এল না, শিফটারা স্থির টার্গেটকে নিয়ে ব্যস্ত। বারবার কামান দাগবার ফলে দূরত্বের নিখুঁত হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছে তারা, প্রতিটি গোলা আগেরটার চেয়ে গরবিনীর আরও কাছে বিস্ফোরিত হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে সরাসরি আঘাত খাবে অচল আর্মারড কার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পায়ের চাপে থ্রটলটাকে মেঝের সঙ্গে সমান করে দিল রানা, কিন্তু ঠিক বিপদের সময়টাতে চঞ্চলা তার আসল স্বভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। আর্মারড কারের ইতস্তত ভাবটুকু অনুভব করল রানা, মুহূর্তের জন্য বদলে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ, খক খক করল, ভাবটা পাঁয়তারা কষবার, গোঁ ধরে বোঝাতে চাইছে পাওয়ার সাপ্লাই যথেষ্ট নয়। তারপর আবার সমস্ত অভিযোগ ভুলে গিয়ে আগের মতই তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল।

'গুড লিটল ডার্লিং,' ভাইজরে চোখ রেখে সামনে তাকাল রানা, স্যাঁৎ করে সামান্য একটু বাঁ দিকে সরিয়ে নিল চঞ্চলাকে–বিধ্বস্ত গরবিনী আর শেলগুলোর বিস্ফোরণকে আড়াল হিসাবে পেতে চাইছে।

নাক বরাবর সামনে বিস্ফোরিত হলো একটা শেল, সদ্য তৈরি ধূমায়িত গর্তগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল রানা। প্রয়োজনের চেয়ে খানিকটা বেশি এগিয়ে পিছনের চাকাগুলোর উপর পাক খাওয়াল চঞ্চলাকে, যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরে গেল আর্মারড কারের নাক, সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দ্রুত পালানোর জন্য তৈরি।

পুরোপুরি না হলেও, গরবিনীর খানিকটা আড়াল পেয়েছে চঞ্চলা, শিফটারা ওটার অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে, কামাল

হাসানকে কোলে নিয়ে বসে থাকা মাইকেলের কাছ থেকে মাত্র সাত-আট গজ দূরে।

'মাইক!' হাঁক ছাড়ল রানা, হ্যাচ থেকে এইমাত্র মাথা তুলেছে।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল মাইকেল, চেহারায় হতচকিত ভাব আর অবিশ্বাস। শেল বিস্ফোরণের অবিরাম শব্দে কালা হয়ে ছিল সে, টেরও পায়নি রানা ওকে উদ্ধার করবার জন্য আবার ফিরে এসেছে।

আবার হাঁক ছাড়তে হলো রানাকে। 'তুমি শালা নরকে পচে মরো–বলি, আসবে নাকি ওখানে বসে থাকবে?'

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল মাইকেলের, কামাল হাসানকে কোল থেকে বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নিচু করে ছুটল চঞ্চলার দিকে। একটা গোলা এত কাছে বিস্ফোরিত হলো যে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল মাইকেল, অচল আর্মারড কারের গায়ে-মাথায় পাথর আর আগুন বৃষ্টি হলো।

একবার মনে হলো কামাল হাসানকে বুক থেকে ফেলে দেবে মাইকেল। পরমুহূর্তে ব্যাকুল দু'জোড়া হাতে তুলে দিল অজ্ঞান দেহটাকে। কামাল হাসানকে ভাল করে ধরল আব্বাস।

'দাদু, আমার দাদু।' আব্বাস ফোঁপাচ্ছে। 'উনি কী...?'

'চিন্তার কিছু নেই, ছোট্ট একটা পাথর লেগেছে মাথায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাইকেল, মুহূর্তের জন্য হেলান দিল গাড়ির গায়ে, নোংরা গাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের মোটা ধারা। রানার দিকে তাকাল মুখ তুলে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আর আসছ না,' কর্কশ সুরে বলল সে।

'চিন্তাটা খেলেছিল মাথায়,' হেসে বলল রানা, ঝুঁকে মাইকেলের হাতটা ধরল, টেনে গাড়ির মাথায় তুলে আনল তাকে।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু রানার হাতটা ছাড়ল না মাইকেল,

আরও এক সেকেন্ড ধরে থাকল, চাপ দিল মৃদু। 'আমার কাছে তোমার পাওনা থাকল, ওল্ড চ্যাপ।'

'ভেবো না ইতস্তত করব চাইতে।' নিঃশব্দে হাসল রানা।

'এনি টাইম। এনি টাইম অ্যাট অল।'

ঠিক এই সময় চ্যালেঞ্জের সুরে গর্জে উঠল চঞ্চলা, শিফটা কামানের উপর্যুপরি বিস্ফোরণের জবাবে ব্যাকফায়ার করল। খক-খক করে উঠল এঞ্জিন, গোঙাল, তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেল।

'ওহ্, ইউ ডটার অভ আ বীচ!' রাগে নিজের চুল খামচে ধরল রানা। 'আর সময় পেলি না!'

'একটা মেয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় পরিচয় হয়েছিল...।'

'পরে,' বলল রানা। 'যাও, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলটা ঘোরাও।'

'মাই প্লেজার, ওল্ড চ্যাপ,' বলল মাইকেল, একটুর জন্য লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ একটা গোলার বিস্ফোরণ আর্মারড কারের মাথা থেকে নীচে ফেলে দিল তাকে। টলতে টলতে দাঁড়াল সে, সুট থেকে ধুলো-বালি ঝাড়ল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির সামনে চলে এল।

ঝাড়া এক মিনিট হ্যান্ডেল ধরে সংগ্রাম করল মাইকেল, নিঃশেষে ব্যয় করল ক্লান্ত শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু, ফলাফল শূন্য। মাটিতে ঠিক বসল না, পড়ে গেল, বেদম হাঁপাচ্ছে। 'আমি শেষ, ওল্ড চ্যাপ।'

হ্যান্ডেলের সামনে থেকে সরে গেল মাইকেল, তার জায়গায় রানা দাঁড়াল। চারদিকের বিস্ফোরণ ভুলে থাকবার চেষ্টা করল ও, ধেয়ে আসা ধুলো আর ধোঁয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখল মুখ, চোখ বন্ধ, প্রাণপণে ঘোরাল হ্যান্ডেলটা।

আরও এক মিনিট পর চেঁচিয়ে বলল মাইকেল, 'ডাইনীটা মারা গেছে।'

প্রচণ্ড রাগে কথা বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেলল রানা, মুখের চেহারা লাল হয়ে উঠল, গলায় ফুটে উঠল সব ক'টা নীল রগ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকেও হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো, দম ফুরিয়ে গেছে।

এক সেকেন্ড পর বলল, 'টুলকিটটা সিটের নীচে, মাইকেল।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মাইকেল। 'কী বলছ, ওল্ড চ্যাপ? এখানে? এখন? ভাবছ পার্টস খুলে মেরামত করার সময় তোমাকে দেয়া হবে, কী?' অস্থির একটা হাত তুলে চারদিক দেখাল সে–রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, শিফটা কামান, শেল বিস্ফোরণ। 'কী দেখছ চারপাশে?'

'আর কোন বিকল্প জানা আছে?' ঝাঁঝের সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

চারদিকে চোখ বুলাল মাইকেল, ঢালু কাঁধ দুটো হঠাৎ উঁচু করল, ঝুলে পড়া মুখ ফিরে পেল সুষ্ঠু আকৃতি, ব্যঙ্গাত্মক নিঃশব্দ হাসিতে প্রসারিত হলো ঠোঁটের একটা কোণ। 'তুমি জিজ্ঞেস করলে সেটাই ভারি আশ্চর্য, ওল্ড চ্যাপ। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা হলো এই যে–,' হাত তুলে রানাকে দেখাল সে, রানা সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, আলোড়িত ধোঁয়া আর ধুলোর কিনারা থেকে কিম্ভূতকিমাকার একটা জন্তু হোঁচট খেতে খেতে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল নিতম্বিনী, দড়াম করে একযোগে খুলে গেল দুটো হ্যাচ। একটায় বেরুল রাহেলা বানুর কালো, অপরটায় অ্যানি উইসপারের সোনালি মাথা
।

রানার দিকে ঝুঁকল অ্যানি, হাত দিয়ে মুখের চারপাশে চোঙ তৈরি করল, শেল বিস্ফোরণের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার, 'চঞ্চলার হয়েছেটা কী?'

মুখ খুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল রানা, চেহারা এখনও টকটকে লাল, দর দর করে ঘামছে। 'যা স্বভাব, হঠাৎ বেঁকে বসেছে।'

'টো রোপটা কষে বাঁধো,' বলল অ্যানি। 'তোমাদের টেনে নিয়ে যাব।'

সাত

বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে বীরযোদ্ধারা; তাদের সদম্ভ পদচারণা, মন-খোলা হাসি আর উল্লাসধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে আদিবাসীদের ক্যাম্প। কিশোরী মেয়েরা প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর ছুটোছুটি করে ভাই-বেরাদারদের খুঁজে বের করল, গলায় পরিয়ে দিল বিজয়মাল্য। আরও যারা বড়, কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নাচ আর গানের আসর বসাল। যুবতী স্ত্রীরা, গনগনে আগুনের ধারে বসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, ঘন ঘন মুখ তুলে স্বামীদের দেখে নিল, কথা হলো চোখে চোখে, পুরুষদের গর্বে তারাও গর্বিত। রাতে যে ভোজটা হবে তার আয়োজন ব্যাপক, গোটা ক্যাম্প জুড়ে একশোরও বেশি শুধু গরু জবাই করা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে খাসী, ভেড়া আর উট। বাতাস ভারি হয়ে আছে মাংস আর মশলার গন্ধে।

টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে নিজের কাজে ব্যস্ত অ্যানি উইসপার বসে আছে নিজের তাঁবুর ফ্ল্যাপের নীচে, কী-বোর্ডের

উপর ব্যস্ত মৌমাছির মত উড়ে বেড়াচ্ছে তার আঙুলগুলো—হারারি ও রাসটা গোত্রদ্বয়ের সাহস আর নৈপুণ্যের বর্ণনা দিচ্ছে সে, প্রায় নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধু আত্মরক্ষার স্বার্থে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শিফটা বাহিনীর বিরুদ্ধে, স্রেফ তরোয়াল আর ঘোড়া সম্বল করে কী বীরত্বের সঙ্গেই না লড়েছে তারা। যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দেওয়ার পর, অ্যানি লিখল—শিফটাদের শুধু দুষ্কৃতকারী ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে, কারণ তাদের এবারকার আক্রমণের উদ্দেশ্য শুধু লুঠপাট করা নয়। শিফটারা গণহত্যা চালাচ্ছে, আর তাদেরকে সাহায্য করছে বিদেশী শক্তি। এখন আর এটা কোন গোপন ব্যাপার নয় যে ইথিওপিয়ায় ফণা তুলেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নামক বিষাক্ত সাপ। জন-বিরোধী অত্যাচারী সম্রাট হাইলে সেলাসীকে জোর করে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখবার জন্য কমিউনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। দু'পক্ষের যুদ্ধে আদিবাসী আর হারারি অন্যান্য গোত্রগুলো হয়ে পড়েছে অসহায় শিকার। শিফটারা সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে...।

'চমৎকার, মিস অ্যানি, ভারি চমৎকার!' অ্যানির কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে শেষ লাইনগুলো পড়ে ফেলেছে রাহেলা বানু। 'তোমার লেখা পড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, ভাই! তোমার প্রতি আমি, আমাদের গোত্র চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। এত সুন্দর রিপোর্ট...।'

'তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুশি হলাম, তবে তুমি আমার সম্পাদক হলে আরও খুশি হতাম।' লেখা শেষ করে কাগজটা টাইপরাইটার থেকে বের করল অ্যানি, পড়বার সময় কলম দিয়ে সংশোধন করল দু'একটা লাইন, সবশেষে ভাঁজ করা কাগজটা মোটা একটা খয়েরী এনভেলাপে ভরল, জিভের ডগা দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিল আঠা, তারপর বন্ধ করল এনভেলাপের মুখ। জিজ্ঞেস

করল, ‘ঠিক জানো তো, বানু, লোকটা বিশ্বস্ত?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই, শতকরা একশো ভাগ—আব্বাসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যারা, তাদের একজন।’ অ্যানির কাছ থেকে এনভেলাপটা নিয়ে অদূরে অপেক্ষারত ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরিয়ে দিল বানু, তাঁবুর বাইরে ঘণ্টা দেড়েক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে, অনলবর্ষী ভাষায় লোকটাকে জ্ঞানদান করল বানু; রিপোর্টে কী আছে, যথাস্থানে পৌঁছুলে গোত্রগুলোর অনুকূলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, ইত্যাদি বোঝাবার পর যুবক ঘোড়সওয়ারের দুই কাঁধে হাত রেখে কাছে টানল সে, চুমো খেলো তার কপালে, তারপর কোমরে একটা মৃদু চাপড় মেরে পিছিয়ে এল। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ল যুবক, লাগাম তুলে নিল, টগবগ শব্দ করে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল ঘোড়া, কালো হয়ে আসা গিরিসংকটের মুখ লক্ষ্য করে ছুটল—ওদিকে কর্কশ পাহাড়ের পাঁচিল আর এবড়োখেবড়ো শৃঙ্গগুলোকে ঢেকে দিতে শুরু করেছে সন্ধ্যার ধোঁয়াটে নীল ছায়া।

‘মাঝরাতের আগেই সারডি শহরে পৌঁছে যাবে ও। বলে দিয়েছি, পথে কোথাও যেন না থামে। তোমার মেসেজ টেলিগ্রাফে চড়বে, এই ধরো, কাল ভোরে।’

‘ধন্যবাদ, বানু ডিয়ার।’ ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যানি। টাইপরাইটারটা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ছে, ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল বানু। গোসল করেছে অ্যানি, সঙ্গে করে আনা সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরেছে—ম্লান নীল হালকা লিনেন-এর স্কার্ট, কোমরের কাছে আঁটসাঁট হয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হলেও, হাঁটুর পিছনে সুগঠিত মাংসপেশী উন্মুক্ত হয়ে আছে, যে-কোন পুরুষের মনে লোভ জাগাবে, পায়ের সিল্ক মোজা ফর্সা মাখন রঙা ত্বকের

সঙ্গে মিশে আছে।

'তোমার পোশাকটা ভারি সুন্দর,' মৃদু কণ্ঠে বলল বানু। 'তোমার চুল অত্যন্ত নরম আর হলুদ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আহা, মিস অ্যানি, আমি যদি তোমার মত সুন্দর হতাম! আমি কালো মেয়ে, আমার গায়ের চামড়া কোনদিনই তোমার মত হবে না।'

'ঠাট্টা করছ, তাই না?' বিব্রত ভাবটুকু গোপন করে কটাক্ষ হানল অ্যানি। 'তোমার চামড়ায় যে লাবণ্য, দেখি আর হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরি–সে খবর রাখো?' একযোগে হেসে উঠল দু'জন।

'আমাকে বলবে, আজ তুমি কার কথা ভেবে এমন সুন্দর করে সেজেছ, মিস অ্যানি? দাঁড়াও, আমাকে আন্দাজ করতে দাও। মা-সু-দ রা-না। ঠিক? উফ্, আজ তোমাকে দেখে মাথাটা ঘুরে উঠবে ওর। আমি জানি, তোমাকে এই মুহূর্তে খুঁজছে ও। চলো না, ওকে আমরা খুঁজে বের করি?'

'ভুলে গেছ, তোমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি, হাসিটা গোপন রাখল। 'আব্বাসকে খুঁজে বের করতে হবে না? আমি জানি, সে তোমাকে খুঁজছে।'

পরামর্শটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করল বানু। একদিকে কর্তব্য, আরেক দিকে ফুর্তি, উভয়সংকটে পড়ে গেছে। তারপর মুখ তুলে ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক জানো, একা সামলাতে পারবে? যদি কোন সমস্যা হয়...।'

'বাহ্, ইতিমধ্যে তোমার কাছ থেকে খানিকটা হলেও তো ট্রেনিং পেয়েছি, তাই না? চেষ্টা করলে কেন সামলাতে পারব ন! আর যদি কোন সমস্যা হয়ই, তোমাকে তখন ডাকব।'

'সাথে সাথে চলে আসব আমি,' আশ্বাস দিয়ে বলল বানু।

রানাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, পরিষ্কার ধারণা আছে

অ্যানি উইসপারের। পা টিপে টিপে উঁচু ইস্পাতের খোলের পাশে এসে দাঁড়াল সে, কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রানাকে কাজ করতে দেখল। নিজের কাজে সম্পূর্ণ নিমগ্ন, অ্যানির উপস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর। নিজেকে তিরস্কার করল অ্যানি মনে মনে, এতদিনেও কেন সে রানাকে ভাল করে দেখতে পায়নি বা বুঝতে পারেনি বলে; কেন সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে ছিল। বালকসুলভ তরতাজা ভাবটুকুও মিথ্যে নয়, কিন্তু সেটা শুধু উপরের আবরণ, ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে শক্তিশালী একজন পরিণত পুরুষ, যে পুরুষ নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে, হতে পারে সদয় প্রেমিক। ওর চেহারায় চিরতরুণ ভাবটুকু, অ্যানি উপলব্ধি করল, বুড়ো বয়েসেও অম্লান থাকবে। ওর চোখে দৃষ্টির যে গভীরতা, আজ যেন হঠাৎ করে সেটা দেখতে পেল অ্যানি। নতুন করে লক্ষ করল, চোয়ালের চারধারে ইস্পাতকঠিন দৃঢ় একটা ভাব ফুটে আছে। এই জাতের পুরুষরাই তো যা করব বলে ভাবে তা করে দেখায়, কোন হতাশা বা পিছুটান তাদেরকে কর্তব্য থেকে সরিয়ে আনতে পারে না। দায়িত্বসচেতন আর কর্তব্যপরায়ণ, পুরুষজাতির মধ্যে এদেরকেই শ্রদ্ধা করে অ্যানি। হঠাৎ করে অ্যানির প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা হলো, রানাকে ওর কাজে সাহায্য করবে সে, সারাজীবন ধরে ওর পাশে, ওর সঙ্গে হাঁটবে–ওকে, শুধু ওকেই ভালবাসা দেবে সে, ওর সন্তান ধারণ করবে পেটে, ওর সন্তানকে লালন করবে, ভাগীদার হবে ওর দুঃখ আর শোকের, দু'জনে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখবে।

প্রেমে পড়লে বোধহয় তৃতীয় একটা নয়ন খুলে যায়, ভাবল অ্যানি। চুপিচুপি রানাকে দেখল সে, অকারণ পুলকে শিহরিত হলো সারা শরীর। নাকি, প্রেমে পড়লে আসলে নিজেকে বোকা বানানো

সহজ হয়? চিন্তাটা খানিক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল তাকে। সে একজন রিপোর্টার, প্রতিটি বিষয় বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, নিজের মধ্যে ভাবাবেগে ভেসে যাবার প্রবণতা লক্ষ করে অবাকই হয়েছে। সমস্ত চিন্তা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে শুরু করল হিসাব–যোগ অংক। সংখ্যাগুলো এক এক করে সাজাল সে। রানা সুন্দর, কর্মঠ, বুদ্ধিমান…। আংশিক যোগফল দাঁড়াল পঞ্চাশ। আঁতকে উঠল অ্যানি, এভাবে যোগ করতে থাকলে যোগফল পাঁচ হাজারে দাঁড়াবে, নাকি পঞ্চাশ হাজারে, বলা অসম্ভব! রানা সম্পর্কে যা ভাবছে বা মনে পড়ছে সবই যোগের খাতায় ঢুকতে হয়, বিয়োগের খাতা শূন্য থাকে! হায় ঈশ্বর, তারমানে ভালভাবেই ডুবেছি দেখছি! যাকে বলে হাবুডুবু খাচ্ছি!

তারপর মনে হলো, সে বোধহয় নিজেকে কনভিন্স করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অতি সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল তার, একজন পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে। দ্বিধা, অনিশ্চিত ভাবটুকু আবার ফিরে এল মনে। স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আবিষ্কার করল, দু'জন পুরুষকে সে দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন করবার চেষ্টা করছে। তুলনা করছে কে তার জন্য ভাল, কার কী গুণ বা অগুণ। মাইকেল সেভারস মানেই যেন অবাধ ফুর্তি, দুষ্ট আনন্দের অফুরান উৎস। আর মাসুদ রানা মানেই মার্জিত প্রেম যোগ নিরাপদ আশ্রয়, যোগ আদর্শগত উত্তরণ, যোগ…।

তারপর আবার লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। তার বিশ্বাস, ওকে সে ভালবাসে। তার জানা নেই রানাও তাকে ভালবাসে কি না। ইদানীং রানা একটু যেন দূরে থাকতে পছন্দ করে, একটু এড়িয়ে যাওয়া ভাব। সেদিনের কথা ভোলেনি অ্যানি, ওকে চুমো খাওয়ার সুযোগ পেয়েও সেটা নেয়নি রানা। কেন? কে

এই লোক? কী তার সত্যিকার পরিচয়? কেন সে আফ্রিকায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে? জীবনের কাছ থেকে কী আশা করে সে, তার স্বপ্ন কী? এরকম হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর অ্যানির জানা নেই। ভালবাসা কি স্রেফ একটা ভাবাবেগ, সেখানে স্বার্থচিন্তা বা কৌতূহল কি থাকতে নেই? যাকে সে প্রায় চেনেই না, যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই তার জানা নেই, এমন একজন লোককে কি সত্যিকার অর্থে ভালবাসা যায়?

না–সিদ্ধান্তটা মনে আসতেই, নিজের অজান্তে প্রায় আঁতকে উঠল অ্যানি উইসপার। শব্দটা শুনে ঝট্ করে তার দিকে ঘাড় ফেরাল রানা।

রানার চোখে বিস্ময়, বিস্ময়ের জায়গাটুকু দ্রুত দখল করে নিল আনন্দ। অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল ও, সেই সঙ্গে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ভুবনভোলানো হাসি। 'এই মেয়ে, আগে যেন কোথায় দেখেছি তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

কোমরে দু'হাত রেখে পাক খেলো অ্যানি, ফুলে উঠল পোশাকটা। 'পছন্দ হয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা, জানতে চাইল, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'কামাল হাসান ভোজ দিচ্ছে, ভুলে গেছ?'

'তাঁর আরেকটা ভোজ আমার সহ্য হবে?' কৃত্রিম ভয়ে শিউরে উঠল রানা। 'শিফটাদের হামলা, নাকি কামাল হাসানের দাওয়াত–ঠিক জানি না, কোন্‌টা বেশি বিপজ্জনক।'

'কিন্তু ওখানে তোমাকে থাকতেই হবে–মহান বিজয়ের অন্যতম নায়কদের মধ্যে তুমিও তো একজন।'

'হুম।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে মন দিল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'গোলমালটা কোথায় ধরতে পেরেছ?' সরে রানার পাশে চলে এল অ্যানি।

'না।' হাত নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করল রানা। 'সমস্ত পার্টস খুলেছি, তারপর আবার নতুন করে জোড়া লাগিয়েছি, কোথাও কোন ক্রটি নেই।' দাঁড়াল রানা, পিছিয়ে এল এক পা, ন্যাকড়ায় হাত মুছল। 'কোথায় যে কী হয়েছে, আল্লা মালুম।'

'আবার স্টার্ট দিয়ে দেখেছ?' কাপড়ে ময়লা লাগবার ভয়ে অ্যানিও এক পা পিছাল।

'কোন লাভ নেই—অন্তত যতক্ষণ না ক্রটিটা ধরা পড়ে। এখন থাক, পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

'এখুনি একবার স্টার্ট দিয়ে দেখো না।' ঠোঁট টিপে হাসল অ্যানি।

'দূর, বললাম না, কোথায় গোলমাল ধরতে পারিনি।'

'তবু, আমি যখন বলছি, একবার চেষ্টা করে দেখবে না?' আবদার জানাল অ্যানি।

'স্রেফ তোমার মন রক্ষার জন্যে,' বলে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকল রানা, সেটা শুধু একবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিল চঞ্চলা, সাবলীল যান্ত্রিক ছন্দে চালু থাকল এঞ্জিন। 'মাই গড!' এক পা পিছিয়ে এসে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ও। 'ফাজলামি ছাড়া আর কী বলতে পারি!'

'তোমার লৌহমানবীদের মধ্যে ও-ই একমাত্র ভদ্রমহিলা,' ব্যাখ্যাদান করল অ্যানি। 'আর একজন ভদ্রমহিলার আচরণ যুক্তিসঙ্গত হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।'

অ্যানির দিকে সরাসরি তাকানোর জন্য ঘুরল রানা, নিঃশব্দে হাসল, চেহারায় সবজান্তার যে ভাবটা ফুটে রয়েছে তা দেখে

রীতিমত রাঙা হয়ে উঠল অ্যানি। 'সেটা আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি,' বলল রানা।

দিগন্ত থেকে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে যাবার ক'মিনিট আগে গিরিসংকট থেকে নেমে এল এক ঘোড়সওয়ার, ঢাল বেয়ে ঘোড়াটা ছুটে এল লাফাতে লাফাতে, তারপর সমতল ভূমিতে নেমে বিদ্যুৎগতি তীরের মত এগিয়ে এল ওটা, ঘোড়সওয়ার লাগাম টানল কামাল হাসানের ক্যাম্পের সামনে। কালো আর সাদা রঙের ঘোড়াটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওটার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক, ঘামে চকচক করছে তার মুখ।

তার হাত থেকে মেসেজটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ছুটল রাহেলা বানু, সার সার তাঁবুর মাঝখান দিয়ে দৌড় দিল সে, দমকা বাতাসের মত ঢুকে পড়ল অ্যানির তাঁবুতে, হাতের কাগজটা ঘন ঘন নাড়ল, ভিতরে ঢুকবার আগে যে সাড়া দিতে হয় সেটা বেমালুম ভুলে গেছে।

পাথরের একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রানা তাঁবুর ভিতর। ওর সামনে অ্যানি উইসপার। রানার গায়ে সাবানের গন্ধ, সদ্য ব্যাক ব্রাশ করা চুল এখনও ভিজে। গোসল করবার পর রানা নিজের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, কথা আছে বলে হাত ধরে নিজের তাঁবুতে ওকে টেনে এনেছে অ্যানি।

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, রানা?'

অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'কী বলছ! কই, না তো!'

'একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই—বলো।'

'তুমি আমাকে পছন্দ করো না?'

'কেন পছন্দ করব না–জীবনে যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, তুমি তাদের মধ্যে সেরা।'

'তা হলে?' রানার একেবারে বুকের কাছে এগিয়ে এল অ্যানি, আলিঙ্গন করবার জন্য হাত তুলল। 'তা হলে?' রানা এখনও পাথর।

'ওহ্!' বিস্ময় প্রকাশ করল বানু, প্রকৃতিদত্ত আগ্রহ আর মোহ নিয়ে জন্মসূত্রে একজন ষড়যন্ত্রকারিণী হঠাৎ যেন একটা গোপন প্রণয়ের কথা জেনে ফেলেছে। 'তোমরা ব্যস্ত!'

'হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ, আমি ব্যস্ত,' ধমকে উঠল অ্যানি, দুই গালে আগুনের আঁচ অনুভব করল, চেহারায় দিশেহারা ভাব নিয়ে পিছিয়ে এল।

'আমি দুঃখিত, মিস অ্যানি। ভাবলাম মেসেজটা হয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...।'

এতক্ষণে বানুর হাতে কেবলগ্রামটা দেখতে পেল অ্যানি, নিমেষে সমস্ত অস্বস্তি কাটিয়ে উঠল সে।

'ভাবলাম তুমি বোধহয় দেখতে চাইবে এটা...।'

বানুর হাত থেকে কেড়ে নিল অ্যানি কাগজটা, সীল ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে পড়ল। মেসেজটা পড়তে পড়তে তার সব রাগ পানি হয়ে গেল, পড়া শেষ করে চকচকে চোখে বানুর দিকে তাকাল সে। 'ধন্যবাদ, বানু ডিয়ার–তুমি ঠিকই ভেবেছ!' চরকির মত আধপাক ঘুরল সে, নাচের ভঙ্গিতে এগোল, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানার ঘাড়, খিল খিল করে হাসছে।

'অ্যাই, কী হলো, অ্যাই!' অ্যানির সঙ্গে রানাও হাসছে, আড়ষ্টভঙ্গিতে অ্যানির কোমরে হাত রেখে তাল সামলাল, বানুর উপস্থিতিতে অপ্রতিভ বোধ করছে ও। 'খুলে বলো কী হয়েছে।'

'আমার সম্পাদক মেসেজ পাঠিয়েছেন,' বলল অ্যানি। 'ওয়েলস অভ চান্ডিতে শিফটাদের হামলার উপর আমার রিপোর্টটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছে। সারা দুনিয়ার প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে হেডলাইন হয়েছে খবরটা। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে তথ্যভিত্তিক আরও খবর পেতে তিনি আগ্রহী।'

অ্যানি থামতেই কাগজটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রানাকে পরাজিত করে সেটা ছিনিয়ে নিল বানু, এমন গম্ভীর চেহারা নিয়ে পড়তে শুরু করল যেন গোটা ব্যাপারটা তাকে নিয়ে। পড়া শেষ করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল কাগজটা, অ্যানিকে বলল, 'তুমি যে এ-ধরনের একটা কিছু আমাদের জন্যে করতে পারবে, সে বিশ্বাস প্রথম থেকেই ছিল বাবার।' নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল মেয়েটা, হরিণের মত টানা টানা চোখ থেকে পানি গড়াল। 'দুনিয়া এখন জানে ইথিওপিয়ার কয়েক লাখ আদিবাসী কী রকম নির্যাতন সহ্য করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে। সম্রাট হাইলে সেলাসী আমাদেরকে কী সুখেই না রেখেছে! এবার সভ্য দুনিয়া থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য আসবে।' মেয়েটা শিশুর সারল্য নিয়ে বিশ্বাস করছে, মঙ্গলের কাছে অমঙ্গলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রানার বাহু থেকে অ্যানিকে ছাড়িয়ে আনল সে, রানার পরিবর্তে সে-ই আলিঙ্গন করল অ্যানিকে। 'মিস অ্যানি, তোমার এই ঋণ কোনদিন আমরা শোধ করতে পারব না।' তার চোখের পানি অ্যানির নাক-মুখ ভিজিয়ে দিল, ঘন ঘন নাক টানল সে, নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল অ্যানির মুখ। 'তোমার কথা চিরকাল আমরা মনে রাখব,' বলল সে, কান্নার মাঝখানে হাসল। 'চলো যাই, দাদুকে খবরটা দেই।'

খবরটা কেন সুখবর, আদিবাসীদের তাতে কী উপকার বা লাভ, শত চেষ্টা করেও বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান কামাল হাসানকে তা বোঝাতে পারা গেল না। যখন তাঁকে বলা হলো যে অদূর ভবিষ্যতে শিফটাদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়, ভয়ানক রেগে উঠলেন তিনি। কী, যুদ্ধ থেমে যাবে? তারমানে বীরত্ব দেখাবার সুযোগই আর পাওয়া যাবে না? প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে কাগজটা তিনি ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। উচ্চৈঃস্বরে অ্যামহারিক ভাষায় ভাষণ দিলেন তিনি, অনুবাদ করে তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খেয়ে গেল আব্বাস। তিনি বললেন, সম্রাট হাইলে সেলাসী জাহান্নামে যাক! বললেন, আমরা কমিউনিস্ট হয়ে গেছি! শিষ্য, অনুচর, মিত্র আর ভায়েরা, সবাই তোমরা মাথায় লাল পট্টি বাঁধো!

তাঁর এই আচরণের জন্য আব্বাস এককভাবে দায়ী করল মাইকেলকে, কারণ সে-ই নাকি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কামাল হাসানকে বোকা বানিয়ে মগের পর মগ তেজ খাইয়েছে।

তারপর, ভাষণের মাঝপথে, অকস্মাৎ হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করলেন কামাল হাসান। মাইকেলকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, ঘোষণা করলেন, তারা দু'জন আজন্ম বন্ধু, কমিউনিস্টদের জন্মশত্রু, এবং নিজে উপস্থিত থেকে কমপক্ষে সতেরোটা বিয়ে করাবেন মাইকেলের—কারণ তার নিজেরও সতেরোটা বেগম রয়েছে।

এরপর, ভাষণের মাঝপথেই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেলেন কামাল হাসান, নাটকীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঢলে পড়লেন মাংস ভরা বিশাল এক পাত্রে মুখ দিয়ে। সারাদিনের যুদ্ধ, মেসেজ শুনবার পর উত্তেজনা, আর মাত্রাতিরিক্ত তেজ, সব

মিলিয়ে বুড়ো মানুষটার শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকবারই কথা। পাত্র থেকে চারজন দেহরক্ষী তুলল তাঁকে, বয়ে নিয়ে গেল তাঁবুতে, এরইমধ্যে তিনি সশব্দে নাক ডাকতে শুরু করেছেন।

'চিন্তার কিছু নেই,' বানু তার অতিথিদের আশ্বস্ত করল। 'দাদু খুব বেশিক্ষণ অনুপস্থিত থাকবেন না–খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে আসবেন।'

'তাকে বরং তোমার পরামর্শ দেয়া উচিত, চব্বিশ ঘণ্টার আগে যেন ঘুম থেকে না জাগে,' হেঁড়ে গলায় বলল মাইকেল। 'মাই গড, এমন প্রাণশক্তি নিয়ে গোটা বিশেক লোক থাকলে দুনিয়ার বাকি সব মানুষ বেকার হয়ে যেত!'

বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েকশো অগ্নিকুণ্ডের আলো লালচে করে তুলেছে আকাশটাকে, পাহাড়চূড়ার মাথায় ভাসছে ম্লান চাঁদ, ক্লান্ত আদিবাসী যোদ্ধাদের মাথা কোলে নিয়ে সুরেলা কণ্ঠে গান ধরেছে যুবতী স্ত্রীরা, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফিসফাস করছে যুবকদের সঙ্গে কুমারী মেয়েরা।

চাঁদের ম্লান আলো আর অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা লেগে চকচক করছে দখল করা আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলো। কামাল হাসান আপাতত অনুপস্থিত থাকলেও, তাঁর ভোজসভা পুরোদমে চলছে, সম্মানিত সদস্য আর মেহমানদের সামনে তিনটে স্তূপে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো–রাইফেল, পিস্তল আর অ্যামুনিশন। অ্যামুনিশনের সঙ্গে অল্প দু'চারটে হ্যান্ডগ্রেনেডও রয়েছে, যদিও ওগুলো সম্পর্কে একা শুধু মাইকেলই খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছে। গ্রেনেডের সংখ্যা কম দেখে তার ধারণা হয়েছে, শিফটাদের

হাতেও জিনিসটা খুব বেশি নেই।

রাত যত বাড়তে লাগল, তেজের গুণে ভোজরনত বীরযোদ্ধাদের কৌতুক আর হাসির মাত্রাও সেই পরিমাণ তুঙ্গে উঠল।

উপত্যকার আরেক দিকে, গালাদের গোত্রপ্রধান নূর আয়াঙ গালাও বিজয় উৎসব পালন করছে। ওদিক থেকে মাঝে মধ্যেই মাতালদের চিৎকার বা দখল করা শিফটা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাইকেল আর রানার মাঝখানে বসেছে অ্যানি। বসবার আয়োজনটা তার নয়, সুযোগ পেলে রানার সঙ্গে একা বসত সে–কিন্তু মাইকেল সেভারসকে যত সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব বলে ধারণা করেছিল সে, বাস্তবে দেখা গেল ব্যাপারটা তত সহজ নয়। নাছোড়বান্দা মাইকেল যেন হাল না ছাড়বার পণ করেছে।

আব্বাসের পাশ থেকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এল বানু। মেহমানদের ঘাড় আর হাঁটু টপকে, কয়েকজনকে নিতম্বের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে গদিমোড়া আসনে অ্যানির পাশে বসল সে, তার আরেক পাশে মাইকেলকে খানিকটা জায়গা ছাড়তে হলো। অ্যানির কানের কাছে ঠোঁট, কথা বলল ফিসফিস করে।

'আমাকে তোমার আগেই জানানো উচিত ছিল,' গলায় দুঃখ নিয়ে অভিযোগ করল বানু। 'আমি টেরও পাইনি ভেতরে ভেতরে তুমি দু'জনের মধ্যে থেকে রানাকেই প্রথম সুযোগ দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আমাকে যদি খুলে বলতে, আমি হয়তো তোমাকে সৎ কিছু পরামর্শ দিতে পারতাম…।'

'সত্যি ভুল হয়ে গেছে,' হাসি চেপে বলল অ্যানি। 'দুঃখ কোরো না, আবার যখন বাছাই করার প্রশ্ন উঠবে, তোমাকে আমি অবশ্যই জানাব।'

‘তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয়,’ চাপা কণ্ঠে ঘোষণা করল বানু।

‘কী! কেন?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অ্যানি।

‘দেখছ না, তোমার কপাল কেমন ফাটা?’ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রাহেলা বানু। ‘তোমার সাথে প্রেম করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা মাত্র দু’জন। রানা আর মাইকেল, ব্যস। বিশ-বাইশটা প্রেম করার সুযোগই তুমি পাচ্ছ না। অনেক প্রেমিকের মধ্যে থেকে বাছাই করার যে মজা সেটা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে তোমাকে।’

হাসি চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল অ্যানি, পেটের পেশী কুঁকড়ে উঠল। ‘সত্যিই তো!’

‘আমি বলি কী,’ গোপন ষড়যন্ত্রের সুরে অ্যানির কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল বানু, ‘একবার একে, একবার ওকে, দু’জনকে নিয়েই খেলতে থাকো—কাউকেই পাকা কথা দিয়ো না। খেলতে খেলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ইতিমধ্যে দু’জনের সম্পর্কেই সমস্ত কিছু জানা হয়ে গেছে তোমার, তখন যাকে ভালো মনে হবে তাকে বেছে নিয়ো স্বামী হিসেবে...।’

এই সময় গালাদের ক্যাম্প থেকে একটা শব্দ ভেসে এল ওদের কানে। দূর থেকে এল, তা ছাড়া আদিবাসীরা অনর্গল কথা বলছে আশপাশে, অস্পষ্ট আর ভোঁতা শোনাল শব্দটা। তবু আওয়াজটার মধ্যে বুক ছ্যাঁৎ করা এমন একটা কিছু রয়েছে যে খপ করে বানুর কব্জি চেপে ধরল অ্যানি।

ওদের পাশে রানা আর মাইকেলও আড়ষ্ট হয়ে গেল, শিরদাঁড়া খাড়া করে তাকাল পরস্পরের দিকে, পরমুহূর্তে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল, কান খাড়া। দু’জনই শব্দের ধরনটা বুঝতে

পেরেছে–দীর্ঘ, প্রলম্বিত সুরে কেউ যেন ফুঁপিয়ে উঠল।

'ইতিমধ্যেই তোমার একটু ভুল হয়েছে, মিস অ্যানি,' নিজের প্রসঙ্গ ছাড়তে রাজি নয় বানু, ভাব দেখাল শব্দটা যেন শুনতে পায়নি সে। 'পুরুষদের ঠিকমত চিনতে না পারলে চুটিয়ে প্রেম করা খুব কঠিন। যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো, প্রথমবার সুযোগ দেয়ার জন্যে রানাকে বেছে নিয়ে খুব একটা বুদ্ধিমতীর কাজ করোনি তুমি...।'

তার একটা কথাও অ্যানির কানে যায়নি। 'বানু, কী ওটা?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'কীসের শব্দ হলো?' বানুর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিল সে।

'দূর, ও কিছু না!' অগ্রাহ্য করবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বানু। 'এ-সবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি!'

'কিছু না মানে? কীসে অভ্যস্ত হয়ে গেছ?'

ধৈর্য ধরে এক সেকেন্ড অ্যানির দিকে তাকিয়ে থাকল বানু, বুঝল একটা ব্যাখ্যা না পেলে তাকে শান্ত করা যাবে না। 'শোনো তা হলে,' বলল সে, চেহারায় ফুটে উঠল ঘৃণা আর আক্রোশ। 'ওখানে কী ঘটছে আন্দাজ করা কঠিন কিছু না। হোঁদল কুতকুত নূর আয়াঙ গালা তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, বুঝলে? আমরা জিতেছি শুনে গর্ত থেকে মুখ বের করেছে ইঁদুরটা, মালের বখরা পাবার আশায়। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গাভীগুলোকে নিয়ে এদিক দিয়ে গেল সে, এখন বোধহয় ভোজ আর উৎসব শুরু হয়েছে।' এক মুহূর্ত থেমে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'বাদ দাও!'

শব্দটা আবার হলো। তীক্ষ্ণ, অমানুষিক একটা চিৎকার, ধারাল নখের মত আঁচড় কাটল অ্যানির স্নায়ুতে। প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হলো, এক পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে তার ইচ্ছে হলো দু'হাতে

কান চেপে ধরে। যখন মনে হলো এবার তারস্নায়ু ছিঁড়ে যাবে, এই সময় অকস্মাৎ থেমে গেল আওয়াজটা।

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে শুনবার আগ্রহে টান টান একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, চিৎকারটা থামবার পরও কয়েক সেকেন্ড দীর্ঘায়িত হলো সেটা, তারপর এদিক ওদিক থেকে নিচু গলার মন্তব্য শোনা গেল, নড়েচড়ে বসল লোকজন, চাপা গুঞ্জনের ভিতর থেকে হেসে উঠল কেউ কেউ, যেন নিষ্ঠুর হতে পারবার মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ আছে।

'কী ওটা? তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন? কী করছে ওখানে ওরা?' বানুর কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিল অ্যানি।

'এত অস্থির হয়ো না তো!' মৃদু তিরস্কার করল বানু। 'নূর আয়াঙ গালা বন্দী ইটালিয়ানদের সাথে খেলছে।' নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত সে।

অ্যানি উপলব্ধি করল, আজ যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের কথা ওর মনেই ছিল না। 'খেলছে, বানু? কী বলতে চাও তুমি?'

ঘৃণায় কুঁচকে উঠল বানুর চেহারা, এক দলা থুথু ফেলল পায়ের কাছে। 'ওরা জানোয়ার, মিস অ্যানি। গালারা সব ক'জন এক একটা হিংস্র পশু। আর নূর আয়াঙ হলো খোদ শয়তান। আজ সারাটা রাত ওদের ক্যাম্পে এই কাণ্ড চলবে। সকালে, যখন সূর্য উঠবে, জানোয়ারগুলো বন্দীদের সেই জিনিসটা কেটে নেবে—মানে পুরুষদের ওটা আর কী...,' আবার থুথু ফেলল সে। 'বিয়ের আগে যে-কোন একজন বন্দীর ওটা কেটে নিতে হয় ওদের—কী বলো তোমরা? চামড়ার থলের ভেতর ডিমের মতো দুটো...?'

'টেসটিক্‌ল্‌,' কর্কশ সুরে বলল অ্যানি, শব্দটা গলায় আটকে যাওয়ায় আরেটকু হলে বিষম খাচ্ছিল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বানু। 'গালাদের রীতি হলো, একজন যুদ্ধবন্দীকে খুন করার পর তার টেসটিক্ল্ কেটে নিয়ে কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে হবে। তার আগে, নিয়ম হলো, বিদেশী বন্দীদের নিয়ে খেলবে ওরা।'

'কিন্তু ধরা তো শিফটারাও পড়েছে...।'

'ভেবেছ তাদেরকে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে? শিফটা বন্দীরা মারা গেছে অনেক আগেই, গালা যোদ্ধারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে না! শিফটাদের ওপর সবার সমান অধিকার ছিল, ফলে সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশী বন্দীরা শুধু সর্দার আর মাতবরদের বিবাহযোগ্য যুবকদের ভাগে পড়েছে।'

'ওদের থামানো যায় না?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি, তার গলা কেঁপে গেল।

'থামাবে?' বানু স্তম্ভিত। 'ওরা কারা? শত্রু নয়? তা ছাড়া, গালারা তাদের বন্দীদের নিয়ে কী করবে তা নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাতে যাব?'

রক্ত ছলকানো শব্দটা আবার শুরু হতেই আদিবাসীদের ক্যাম্প জুড়ে নেমে এল অটুট নিস্তব্ধতা, যেন প্রবল আগ্রহের সঙ্গে শব্দটা কখন আবার শোনা যাবে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল সবাই। মরুর শুকনো, মৌন বাতাস বিশ্বস্ততার সঙ্গে বয়ে নিয়ে এল যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ। একবার বাড়ে আওয়াজটা, একবার কমে, প্রতিবার বাড়বার সময় আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ লাগল কানে, এক সময় বিশ্বাস হতে চাইল না কোন মানুষের ফুসফুস থেকে এধরনের বিকট আর্তচিৎকার বেরুচ্ছে। সর্বাঙ্গে দাউ দাউ আগুন ধরে গেছে এমন একজন অভাগাও বোধহয় এভাবে একটানা চিৎকার করতে পারবে না।

‘ওহ্ গড! ওহ্ গড!’ বিড়বিড় করল অ্যানি, বানুর উপর থেকে চোখ তুলে মাইকেলের দিকে তাকাল।

স্থির ও নিশ্চুপ মাইকেল, অ্যানির দিকে তার মুখ খানিকটা ফেরানো, ফলে ঈশ্বরতুল্য ঠাণ্ডা ও ধ্যানমগ্ন অবয়বের পাশটা শুধু দেখতে পেল অ্যানি। রক্ত হিম করা চিৎকারটা থেমে যাবার পর সামনের দিকে ঝুঁকল সে, গনগনে আগুনে একটা কাঠি গুঁজলো, সেটা তুলে আগুন ধরাল দু’সারি সাদা দাঁতের মাঝখানে ধরা কালো চুরুটে।

বড় করে টান দিল মাইকেল, ধোঁয়াটুকু বুকে ধরে রাখল, তারপর ধীরে ধীরে বেরুতে দিল নাক দিয়ে। অবশেষে অ্যানির দিকে ফিরল সে।

‘বানু কী বললো তুমি শুনেছ। গালাদের একটা সামাজিক রীতি।’ বলবার সময় অ্যানির দিকে তাকিয়ে থাকল মাইকেল, কিন্তু কথাগুলো আসলে রানাকে বলছে, শেষ করবার আগেই বার কয়েক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে রানার চোখে তাকাল সে, ঠোঁটে ঝুলে আছে আধো হাসি।

তারপর দু’জনেই ওরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, কারও চোখে পলক নেই, চেহারা ভাবলেশহীন।

শব্দটা আবার হলো, কিন্তু এবার আগের চেয়ে দুর্বল, তীক্ষ্ণ আর্তনাদের বদলে ভোঁতা গোঙানি প্রতিধ্বনি তুলল নিস্তব্ধ রাতের বাতাসে।

ভাঁজ করা হাঁটু সিধে করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটায় কোন জড়তা বা বিরতি নেই, একই ছন্দ আর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হেঁটে এল রানা শিফটা আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলোর সামনে। ঝুঁকল ও, তুলে নিল একটা অটোমেটিক পিস্তল, সেভেন এম এম বেরেটা।

চকচকে লেদার হোলস্টারে রয়েছে ওটা, ফ্ল্যাপ খুলে অস্ত্রটা বের করল, হোলস্টার আর ওয়েস্ট বেল্ট ফেলে দিল। পিস্তলের লোড করা ম্যাগাজিন চেক করল ও, তালুর এক ধাক্কায় আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিল সেটা, স্লাইড টেনে ব্রিচে একটা রাউন্ড ভরল, সেফটি ক্যাচ ঠেলে দিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরল পিস্তলটা।

কারও দিকে একটিবারও না তাকিয়ে শান্ত, দৃঢ় পায়ে ঘুরল রানা, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল গালা ক্যাম্পের দিকে। চোখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। এখন আর ওকে দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মাইকেল। 'অনেকদিন আগেই ওকে আমি বলেছি যে ভাবাবেগ জিনিসটা গতযুগের বিলাসিতা–এই যুগে অত্যন্ত খরচ আর ঝুঁকিবহুল, বিশেষ করে এই জায়গায়। ভাবাবেগ আর বোকামি, দুটো একই জিনিস, যে-কোন একটা যদি তোমার ওপর ভর করে, ধরে নিতে পারো তুমি খুন হয়ে গেছ,' নিচু গলায় ফিসফিস করে কথাগুলো বলল মাইকেল, ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে ছাইটুকু পরীক্ষা করল।

'ওখানে একা গেলে গালারা ওকে মেরে ফেলবে,' বাহুল্যবর্জিত ভাষা আর সুরে স্রেফ বাস্তব পরিস্থিতিটার বর্ণনা দিল বানু। 'রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছে ওরা, লুফে নেবে রানাকে।'

'আরে ধ্যাত্, তুমি শুধু শুধু রঙ চড়াচ্ছ,' দ্বিমত পোষণ করল মাইকেল। যতোটা সিরিয়াস ভাবছ আসলে ততোটা নয়।'

'তুমি গালাদের চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। সিরিয়াস নয়? অন্য কোন পরিস্থিতি হলে তোমার অজ্ঞতা দেখে হাসতাম আমি।' ঝট্ করে অ্যানির দিকে ফিরল বানু। 'রানাকে তা হলে তুমি ওদের ক্যাম্পে যেতে দিচ্ছ? কোথায় যাচ্ছে ও, কাদের বাঁচাতে চায়,

ভেবে দেখেছ? ইটালিয়ান বন্দীরা আমাদের শত্রু।'

দুই যুবতী এক মুহূর্তে পরস্পরের চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। প্রথমে নড়ে উঠল অ্যানি, এক লাফে খাড়া হলো সে, ছুটল রানার পথ ধরে, তার নীল লিনেন পায়ের চারধারে ফুলে উঠল বাতাসে, অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা আলোড়িত সোনালি চুলে তরল তামার একটা ভাব এনে দিল।

গালাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে রানার নাগাল পেল অ্যানি, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর পাশে চলে এল। রানা এক পা ফেলে, সমান তাল বজায় রেখে ওর পাশে থাকবার জন্য অ্যানিকে ফেলতে হলো দুই পা।

'ফিরে যাও,' মৃদুসুরে বলল রানা।

জবাব না দিয়ে ওর পাশেই থাকল অ্যানি, হন হন করে হেঁটে আসায় হাঁপাচ্ছে।

'যা বলছি শোনো।'

'না, আমি তোমার সাথে যাব।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সবেগে অ্যানির দিকে ফিরল। অ্যানিও চেহারায় জেদ নিয়ে দৃঢ়ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করল, কাঁধ দুটো উঁচু করে কাত করল পিছন দিকে, এমন টান টান করল পিঠ যে লম্বায় খানিকটা বেড়ে গিয়ে রানার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছুল তার মাথা।

'আমার কথা শোনো...,' রানার চেহারায় কাঠিন্য।

'তোমাকে আমি একা ওখানে যেতে দেব না, ব্যস!' উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল অ্যানি, তার চেহারা আর চোখ দেখে রানার মনে হলো, যে-কোন পরিণতির জন্য তৈরি সে।

রাগে কেঁপে উঠল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল ও। অ্যানির এই গোঁয়ার্তুমি একদম সহ্য

করতে পারছে না। ‘এই শেষবার বলছি, ফিরে যাও…।’

‘না গেলে কী করবে? মারবে আমাকে? মারো!’ বেসুরো গলায় আহ্বান জানাল অ্যানি। ‘যাই করো, তোমার সাথে যাব আমি।’

‘মাথাটা ঠাণ্ডা করো,’ হঠাৎ নরম হলো রানা। ‘বোঝার চেষ্টা করো…।’ আর ঠিক তখনই রাতের নিস্তব্ধতা চিরে আবার সেই চিৎকার ভেসে এল ওদের কানে।

ফোঁপানোর আওয়াজ, ভোঁতা আর তরল, তারই সঙ্গে চারদিক মুখর হয়ে উঠল শতকণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে। নির্দয় একদল শিকারী মানুষ রক্ততৃষ্ণায় গর্জে উঠল।

‘ওরা তোমাকে পেলে কী করবে আন্দাজ করতে পারো?’ শব্দের উৎসের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে রানা; চোখ জোড়া ক্লান্ত, ঠাণ্ডা।

‘তুমি গেলে আমিও যাচ্ছি,’ অ্যানি অটল। যুক্তি বা ভীতি, কোনটাই তার উপর প্রভাব ফেলছে না।

আর কিছু না বলে নিজের পথে হাঁটা ধরল রানা। গালা ক্যাম্পের মাথার উপর গাছপালার শাখা-প্রশাখা অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভায় আলোকিত হয়ে আছে, উঁচু গির্জার ছাদের মত লাগছে দেখতে।

সেন্ট্রিদের কোথাও দেখা গেল না, সার সার বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর সামনে দিয়ে হন হন করে এগোল ওরা কারও চোখে ধরা না পড়েই। ব্যস্ত হাতে খাড়া করা হয়েছে অসংখ্য কুঁড়েঘর আর তাঁবু, সারিগুলোর মাঝখানে সরু গলি, তারই একটা ধরে রানার পিছু পিছু এগোল অ্যানি। ভয় করছে তার, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়ায় একবিন্দু অনুতপ্ত নয়।

গলির মাথা থেকে হঠাৎ ক্যাম্পের একেবারে মাঝখানে বেরিয়ে এল ওরা। বিশাল জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে, যতদূর দৃষ্টি যায়

উপচে পড়ছে গালাদের বৃত্তাকার ভিড়—আগুনের আভায় কুৎসিত কদাকার চেহারাগুলো নগ্ন উত্তেজনা আর লোভে চকচক করছে। হাভানায় চাক্ষুষ করা একটা মোরগ লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে গেল রানার, রক্তদর্শনের নেশায় দর্শকরা এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল যে নিজেদের হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেও ক্ষান্ত হয়নি, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার না করে পরস্পরকে ছুরি মারতে শুরু করে দেয়।

হিংস্র জন্তুর মত গর্জে উঠছে গালারা একযোগে।

'ওই, ওই লোকটা নূর আয়াঙ,' ফিসফিস করল অ্যানি, রানার আস্তিন ধরে মৃদু টান দিল।

ফাঁকা, গোলাকার জায়গাটার দিকে চোখ ফেরাল রানা। একধারে কার্পেটের উপর কয়েকটা গদি ফেলা হয়েছে, সেগুলোর উপর বসে রয়েছে নূর আয়াঙ গালা। দশ কি আরও বেশি উজ্জ্বল রঙের ডোরা কাটা একটা শাল তার কাঁধ আর মাথায় জড়ানো, মসৃণ নরম মুখ ঢাকা পড়ে আছে তারই ছায়ায়, আগুনের প্রতিফলন নিয়ে জ্বলতে থাকা চোখ দুটোয় স্থির ও ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি।

তার চর্বিবহুল মোটা হাতের রঙ হাতির দাঁতের মত, শক্ত মুঠোর আকৃতি নিয়ে একটা হাত পড়ে আছে কোলের উপর, অপর হাতের আঙুলগুলো পাশে বসা মেয়েলোকটার কোমর আর পেটে কিলবিল করছে। প্রতিটি আঙুলের যেন নিজস্ব প্রাণ আছে, পেট বেয়ে পোকার মত চরছে; ম্লান আর অশ্লীল, বেঢপ আকৃতি নিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে থাকা স্তনের গায়ে চাপ দিল।

আগুনের সামনে, বৃত্তের দূরপ্রান্তে, খোলা মাঠের কিনারায়, তিনজন ইটালিয়ান বন্দী ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘামে

আর আতংকে চকচকে সাদা তাদের মুখ, প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঢোলা, সুতী কাপড়ের পা'জামা পরে আছে তারা, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ খালি, উদোম গায়ে অসংখ্য কাটাকুটির তাজা দাগ। তিন জোড়া নগ্ন পা ফুলে উঠেছে, লাল রক্তের মোটা ধারা গড়িয়ে নামছে পায়ের পাতায়। পাতাগুলোর কিনারা ক্ষতবিক্ষত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, উঁচু-নিচু দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে আনা হয়েছে তাদেরকে, কিংবা হয়তো ঘোড়ার পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনা হয়েছে, ঘোড়ার সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে না পেরে ঘন ঘন আছাড় খেয়েছে লোকগুলো। তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে খোলা মঞ্চের মাঝখানে—ওখানে নারকীয় একটা দৃশ্যে অভিনয় করছে এক মেয়েলোক।

যুবতী মেয়েলোকটাকে চিনতে পারল অ্যানি, সারডি শহরের রেস্ট হাউসে নূর আয়াঙের পাশে তাকে বসে থাকতে দেখেছে সে, গালা গোত্রপ্রধানের একজন ভালোবাসার পাত্রী—বানুর ভাষায়, গাভী। এই মুহূর্তে মাটিতে ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, বিশাল দুই স্তন ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে, নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত।

তার সূর্যমুখী ধাঁচের মুখে ধর্মীয় আবেগ আর মোহ প্রায় পবিত্র একটা আলো ফুটিয়ে তুলেছে। পটলচেরা কালো চোখে নিষ্ঠা, ত্যাগ, একাগ্রতা আর আত্মনিবেদনের গভীর, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, মৃদু হাঁপাচ্ছে সে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মেয়েদের অথবা কসাইদের মত, তার আলখেল্লার আস্তিন কনুই পর্যন্ত গুটানো, কব্জি পর্যন্ত রক্তে ভিজে আছে হাত। একজন দক্ষ সার্জেন-এর মতই বাঁকা ডগাসহ ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আছে সে, ছোরার রূপালি ফলা আগুনের আভায় লালচে আর ম্লান লাগল দেখতে।

যে জিনিসটাকে নিয়ে ব্যস্ত সে, এখন আর সেটাকে প্রাণী বলা চলে না, যদিও এখনও মোচড় খাচ্ছে সেটা, বাঁধন ছিঁড়বার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছে, নিঃশ্বাসও ফেলছে, কিন্তু বাধা দিতে বা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এখনও ফোঁপাচ্ছে সে, যদিও আওয়াজটা এখন আর মানুষের বলে চিনবার কোন উপায় নেই।

ছোরার কোপ আর গভীরভাবে টানা আঁচড়ে মানুষের পরিচিত আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে সে। বৃত্তের কিনারায় উপচে পড়া ভিড় থেকে জোরাল দাবি উঠল, যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েক হাজার হায়েনা। ব্যস্ততার ভান করে নিজের কাজে আরও মনোযোগ দিল মেয়েলোকটা, জিনিসটার বিস্ফারিত তলপেটের গোড়া থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘন ঘন ছোরা চালিয়ে কী যেন একটা কেটে বের করে আনবার চেষ্টা করছে সে। রক্তে ভেজা আঙুল পিচ্ছিল হয়ে আছে, মুঠো থেকে ছোরার বাঁট বারবার পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। খানিকটা করে কাটছে সে, টানা-হ্যাঁচড়া করছে–মৃত্যুপথযাত্রী ফুঁপিয়ে উঠল আবার, তবে আওয়াজটা অস্পষ্ট। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হলো মেয়েলোকটা, ছোরার ফলা দিয়ে সদ্য কেটে আনা জিনিসটা মাথার উপর তুলে ধরল সে দর্শকদের দেখানোর জন্য।

বৃত্তের কিনারা ধরে একটা চক্কর দিল সে, একটা হাত মাথার উপর, আঙুলের ভিতর সদ্য কেটে আনা জিনিসটা। চক্কর দেওয়ার সময় খিলখিল করে হাসল সে, নাচতে নাচতে এগোল, রক্তের কয়েকটা ধারা হাত বেয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দিল কাঁধ আর স্তন, পাঁজরের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেল কোমরের নীচে।

‘গায়ের সাথে সেঁটে থাকো,’ নরম গলায় বললো রানা।

আশ্চর্য! ওর এই গলার স্বর আগে কখনও শোনেনি অ্যানি। মেয়েলোকটার উপর থেকে সে তার আতংকিত দৃষ্টি ছিঁড়ে আনল, তাকাল রানার দিকে।

রানার মুখ যেন নিষ্প্রাণ পাথুরে একটা অবয়ব। চোয়াল দুটো কঠিন, চোখ জ্বলছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল রানা, হাতটা নামিয়ে ঊরুর পাশে সমান করে রাখল। ওর হাঁটবার মধ্যে ব্যস্ততার কোন ভাব ফুটল না, তবে দৃঢ়তা ফুটে উঠল প্রতিটি পদক্ষেপে, কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিল সামনের বাধা প্রতিটি লোককে। জোরাল ধাক্কা খেয়ে ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেল, আবার জোড়া লাগবার আগে সেই ফাঁক গলে প্রতি মুহূর্তে ওর পিছনে থাকবার সুযোগ হলো অ্যানির।

কী ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে অ্যানির কোন ধারণা নেই। কয়েক হাজার হিংস্র আর উত্তেজিত গালার বিরুদ্ধে একা রানা কী করতে পারবে, তাও তার অজানা। তবে এ-সব সমস্যা বা বিপদের কথা তার মাথায় ঢুকলেও তেমন একটা বিচলিত বোধ করল না। অ্যানি উইসপার এই মুহূর্তে শুধু মাসুদ রানার কথা ভাবছে। শ্রদ্ধেয় নমস্য পুরুষ জীবনে কম দেখেনি সে, তাঁদের সঙ্গে রানার তুলনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, কারও সঙ্গে কোন দিক থেকেই রানাকে মেলানো যাচ্ছে না। ওর এই দুর্দমনীয় সাহস, এর কী কোন তুলনা হয়? এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেওয়া, ঠাণ্ডা মাথায় ইতিকর্তব্য স্থির করা, কারও সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কর্তব্যের ডাকে একাই এগিয়ে যাওয়া, এ-সব ক'জন মানুষের চরিত্রে দেখেছে সে?

প্রতিটি গালার অচ্ছেদ্য মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে নৃত্যরত মেয়েলোকটা, এই মুহূর্তে ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হলেও বোধহয় তাদের হুঁশ ফিরবে না, ওর উপস্থিতি কেউ টের পাবার আগেই নূর

আয়াঙ গালার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

মোটা, নরম বাঁ হাতের উপরের দিকটা ধরল ও, তুলতুলে চর্বি আর মাংসের ভিতর ডেবে গেল আঙুলগুলো, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করাল তাকে, ভারসাম্য কেড়ে নিয়ে প্রায় ঝুলিয়ে রাখল হাতের উপর, ঘুরিয়ে নিজের দিকে মুখ ফেরাল, অপর হাতে ধরা বেরেটার মাজল ঠেকাল উপরের ঠোঁটে, ঠিক চওড়া নাকের কদর্য ফুটোর নীচে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, রানার আগুন ঝরা দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল নূর আয়াঙ, পরমুহূর্তে মাংসের ভিতর নখ ঢুকে পড়ায় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল, ইস্পাতের ঠাণ্ডা মাজল ঠোঁটের উপর ঘষা খাওয়ায় ভয়ে কাঁপ ধরে গেল শরীরে।

অল্প দু'চারটে অ্যামহারিক শব্দ শিখেছে রানা আব্বাসের কাছে, মনে মনে সেগুলো গুছিয়ে নিল। 'বন্দীরা,' হিস হিস করে বললো ও, 'আমার ভাগে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নূর আয়াঙ, যেন ওর কথা শুনতে পায়নি, তারপর একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে। গালাদের সবচেয়ে কাছের ভিড়টা দুলে উঠল, যেন বাধা দিতে আসছে।

নূর আয়াঙের ঠোঁটে পিস্তলের মাজল চেপে ধরে ঘোরাল রানা, দাঁত আর ইস্পাতের মাঝখানে থেঁতলে গেল ঠোঁট, চামড়া ছিঁড়ে মাজলটা ভিতরে ঢুকল খানিক, রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

'মৃত্যু।' একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল রানা। ভোঁতা গলায় শিষ্য যোদ্ধাদের বারণ করল নূর আয়াঙ। চেহারায় আক্রোশ নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেল তারা, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে, হিংস্র দৃষ্টি রানার উপর স্থির হয়ে আছে, ওর যে-কোন দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

রক্ত ভেজা হাত নিয়ে মেয়েলোকটা আবার তার শিকারের সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসল, বিশাল জনসমুদ্রে নেমে এল প্রত্যাশায় ভরাট অটুট নিস্তব্ধতা। চারদিকে ভিড় নিরেট নিষ্প্রাণ পাঁচিল, এক চুল নড়লো না কেউ, সবাই রানা আর নূর আয়াঙের দিকে তাকিয়ে আছে। জমাট নিস্তব্ধতার মাঝখানে, আগুনের পাশ থেকে ভাঙাচোরা রক্তাক্ত জিনিসটা আবার ককিয়ে উঠল—ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলা ধরনের একটা দীর্ঘ আওয়াজ, রানার স্নায়ুতে যেন গরম লোহার ছ্যাঁকা দিল, চেহারা হয়ে উঠল ক্ষ্যাপার মত।

'তোমার লোকদের বলো,' নির্দেশ দিল রানা, নিজের কানেই কর্কশ শোনাল।

কেঁপে গেল নূর আয়াঙের গলা, যেন একটা মেয়ে চিৎকার করল। অর্ধনগ্ন বন্দীদের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নূর আয়াঙের ঠোঁট থেকে মাজল তুলে নিল রানা, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিল নাকের ফুটোয়, দুই ফুটোর মাঝখানের নরম দেয়াল ছিঁড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরুল। নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করল রানা। অনিচ্ছার ভাব নিয়ে প্রহরীরা বন্দী তিনজনকে ঠেলে দিল সামনের দিকে। তিনজনই ঠক ঠক করে কাঁপছে।

'ওর ড্যাগারটা নাও,' শান্ত গলায় অ্যানিকে বলল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নূর আয়াঙের চোখে স্থির হয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে, একটু একটু করে সরে এল অ্যানি, নূর আয়াঙের পাশে থামল। চেহারা দেখে মনে হলো নূর আয়াঙ নড়ে বা ধমকে উঠলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে।

একটা হাত তুলে রানার কাঁধে রাখল অ্যানি, খামচে ধরল, শুধু এই স্পর্শটুকুই সমস্ত আতংক দূর করে দিল তার মন থেকে। অপর হাত দিয়ে ড্যাগারের কারুকাজ করা হাতলটা ধরল সে,

বিশাল ভুঁড়ির গা থেকে আস্তে করে টেনে নিল সেটা। কাঠের হাতল, হাতলের মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার উপর অনেকগুলো দামী পাথর। জিনিসটা সৌখিন হলেও, ফলাটা চকচকে আর ধারাল।

'ওদের মুক্ত করো,' বলল রানা। 'রশি কেটে দাও।'

রানার পাশ থেকে সরে যেতে হলো অ্যানিকে। বিপজ্জনক মুহূর্ত, পিস্তল ব্যারেলের উপর চাপ বাড়িয়ে থেঁতলানো ঠোঁট থেকে আরও খানিকটা রক্ত ঝরাল রানা। নূর আয়াঙ দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটা একপাশে ও পিছন দিকে অসম্ভব ভঙ্গিতে কাত করে, আর বুঝি এক চুল কাত হলেই ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। দাঁত বের করে মুখ ভেঙচে থাকবার ভঙ্গিটাও যেন স্থায়ী ও স্থির, কোটরের ভিতর চোখের মণি অনবরত ঘুরছে, মাঝেমধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চোখ জোড়া নিষ্কলঙ্ক সাদা হয়ে উঠল, গাল বেয়ে নেমে এল পানির মোটা ধারা, আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে গোলাপের হলুদ পাপড়িতে জমে থাকা শিশিরের মত।

বন্দীদের কব্জি আর কনুই থেকে রশির শক্ত বাঁধন কেটে দিল অ্যানি, হাত ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল তারা, তিনজন পরস্পরের গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে আছে। প্রত্যেকের ম্লান মুখে ক্ষতচিহ্ন, ঘাম আর শুকনো রক্ত–চেহারায় দিশেহারা ভাব, চোখে নগ্ন আতংক।

ত্রস্ত পায়ে রানার পাশে ফিরে এল অ্যানি। মিথ্যে সান্ত্বনা কিনা জানা নেই, তবে রানার গা ঘেঁষে থাকতে পারলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে ভাবতে পারছে সে।

নূর আয়াঙকে হাঁটতে বাধ্য করল রানা, প্রতিটি মুহূর্ত সচেতন প্রয়াসের সঙ্গে রানার পাশে আঠার মত লেগে থাকল অ্যানি। নূর

আয়াঙকে খোলা মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছে রানা–অত্যন্ত ধীরগতিতে, প্রতিবার এক পা করে, প্রতি পদক্ষেপের পর কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল। উপচে পড়া ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে রানার।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে জিনিসটাকে, নরম ও নোংরা পদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বেদনা প্রকাশের ভাষা আর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়ে মূক ও বধির বানানো হয়েছে তাকে। বেঁচে থাকবার আকুতি বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার অক্ষমতা, কারণটা যাই হোক, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবার পরও বেঁচে আছে সে–অল্পস্বল্প নড়ছে এখনও, আক্ষেপের সুর নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

নূর আয়াঙের উল্টো দিকে সামান্য ঝুঁকল রানা, তবে ধরে থাকল তাকে। অ্যানি দেখল, রানার ঠাণ্ডা পাষাণ চেহারায় করুণা আর সমবেদনার ছায়া ফুটল মুহূর্তের জন্য। নূর আয়াঙের মুখ থেকে পিস্তল নামাল রানা, তার আগে পর্যন্ত অ্যানি বোঝেনি কী করতে চাইছে ও। পিস্তল ধরা হাতটা যতটুকু পারা যায় লম্বা করল রানা।

তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিস্তল। মাংসপিণ্ডের ডগায় শুধু মাথা আর কপালটা চেনা যায়, কপালের মাঝখানে ঢুকল বুলেটটা। ভুরুর উপর চকচকে হাড়ের গায়ে নীলচে একটা গর্ত তৈরি হলো। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হাঁসের ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল চোখের পাতা, ধনুকের মত বেঁকে থাকা মাংসপিণ্ড চুপসে গেল, শিথিল হলো। ছেঁড়া-ফাড়া গলার ভিতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুল, অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকবার মত। তারপর সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেল সে।

আট

লোকটাকে মুক্তি দিল রানা, যদিও তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না, হাতের পিস্তলটা আবার নূর আয়াঙের ঠোঁটে ঠেকাল, আঙুলের চাপ বাড়িয়ে তার বাহুর মাংসে সেঁধিয়ে দিল নখগুলো, ঘুরতে বাধ্য করল তাকে, হাতটা আরও মুচড়ে দিয়ে ধীরগতিতে হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের নিরেট ভিড়টা দুলে উঠল, পিছু নেওয়ার জন্য তৈরি।

বন্দীদের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, সংকেত দিয়ে এগোতে বলল। সামনে থাকল তারা, ধীর পায়ে এগোল, আগের মতই পরস্পরের গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। ওদের পিছনে থাকল অ্যানি, নিরাপত্তার অনুভূতিটাকে ধরে রাখবার জন্য একটা হাত পিছন দিকে লম্বা করা, রানার কাঁধের উপর। নূর আয়াঙের হাত এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে রানা যে তার গোটা শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে, ইচ্ছে করলেই ভারসাম্য ফিরে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—আঙুলের চাপ আর হাতের ধাক্কা প্রয়োজনে কমিয়ে বা বাড়িয়ে তার হাঁটবার গতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ও, এক পা এক পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে।

রানা জানে, তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না, উচিত হবে না দুর্বলতা প্রকাশ করা। ওদের কৌশল বা শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই বলেই এখনও ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না গালারা। হিংস্র হায়েনাগুলোকে দমিয়ে রেখেছে গোত্রপ্রধানের নির্দেশ, এরপর কী ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিন্তু

একবার মরিয়া হয়ে উঠলে কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। পরিণতি সম্পর্কেও জানে রানা, জেনে শুনেই ঝুঁকিটা নিয়েছে ও। ওদের মৃত্যু হবে মহা বিশৃংখলার ভিতর– চারদিক থেকে ধেয়ে আসবে ভিড়গুলো, লোমশ কয়েকশো হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলবে ওদের হাত-পা, চুলসহ খুলে নেবে খুলির চামড়া, আঙুল ঢুকিয়ে বের করবে চোখ, বুকে পা দিয়ে মট মট করে ভাঙবে পাঁজর, টেনে ছিঁড়ে নেবে জিভ...।

পিছনের ভিড়টা সচল, তবে মধ্যবর্তী দূরত্ব কমল না। এক পা এক পা করে এগোল রানা, তাল বজায় রেখে ওর সঙ্গে এগোল নূর আয়াঙ। একই ছন্দে ওর সামনে অ্যানি, অ্যানির সামনে বন্দীরাও হাঁটছে। খানিক পরপরই দীর্ঘদেহী গালারা ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে। প্রতিবার নূর আয়াঙের নরম চামড়ায় পিস্তলের মাজলটা সজোরে ঘষল রানা। গুঙিয়ে উঠল লোকটা, অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ফাঁক হয়ে গেল সামনের ভিড়, কদাকার যোদ্ধারা ঠিক ততটুকু সরে গেল যতটুকু ওদের এগোবার জন্য দরকার, তারপর পিছন থেকে অনুসরণ করল। যারা পিছু নিল তাদের সামনের সারিতে রয়েছে সর্দার আর মাতবররা। এত কাছাকাছি থাকল লোকগুলো যে হাত বাড়ালেই তারা তাদের গোত্রপ্রধানকে ছুঁতে পারবে।

কতক্ষণ সময় লাগল বলতে পারবে না রানা, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেল সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভিতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, রানার ইচ্ছে হলো অ্যানি আর বন্দীদের ছুটতে বলবে, নূর আয়াঙকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করল ও, কারণ জানে ওদের সঙ্গে তা হলে গালারাও দৌড় দেবে–জনসমুদ্রে চাপা

পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাঢ়, ধরে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

'ওদের নিয়ে কী করব আমরা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল অ্যানি। 'পিস্তলের মুখে এই লোকটাকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না।'

রানা জবাব দিল না। পিছনে গা ঘেঁষে থাকা গালাদের ওর অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর শুনতে দিতে চায় না। আবার এ-ও চায় না যে অ্যানির আচরণে আতংক প্রকাশ পাক।

তবে কথাটা অ্যানি মিথ্যে বলেনি, অনুসরণরত গালাদের আচরণে বেপরোয়া একটা ভাব রানাও অনুভব করতে পারছে, একঘেয়ে অনুসরণে তারা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, প্রতিশোধপরায়ণ জনসমুদ্রে মাথাচাড়া দিচ্ছে আত্মহননের অদম্য স্পৃহা। আহ্বানের সুর সম্বলিত কয়েকটা গর্জন শোনা গেল, পিছন থেকে সামনের সারির যোদ্ধাদের প্ররোচিত করা হলো—ছিঁড়ে ফেলো, মেরে ফেলো, পিষে ফেলো! ঝাঁপিয়ে পড়ো, উদ্ধার করো গোত্রপ্রধানকে!

'গাড়ি!' চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই অনুপ্রাণিত বোধ করল রানা। 'ওদেরকে গাড়িতে তুলবে তুমি।'

'তারপর?'

'এক এক করে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আগে ওদেরকে গাড়িতে তোলো।'

কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে এখনও উঠছে ওরা, আগের চেয়ে আরও কাছে সরে এসেছে গালারা। আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন ধাক্কা দিল ওকে, বাজিয়ে দেখল, সেঁটে থাকল গায়ের সঙ্গে, চাপ বাড়াল। রানার গতি সাবলীল ও বিরতিহীন, ঢিল করে

দিল পেশী, সিকি পাক ঘুরল। এমনই ক্ষিপ্র আর বিদ্যুৎ গতি যে ঘুসিটা গালা সর্দার এড়াতে পারল না। যদি দেখতেও পেত, চারপাশে সঙ্গী-সাথীদের নিরেট ভিড়ের চাপ থাকায় সরে যাবার উপায় ছিল না তার।

কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতটাকে দা-এর মত ব্যবহার করল রানা, কোপ মারবার ভঙ্গিতে, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা লাগল লোকটার মুখে, উপরের মাড়ি থেকে নিখুঁতভাবে দাবিয়ে দিল সামনের চারটে দাঁত, ধাক্কাটা সরাসরি সামনের সাইন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে ব্রেনে গিয়ে আঘাত করল। কোন শব্দ না করে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা, পরমুহূর্তে অসংখ্য পায়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল, অনুসরণরত গালারা হোঁচট খেলো, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। তবে আগের মত আর ওদের গা ঘেঁষে থাকল না তারা। পিস্তলটা এবার নূর আয়াঙের মাথার পাশে ফিরিয়ে এনেছে রানা। নূর আয়াঙের মোচড়ানো হাতে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে, গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুবার আগেই শুরু থেকে শেষপর্যন্ত ঘটে গেছে ঘটনাটা।

তার হাতটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল রানা, সামান্য চাপ বাড়িয়ে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করল, নিতম্বে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে আরও দ্রুত হাঁটবার নিঃশব্দ তাগাদা দিল।

ওদের সামনে, গাড়িগুলোর কুঁজ আকৃতির মাথা দেখতে পেল রানা, চাঁদের আলোয় ভাসছে, ছাই চাপা আগুনের গায়ে ফুটে আছে ইস্পাতের ভোঁতা কিনারাসহ কাঠামোগুলো।

'অ্যানি, নিতম্বিনীকে ব্যবহার করব আমরা। চঞ্চলা বাদ, কারণ প্রথমবারই স্টার্ট না নিলে বিপদ হবে,' রানার দাঁতের ফাঁক গলে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। 'ড্রাইভরের হ্যাচ গলে নামতে হবে তোমাকে। আর সব কিছু ভুলে যাও, তোমার একমাত্র

কাজ হুইলের পিছনে বসা।'

'কিন্তু বন্দীদের কী হবে?'

'যা বলা হয়েছে তাই করো, প্রশ্ন কোরো না।' ওদের কাছ থেকে গাড়িগুলো আর মাত্র বিশ ফুট দূরে। 'তাড়াতড়ি, অ্যানি, যত তাড়াতাড়ি পারো।'

ছুটতে চাইলেও, পারল না অ্যানি, হন হন করে এগোল। গালারা কেউ বাধা দেওয়ার আগেই নিতম্বিনীর সবচেয়ে উঁচু পাশটায় পৌঁছে গেল সে, আঙটা ধরে এক লাফে উঠে পড়ল গাড়ির মাথায়।

'বন্ধ করো!' চিৎকার করল রানা, কর্কশ ধাতব আওয়াজের সঙ্গে হ্যাচটা বন্ধ হতেই স্বস্তির পরশ অনুভব করল ও। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ একপাল নেকড়ের মত গর্জে উঠল গালারা, পিলপিল করে সামনে বাড়ল তারা, পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়তে চেষ্টা করল, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল গাড়িটাকে।

আকাশের দিকে একটা গুলি করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে একটা নির্দেশ দিল নূর আয়াঙ। সামান্য পিছিয়ে গেল গালারা, থেমে গেল তাদের চাপা গর্জন, চারদিকে নেমে এল উত্তেজনায় টান টান নিস্তব্ধতা।

'অ্যানি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' ডাকল রানা, বন্দীদের নিজের নাগালের মধ্যে আগলে রেখেছে ও, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নিতম্বিনীর দিকে।

সাড়া দিল অ্যানি, স্টীল প্লেটের পিছন থেকে তার কণ্ঠস্বর ভোঁতা শোনাল, ভেসে এল যেন অনেক দূর থেকে।

'পিছনের দরজা,' জরুরী সুরে বলল রানা, 'খুলবে, কিন্তু আমি

বলার পর।' ধাক্কা দিয়ে বন্দীদের ঘুরিয়ে পিছনের দরজার সামনে নিয়ে আসছে ও। বন্দীরা আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাগালের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পেয়ে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খেতে লাগল, দিশেহারা বোধটুকু কাটিয়ে উঠতে পারল না, বোকার মত পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাল। ওদের পিঠে ঘন ঘন ধাক্কা দিতে হলো রানাকে।

'খোলো এবার!' গলার রগ ফুলে উঠল রানার, মুঠো করা হাত হাতুড়ির মত আঘাত করল দরজার গায়ে। ভুলটা বুঝতে পেরে মুঠোর বদলে পিস্তল ঠুকল ইস্পাতের গায়ে।

ঝনাৎ শব্দে খুলে গেল দরজা, স্যাঁৎ করে ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ানো ছোট্ট ভিড়টার গায়ে ধাক্কা খেলো কবাট।

'ধুস শালা!' একটা কবাটের গায়ে কাঁধ ঠেকাল রানা, ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুলল সেটা, কবাটের আকস্মিক আঘাতে ছিটকে পড়ল একেবারে কাছে এসে পড়া দু'জন গালা। দেহভঙ্গিমার দ্রুতগতি পরিবর্তনে রানা কোন বিরতি নিল না, খপ্ করে ধরেই বন্দীদের একজনকে ছুঁড়ে দিল গাড়ির অন্ধকার গহ্বরে, বাকি দু'জন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে দেখে তাদের পিঠের উপর বন্ধ করে দিল দরজা, দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে গালাদের দিকে ফিরল, শুনতে পেল খোপে ঢুকে আটকে গেল বোল্টটা।

কদাকার চেহারাগুলোয় নগ্ন ঘৃণা ফুটে রয়েছে, চোখে আক্রোশ আর খুনের নেশা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে গালারা, পিঠে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ নিয়ে সামনের সারির লোকগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে তর্জন-গর্জন শুরু হলো। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, রানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। মুখের বেশিরভাগ গ্রাস কেড়ে নেওয়া

হয়েছে, এই শেষ শিকারটাকে তারা পালাতে দেবে না।

নিজেকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগল রানার, মনে হলো কয়েক মাইল দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে, পাঁজরের খাঁচায় অনুভব করতে পারছে হৃৎপিণ্ডের অবিরাম গুঁতো, তবে নূর আয়াঙকে ছাড়েনি ও, তার বাহুর নরম মাংস ছেড়ে দিলেও মুঠোর ভিতর ধরে রেখেছে ঘন কালো চুলের গোছা। চুলগুলো আঙুলে পেঁচিয়ে নিয়ে মাথার পিছনের খুলির চামড়ায় টান দিল ও, বাঁকা হয়ে নিজের লোকদের দিকে ঘুরে গেল নূর আয়াঙের মুখ। অপর হাতের পিস্তলটা তুলল রানা গোত্রপ্রধানের কানে, ফুটোর ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করল মাজলটা।

'ওদের সাথে কথা বলো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা। 'তা না হলে পিস্তলের নলটা আরেক কান দিয়ে বেরুবে।'

শব্দগুলো যদি নাও বুঝে থাকে, সুরটা বুঝল নূর আয়াঙ, হড়বড় করে অ্যামহারিক ভাষায় কথা বলল সে, থামবার আগেই সামনের সারির যোদ্ধারা এক পা পিছিয়ে গেল। নিতম্বিনীর খোলে পিঠ ঘষে, প্রতি মুহূর্তে এক ইঞ্চি করে সরল রানা, অসহায় নূর আয়াঙের চুল ধরে তাকে নিজের সামনে আড়াল হিসাবে রাখল।

ওরা সরল, ওদের সঙ্গে ভিড়টাও সরল, গালারা দৃষ্টি আর নাগালের মধ্যে ধরে রাখতে চাইছে ওদেরকে। চাঁদের আলোয় গালাদের মুখে চকচক করছে ঘাম, চেহারা নিষ্ঠুর আর ক্রোধোন্মত্ত, খুনের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়বার চরম মুহূর্তে পৌঁছে ইতস্তত করছে। অন্ধকার থেকে বাঘের মত গর্জে উঠল একজন গালা, গমগমে কর্তৃত্বের সুর, মার মার কাট কাট ধ্বনি উঠল ভিড়ের চারদিক থেকে–সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠল নূর আয়াঙের আর্তচিৎকার। হাঁটু দিয়ে তার কিডনিতে গুঁতো মেরেছে রানা।

আরও আস্তে মারতে চেয়েছিল রানা, চায়নি নূর আয়াঙ ব্যথা পেয়ে আর্তনাদ করে উঠুক। গোত্রপ্রধানের কষ্ট মাত্রা ছাড়াচ্ছে দেখলে গালারা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

ভিড়ের ভিতর চারদিক ঠ্যালা-গুঁতোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পিছনের সারিগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রানা, গলা শুকিয়ে গেছে। বুঝতে পারল, আর সময় নেই।

'অ্যানি, স্টার্ট দিতে পারবে?' ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

অ্যানির অস্পষ্ট গলা ভেসে এল, 'রেডি টু স্টার্ট।'

পায়ের পিছনে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের স্পর্শ পেল রানা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত শোরগোল ম্লান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের রক্ত হিম করা একটা আওয়াজ শোনা গেল। চিৎকারটা শেষ দিকে লুলুউউ-লু-লুউউ উলুধ্বনির সুরে প্রলম্বিত হলো, হঠাৎ নেমে আসা নিস্তব্ধতার ভিতর রক্তপিপাসায় কাতর আধিভৌতিক করুণ আর্তির মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আফ্রিকান যুবকদের যুদ্ধপ্রবণ হৃদয়ে ছলকে উঠল রক্ত, এই ব্যাকুল আহবান চাবুকের মত বাড়ি মারল উত্তেজনায় উত্তপ্ত চামড়ায়, গুঙিয়ে উঠল জনসমুদ্র, পাল্টা জবাবে চারদিক থেকে ভেসে এল রণহুংকার।

'মাসুদ রানা, দেখতে চাই কী করো তুমি! ওরা আসছে!' ভাবল রানা, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নূর আয়াঙকে ধাক্কা দিল, ফেলে দিল গালাদের গায়ের উপর। যোদ্ধাদের পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে পড়ল নূর আয়াঙ, তারা আছাড় খেলো পিছনের সারির গায়ে।

ইতিমধ্যে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরে ফেলেছে রানা। এই সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হবে জানত ও, সেজন্যই বেছে নিয়েছে

নিতম্বিনীকে, জানে লৌহমানবীদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে লক্ষ্মী। কিন্তু প্রথমবার হ্যান্ডেল ঘোরাতে নিতম্বিনীর এঞ্জিন প্রতিবাদের সুরে খক খক করে উঠল, স্টার্ট নিল না।

'প্লিজ, মাই ডার্লিং, প্লিজ!' মরিয়া হয়ে আবেদন জানাল রানা, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডেল ঘোরাতেও বিষম খেলো এঞ্জিন, খকখক করল তারপর হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে সাবলীল ছন্দে সচল থাকল। লাফ দিয়ে গাড়ির মাথায় উঠে যাবে রানা, ওর মাথার উপর খাড়া হলো একটা তরোয়াল, সবেগে নেমে এল খুলি লক্ষ্য করে।

বাতাস চিরে নেমে আসছে ফলা, আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, মাথাটা নামিয়ে নিল ঝট করে। গাড়ির খোলে লাগল তরোয়ালের ফলা, আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে। আবার তরোয়াল তুলল গালা সর্দার, মাটির উপর পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, বেরেটার ট্রিগার টানল।

মাংসে বুলেট ঢুকবার ভোঁতা শব্দটা শুনতে পেল রানা, পিছন দিকে হেলে পড়ল লোকটা, হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূন্যে ডিগবাজি খেলো তরোয়াল। আলখেল্লা পরা কুৎসিতদর্শন মূর্তিগুলো ধেয়ে এল চারদিক থেকে, চোখের পলকে ছেঁকে ধরল রানা আর নিতম্বিনীকে, জনসমুদ্র খেপে গেছে।

'ড্রাইভ, অ্যানি, ফর গডস সেক, ড্রাইভ!' আর্তনাদ করে উঠল রানা, বগলের তলা দিয়ে মুখের সামনে একটা মাথা বেরিয়ে আসছে দেখে খুলিতে ঠেকিয়ে আবার টেনে দিল ট্রিগার। কাঁধে একটা হাত পড়ল, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে নিল শার্টটা। বগলের নীচ দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা পিছন দিকে লম্বা করল রানা, আবার গুলি করল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সচল হলো নিতম্বিনী, খোল থেকে ছিটকে পড়ে গেল কয়েকজন গালা।

নিতম্বিনীর ঝাঁকিতে রানার হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তল। সে-ও ছিটকে পড়েছে। গালারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর, সারা শরীরে তাদের নির্দয় আঁচড় অনুভব করল রানা, শুরু হয়ে গেল ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। অন্ধকার আর ভিড়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা, শুধু আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ওর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে নিতম্বিনী। জানে শেষ চেষ্টা, অসুরের শক্তি নিয়ে ডাইভ দিল রানা। গাড়িটা কতদূরে পরিষ্কার ধারণা ছিল না, খোলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আবার ছিটকে পড়ল ও। গাড়ি আর থেঁতলানো শরীরের মাঝখানে দূরত্ব বাড়ল, রানা নিজেও জানে না কীসের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো ও, সন্দেহ হলো হাতের জয়েন্টগুলো খুলে গেছে কিনা। একটা আঙটা ধরে আছে রানা, নিতম্বিনী ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থ্রটলে অ্যানির পায়ের চাপ বাড়তেই থাকল, সগর্জনে ছুটল নিতম্বিনী। সামনে মানুষের নিশ্ছিদ্র পাঁচিল, ধেয়ে আসা গাড়িটাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হলো। অ্যানির চোখের সামনে ধপ ধপ করে পড়ল লোকগুলো, থ্যাচ থ্যাচ শব্দে বাড়ি খেলো গাড়ির সামনের প্লেটের সঙ্গে, রণহুংকারের বদলে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, গালারা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। ভিড়ের শেষ মাথা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল আর্মারড কার, সামনের ঢালে পড়ে আরও দ্রুত হলো গতি।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড রানাকে টেনে এনেছে নিতম্বিনী, তারপর আঙটা ছেড়ে দিয়েছে রানা, গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ে এক লাফে উঠে পড়েছে খোলের মাথায়। টারিটে হেলান দিয়ে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও, দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে বুঝতে পারল বিপদ এখনও কাটেনি।

গাড়ির কিনারা ধরে ঝুলে রয়েছে অনেকে, রানা ঘাড় ফেরাতেই সবচেয়ে কাছের লোকটা রণহুংকার ছাড়ল, বাতাসে তার আলখেল্লা ফুলে উঠেছে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে মাথাটা। খোলের কিনারা দু'হাতে ধরে টারিটে উঠে আসছে সে, ছোরার হাতলটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। তাকে আরও খানিক উঠতে দিল রানা, কিনারা ছাড়িয়ে কাঁধ দুটো উঁচু হতেই দুই পা এক করে বুকের মাঝখানে লাথি মারল, শূন্যে সিধে হলো লোকটা, পিছন দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল মাথা দিয়ে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়বার আগেই ভয়ার্ত আর্তনাদের শব্দ থেমে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা, গাড়ির মাথা অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে। হাত আর পা দিয়ে প্রতিবার একজন করে গালাকে কিনারা থেকে ফেলে দিল ও। ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামছে নিতম্বিনী, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে অ্যানি, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে ঝোপ আর গাছগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে। অবশেষে ঢাল থেকে নেমে এসে খোলা প্রান্তরে পৌঁছুল আর্মারড কার।

হ্যাচ কাভারে দমাদম ঘুসি মেরে অ্যানির দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, ধীরে ধীরে গতি কমাল সে, তারপর মৃদু একটা ঝাঁকির সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল নিতম্বিনী।

হ্যাচ খুলে উঠে এল অ্যানি, দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। আলিঙ্গনটা এড়ানোর মৃদু চেষ্টা করলেও সফল হলো না রানা, নিঃশ্বাসের শব্দ বাদ সাধতে চাইলেও উপভোগ্য নিস্তব্ধতা নেমে এল দু'জনের মাঝখানে। আনন্দঘন মুহূর্তে বন্দীদের কথা মনে ছিল না, নিতম্বিনীর পেটের ভিতর তাদের কাশি আর নড়াচড়ার শব্দ প্রায় চমকে দিল ওদেরকে।

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হলো অ্যানি, চাঁদের আলো লেগে তার

চোখ কোমল লোভে চকচক করে উঠল।

'বেচারিরা তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি। 'ওদেরকে তুমি নরক থেকে তুলে এনেছ...,' দেরি করে পৌঁছানোয় ওদের একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, কথাটা মনে পড়তেই ভাষা হারিয়ে ফেলল সে।

'তা তো বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন ওদেরকে নিয়ে কী করা হবে বলতে পারো?'

'রাসটা ক্যাম্পে নিয়ে যাই চলো, কামাল হাসান নিশ্চয়ই ন্যায্য একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। সবাই ওরা ইথিওপিয়ান আদিবাসী, ওদের নিয়ম-কানুন আমাদের মত নয়। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এটাই এখানকার রীতি, এক অর্থে ন্যায্যও বটে। শিফটারা চিরকাল কামাল হাসানকে জ্বালিয়ে মারছে, তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে তিনি সদয় ব্যবহার করবেন এটা আশা করা যায় না। ভেবে দেখো, বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে লোকগুলোকে সিংহের মুখে ঠেলে দিতে চাও কিনা।'

'ওহ্ গড, তারমানে আসলে আমরা বন্দীদের এখনও উদ্ধার করতে পারিনি?'

'তা ছাড়া,' বলল রানা, 'সমস্যা আরও একটা আছে। বন্দীদের কামাল হাসানের হাতে তুলে দিলে কাল সকালেই নূর আয়াঙ এসে ফেরত চাইবে ওদের। কামাল হাসান ফেরত দিতে রাজি না হলে একটা ট্রাইবাল যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। উঁহুঁ, এ ঝুঁকি নেয়া চলে না।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে অ্যানি বলল, 'তা হলে একটাই উপায়। ওদেরকে ছেড়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক ওরা।'

‘যেখানে খুশি বলতে তুমি বোঝাতে চাইছ ওয়েলস অভ চাল্ডি,’ পুব দিকে তাকাল রানা, চাঁদের আলোয় ধু-ধু প্রান্তর নির্জন আর ফাঁকা। ‘দেখা না গেলেও, গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইথিওপিয়ান স্কাউটরা। এক মাইলও যেতে পারবে না, তার আগেই জবাই হয়ে যাবে বন্দীরা।’

‘ওদেরকে আমাদেরই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তা হলে,’ বলল অ্যানি।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল রানা। ‘পৌঁছে দিতে হবে?’

‘গাড়িতে করে, ওয়েলস অভ চাল্ডিতে…।’

‘শিফটারা আনন্দে বগল বাজাবে,’ হাসি মুখে বলল রানা। ‘ওদের কামানের কথা ভুলে গেছ দেখছি!’

‘যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্যে সাদা পতাকা উড়বে গাড়ির মাথায়,’ বুদ্ধি দিল অ্যানি। ‘এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, রানা। সত্যি নেই।’

ঝাড়া এক মিনিট প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা। ‘অনেক দূরের পথ, অ্যানি। চলো তা হলে, দেরি করে লাভ কী!’

নয়

হেডলাইট না জ্বেলে গাড়ি চালাল ওরা, শিফটা বা আদিবাসী স্কাউটদের যতটা সম্ভব অন্ধকারে রাখতে চায় রানা। তবে চাঁদ যথেষ্ট উজ্জ্বল, সামনের পথ চিনতে বা শুকনো গভীর নালাটাকে এড়িয়ে যেতে কোন অসুবিধে হলো না। অবশ্য মাঝে-মধ্যেই ছোট কিন্তু গভীর গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো নিতম্বিনী, নাকের সামনে দিয়ে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা শিয়াল বা নেকড়ে ছুটে পালাল।

অর্ধনগ্ন বন্দীরা গাড়ির পিছনের কমপার্টমেন্টে কাত হয়ে পড়ে আছে, সারাদিনের তুমুল যুদ্ধ আর ভয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের, পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়েছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এতই গভীর সে ঘুম, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ বা খোলের অনবরত ঝাঁকিও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারল না। আগোছাল একটা স্তূপের মত পড়ে থাকল তারা।

শীত শীত করায় ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য টারিট থেকে নেমে এল অ্যানি, ড্রাইভিং সিটে রানার পাশে ছোট্ট জায়গাটুকু দখল করল। কিছুক্ষণ শান্ত গলায় রানার সঙ্গে কথা বলল সে, তারপর তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল, থেমে গেল এক সময়। এক পাশে ঢলে পড়ল সে, একটু হেসে তার সোনালি মাথাটা নিজের কাঁধে ঠিকমত বসিয়ে নিল রানা, তার পিঠ আর কোমরে হাত পেঁচিয়ে ধরে রাখল, যাতে পিছলে পড়ে না যায়। গায়ের আঁচ পেয়ে আরও কাছে সরে এল অ্যানি। পুব আকাশে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালাল রানা।

শিফটা সেন্ট্রিরা তাদের ক্যাম্পের সীমানার উপর নিয়মিত বিরতিসহ একজোড়া শক্তিশালী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সার্চলাইটের আলো ফেলেছে, তাদের সন্দেহ রাতের অন্ধকারে আদিবাসীরা হামলা করতে পারে। মরু আকাশের গায়ে সাদা আলোর লম্বা

একজোড়া টানেল ছুটে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে। আলোটার দিকে লক্ষ্য রেখে এগোল রানা, দূরত্ব কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি মন্থর করল। জানে, নিস্তব্ধতার ভিতর বহু মাইল দূর থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাবে, তবে এঞ্জিনের গর্জন কম হলে দূর থেকে ধরা যাবে না ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

এক সময় রানা আন্দাজ করল শিফটাদের ক্যাম্প আর দুই কি তিন মাইল সামনে। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে অন্ধকার আকাশটাকে চিরে হাজার ফুট উপরে উঠল একটা স্টার শেল, বিস্ফোরিত হলো চোখ ধাঁধানো সাদা-নীল আলো, বহু মাইল জুড়ে নীচের মরুভূমিটাকে একটা মঞ্চের মত আলোকিত করে তুলল। অকস্মাৎ ব্রেক কষে নিতম্বিনীকে দাঁড় করাল রানা, শেলটা ধীরে ধীরে মাটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আলোর ভিতর নড়াচড়া করলেই আর্মারড কারের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে শিফটারা।

নিভে গেল স্টার শেলের আলো, অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে ফিরে এল। ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে অ্যানির, ঢুলুঢুলু চোখে রানার দিকে তাকাল সে, কপালে হাত তুলে চুল সরাল।

'কী হলো, রানা?'

'পৌঁছে গেছি,' বলল রানা, পরমুহূর্তে আরেকটা স্টার শেল উঠল আকাশে, তার উজ্জ্বল আলোয় ম্লান হয়ে গেল চাঁদটা।

'ওদিকে,' বলে একটা হাত তুলে অ্যানিকে দেখাল রানা,ওয়েলস অভ চান্ডির উপরে পাহাড়শ্রেণীর কিনারা পরিষ্কারই দেখা গেল। সাজানো অনেকগুলো সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিফটাদের ট্রাক বহর, স্টার শেলের আলোয় প্রতিটি কাঠামো

স্পষ্ট, মাইল দুয়েক দূরে। আচমকা মেশিনগানের একটানা আওয়াজ ভেসে এল, ছায়া লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছে সেন্ট্রিরা। মেশিনগানের আওয়াজ থামবার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল।

'মনে হচ্ছে সবাই ওরা জেগে আছে, অত্যন্ত নার্ভাস,' চিন্তিত গলায় মন্তব্য করল রানা। 'আর সামনে যাওয়া উচিত হবে না।'

'ছেড়ে দিলে ওরা যেতে পারবে,' বলল অ্যানি। 'কাছেই তো।'

কয়েক সেকেন্ড কোন মন্তব্য করল না রানা, তারপর বলল, 'সবাইকে নয়, একজনকে যেতে দেব আমরা।'

'একজনকে…মানে?'

'এটা যুদ্ধ, অ্যানি,' বলল রানা। 'নাচতে নেমে যেমন ঘোমটা দেওয়া চলে না, তেমনি যুদ্ধে নেমে দয়ার সাগর হওয়া সাজে না। তা ছাড়া, বিনিময়ে কিছু না পেয়ে বন্দীদের ফিরিয়ে দিলে আদিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়। অন্তত চেষ্টা করে দেখা দরকার কিছু আদায় করা যায় কিনা।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সহজ ভাষায়, বন্দী বিনিময়। তিনজন ইটালিয়ান বন্দীর বিনিময়ে তিন-দশে ত্রিশজন আদিবাসী বন্দী চাইব আমরা।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ধারণাটা বাতিল করে দিল অ্যানি। 'শিফটাদের ক্যাম্পে আমরা যেতে পারছি না, তোমার প্রস্তাব শোনার জন্যে ওরাও কেউ এখানে আসছে না…,' তারপর তার মনে পড়ল, রানা বলেছে একজন বন্দীকে ছেড়ে দেবে সে। '…আচ্ছা বলো কীভাবে কী ভেবেছ, শুনি।'

'শুনবে কেন, দেখো,' প্রস্তাব দিল রানা। ক্রল করে ড্রাইভারের সিট থেকে নামল ও, গাড়ির পিছনে চলে এল। তিনজন বন্দী জড়াজড়ি করে রয়েছে, ঘুমন্ত পুতুলের মত। একজন এমন বিকট

শব্দে নাক ডাকছে, ঠিক যেন হাঁপানি রোগাক্রান্ত একটা সিংহ। গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনজনকেই জাগাল ও। কোথায় রয়েছে, কী ঘটেছে ইত্যাদি স্মরণ করতে বেশ খানিক সময় নিল তারা। ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে অন্ধকার প্রান্তরে বের করে আনল রানা।

ঠাণ্ডা বাতাসে হি-হি করতে লাগল বন্দীরা, সন্ত্রস্ত, নিজেদের চারদিকে বোকার মত তাকাল। এই সময় আবার একটা স্টার শেল বিস্ফোরিত হলো সরাসরি মাথার উপর, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল লোকগুলো।

তিনজনই ওরা অল্প অল্প ইংরেজি জানে। কী প্ল্যান করেছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না দিয়ে তিনজনকেই জেরা করল রানা। আধ ঘণ্টা জেরা করায় কয়েকটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল। সেলাসী বাহিনীকে সাহায্য করতে যাচ্ছে শিফটারা, তবে তাদের প্রথম কাজ আদিবাসী রাসটা আর হারারি গোত্রগুলোকে নির্বংশ করা, কারণ সম্রাট হাইলে সেলাসী, মি. এক্স আর জেনারেল ফাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই গোত্রের লোকেরা সবাই কমিউনিস্ট। তার মানে আদিবাসীরা যদি সারডি গিরিসংকট ছেড়ে সরে যায়, সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য শিফটারা সরাসরি অগ্রসর হবে না, তারা বরং আদিবাসীদের পিছু ধাওয়া করবে। আদিবাসীদের হয় জিততে হবে, নয় ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। কী গুরুতর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, উপলব্ধি করতে পারল রানা।

আরেকটা তথ্য হলো, কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক জেনারেল ফাদের কাছ থেকে ট্যাংক আর এয়ারক্রাফট চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। তার আবেদন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে বন্দীদের ধারণা। তাদের আরও ধারণা, প্রিন্স হাসান সালের সঙ্গে শিকারী বিড়ালের মত খেলছেন সম্রাট।

এরপর রানা ওদেরকে প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করল। গাড়িতে তারা দু'জন থাকবে, বাকি একজন হেঁটে রওনা হবে। ক্যাম্পে ফিরে কাউন্ট ডিকানডিয়া বা মেজর লুইগি রাকাকে প্রস্তাবটা দেবে সে। তিনজন ভাড়াটে ইটালিয়ান সৈনিকের বিনিময়ে ত্রিশজন আদিবাসী যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। আর্মারড কার নিয়ে আরও মাইলখানেক এগিয়ে অপেক্ষা করবে রানা, শিফটারা ওর প্রস্তাবে রাজি হলে গুলিবর্ষণ বন্ধ রাখবে, আকাশে আর কোন স্টার শেল ছুঁড়বে না। ত্রিশজন আদিবাসীকে নিয়ে আসবে ইটালিয়ান সৈনিক, তারপর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আবার ফিরে যাবে সে। আর শিফটারা যদি ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়, দু'জন বন্দীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে রানা, তাদেরকে তুলে দেবে রাসটা গোত্রের প্রধান কামাল হাসানের হাতে। বলাই বাহুল্য, প্রস্তাবে রাজি হবার ভান করে শিফটারা যদি কোন রকম চালাকি করতে যায়, পরিণতির জন্য তারাই দায়ী থাকবে। রানা আর অ্যানিকে অসহায় ভাবলে ভুল করবে তারা, কারণ ওদের সঙ্গে আর্মারড কার ও ভিকার্স মেশিনগান রয়েছে।

ইটালিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা রানার প্রস্তাব নিয়ে ফিরে যেতে রাজি হলো, বাকি দু'জনকে আবার ঢোকানো হলো গাড়ির ভিতর। বাইরে থেকে হ্যাচের তালা লাগাতে ভুল হলো না রানার। নিঃসঙ্গ ইটালিয়ান সৈনিকের পিছু পিছু ধীরগতিতে রওনা হলো আবার আর্মারড কার। লোকটাকে নির্দেশ দেওয়া আছে, আকাশে স্টার শেল উঠছে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়বে সে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়বে নিতম্বিনী, আলো নেভার পর আবার রওনা হবে।

শিফটাদের ক্যাম্প যখন আর মাত্র এক মাইল দূরে, ব্রেক করল রানা, যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরিয়ে নিল নিতম্বিনীর

নাক, ইটালিয়ান সৈনিক একাই রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

লোকটার গমনপথের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে রানা, স্টার শেলের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল তাকে। মাথার উপর দু'হাত তুলে নাড়ছে, বোঝাতে চাইছে শত্রুপক্ষের কেউ নয় সে। মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি থামল না, তবে বুলেটগুলো লোকটার দিকে আসছে না বলেই মনে হলো, অন্তত লাগল না একটাও। ক্যাম্প যখন আর মাত্র তিনশো কী সাড়ে তিনশো গজ দূরে, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল ক্ষুদে ছায়ামূর্তি, নিমেষে ঘিরে ফেলল লোকটাকে। শিফটা সেন্ট্রিরা ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে নিঃসঙ্গ লোকটার পরিচয় জানবার জন্য।

মাটির ভাঁজে আবার হারিয়ে গেল তারা, সঙ্গে ভাড়াটে সৈনিকটাও।

পাঁচ মিনিট কাটল, সাত মিনিট, গুলিবর্ষণ থামল না। আকাশে এখনও একটা স্টার শেল জ্বলছে।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য লাগল অ্যানির, কথা না বলে পারল না। 'তোমার কি মনে হয়, আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে ওরা।'

'কাউন্ট নিজে একজন ইটালিয়ান, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর রাকাও তাই,' বলল রানা। 'স্বজাতি দু'জন বন্দীকে তারা ফেরত পেতে চাইবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের না ছেড়ে, কোনও কৌশলের মাধ্যমে ফেরত পেতে চাইবে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। কাজেই আমাদের সাবধান থাকতে হবে।' ভিকার্স মেশিনগানটা নেড়েচেড়ে দেখল রানা। 'তোমার কাছে নিশ্চয়ই

কোনও অস্ত্র নেই?'

'নেই, আবার আছেও,' জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অ্যানি।

'ও, আচ্ছা–বুঝেছি, নেই আবার আছেও!' উপর-নীচে মাথা দোলাল রানা।

'হেসো না, সত্যি কথা বলছি,' অ্যানি গম্ভীর। 'মাইকেল আমাকে একটা অটোমেটিক হ্যান্ডগান দিয়েছে, কিন্তু আমি নিতে চাইনি। তার কথা হলো, আমরা নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগে রয়েছি, চারদিকে শুধু হিংস্র জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে একটা অস্ত্র আমার সাথে থাকা দরকার। আমি তার সাথে একমত হতে পারিনি, বলেছি, আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে আলাদা ভাবে কোন অস্ত্রের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। রেগে যায় সে, পিস্তলটা আমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়।'

'প্রসঙ্গক্রমে বলছি, মাইকেলের কথায় অত্যন্ত জোরাল যুক্তি আছে...।'

'যুক্তি আছে কি নেই, আমি আশা করছি না সেটা আমাকে কেউ বলে দিক।' রেগে উঠল অ্যানি। 'স্বাধীন ইচ্ছা আমারও থাকতে পারে...।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই–এমনকি মৃত্যুকে সাদর আলিঙ্গন করার স্বাধীন ইচ্ছেও তোমার থাকতে পারে। তা, কোথায় আছে সেটা?'

'দাঁড়াও, মনে করতে দাও, কোথায় রেখেছি ভুলে গেছি।'

ব্যাখ্যাটা পাওয়া গেল–'নেই, আবার আছেও!'

টারিট থেকে হ্যাচ গলে নীচে নেমে গেল অ্যানি, ড্রাইভারের সিটের তলায় হাত গলিয়ে হাতড়াল কিছুক্ষণ, উপর থেকে তার অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল রানা, 'এখানেই তো রেখেছিলাম ছাই!'

পাওয়া গেল পিস্তলটা, চেক করে রানা দেখল ম্যাগাজিনে পাঁচটা গুলি রয়েছে। 'তুমি এখানে অপেক্ষা করো, খানিকটা সামনে এগিয়ে ওত পেতে থাকব আমি। যদি দেখি শিফটাদের মতলব খারাপ, ফিরে আসব–সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দেবে তুমি।'

'কিন্তু… ।'

'থামো, আগে শেষ করি। যদি দেখো আমি ফিরছি না অথচ শিফটারা আসছে বা কামান দাগতে শুরু করেছে, বন্দীদের নিয়ে সোজা ফিরে যাবে আমাদের ক্যাম্পে–আমার জন্যে কোনও অবস্থাতেই অপেক্ষা করবে না। মনে থাকবে?'

'একা ফিরে যাব?' অ্যানির গলা অস্বাভাবিক শান্ত।

'যদি দেখো আমি ফিরিনি, তা হলে দুটোর একটা ঘটনা ঘটেছে বলে ধরে নেবে তুমি–হয় আমি মারা গেছি, নয়তো বন্দী হয়েছি। এ-কথা জানার পর, যেহেতু আমি মারা গেছি বা বন্দী হয়েছি, তুমিও মারা যেতে বা বন্দী হতে চাইবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'না, তা চাইব বলে মনে হয় না,' জবাবে বলল অ্যানি। 'তবে সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি একা ছাড়ব না। কোথাও যেতে হলে আমাকেও সাথে নিতে হবে তোমার।'

'তা হলে নিতম্বিনী আর বন্দীদের পাহারা দেবে কে?' জানতে চাইল রানা। 'ভূতে?'

স্টার শেল নেভার পর রওনা হলো রানা, চাঁদের আলোয় অ্যানি তাকে মাত্র কিছুক্ষণ দেখতে পেল। এই ছিল, তারপর ভোজবাজির মত অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা। টারিটে বসে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও ঘামতে লাগল অ্যানি। স্টার শেল নিভে যাওয়ায় সামনেটা খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।

সার্চলাইটের আলোও অনেকক্ষণ হলো জ্বলছে না। কতটা সময় পেরুল—এক ঘণ্টা? পৌনে এক ঘণ্টার কম নয়।

মনে মনে একটা হিসাব করবার চেষ্টা করল সে। প্রস্তাবে রাজি হলে ত্রিশজন আদিবাসী বন্দীকে এক জায়গায় জড়ো করবে শিফটারা, অসংখ্য বন্দীর মধ্যে থেকে তাদেরকে বাছাই করতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। আহতদের ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা কম, বেছে বেছে সুস্থদের পাঠাবে তারা। ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে এক মাইল হেঁটে আসতে যথেষ্ট সময় নেবে বন্দীরা, আর যদি পিছমোড়া করে হাত বাঁধা থাকে তা হলে তো কথাই নেই, দ্বিগুণ সময় লাগবে।

একবার ইচ্ছে হলো সে-ও রানার পথ ধরে এগোয়। চিন্তাটা বাতিল করে দিল সে। তাতে যে শুধু রানার নির্দেশ অমান্য করা হবে তাই নয়, দায়িত্ব জ্ঞানহীনতারও পরিচয় দেওয়া হবে।

সময় বয়ে চলল। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল অ্যানি, কিন্তু সামনে কিছুই নড়তে দেখল না। বাতাসের শোঁ-শোঁ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। হঠাৎ তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শিফটারা যদি পিছন বা অন্য কোনও দিক থেকে আসে? যদি ঘিরে ফেলে আর্মারড কার? ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল সে।

শিফটা ক্যাম্পের সীমানায় সেন্ট্রিদের সংখ্যা কমে গেছে, বেশিরভাগই ফিরে আসা ইটালিয়ান সৈনিককে নিয়ে ক্যাম্পের মাঝখানে কাউন্ট ডিকানডিয়ার তাঁবুতে ঢুকেছে তারা। এখনও যারা প্রহরায় রয়েছে, আগের চেয়ে সতর্ক, টহল দিচ্ছে নার্ভাস ভঙ্গিতে। ফেরত আসা ভাড়াটে সৈনিক কী খবর নিয়ে এসেছে কে জানে!

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকল

রানা। পঞ্চাশ গজ সামনে একজন সেন্ট্রি রয়েছে, আরও একশো গজ দূরে ট্রাক বহর, দাঁড়িয়ে রয়েছে সার সার, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার ফুটে আছে কাঠামোগুলো। ট্রাক বহরের কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে, ডান পাশে, আরও তিনটে ট্রাক রয়েছে, ক্যানভাসে ঢাকা। বোঝাই যায়, ওগুলোকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। কেন? তবে কি ওগুলোয় গোলাবারুদ রাখা হয়েছে?

ক্যাম্পের মাঝখান থেকে ভেসে আসা শোরগোলের শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি শিফটা কমান্ডাররা। সম্ভবত মুক্তি পাওয়া সৈনিককে জেরা করে জেনে নিচ্ছে, প্রস্তাবটা শিফটাদের বিরুদ্ধে কোন ফাঁদ বা চাল কিনা।

আরও ভিতরে ঢুকবার একটা সুযোগ দেখতে পেল রানা। সামনের সেন্ট্রি ওর সামনে দিয়ে হেঁটে অনেক দূর চলে গিয়ে ফিরে আসছে আবার, ইচ্ছে করলে তার ফিরবার আগে সামনের দুরত্বটুকু পেরিয়ে ট্রাক বহরের কাছে বা ওগুলোর উল্টোদিকে পৌঁছুনো রানার জন্য তেমন কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু কী লাভ? ভিতরে ঢুকলেই তো হবে না, বেরুতেও হবে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মাথায়।

এই সময় রানার ডান আর বাঁ দিক থেকে মেশিনগান ও রাইফেলের আওয়াজ থেমে গেল। সেই সঙ্গে ক্যাম্পের মাঝখানে সৈনিকদের ছুটোছুটি পড়ে গেল, সবাই যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আকাশে আর কোন স্টার শেলও উঠল না।

ঝোপের ভিতর থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, কী ঘটছে জানা দরকার। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় যা দেখল, হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। প্রস্তাবে রাজি হয়েছে শিফটারা, ক্যাম্পের সীমানা

ছাড়িয়ে আদিবাসী বন্দীদের নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে ভাড়াটে ইটালিয়ান সৈনিক—অবশ্য আগুনের লালচে আভায় চেনা গেল না সৈনিকটি আগের সেই লোক কিনা। একটা পাথরের গায়ে সেঁটে থাকল রানা, ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল দলটা, সোজা নিতম্বিনীর দিকেই যাচ্ছে। আদিবাসীদের চিনতে পেরেছে ও, চিনতে পেরেছে সৈনিকটিকেও।

প্রস্তাব মেনে নিয়েছে কর্নেল ডিকানডিয়া, কিন্তু সেটা ভান মাত্র। আর্মারড কারের পথরোধ করবার জন্য চমৎকার একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সে। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় সৈনিকদের পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ট্রাক বহরের প্রথম আর দ্বিতীয় সারিতে উঠছে তারা। আলোছায়ার ভিতর সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না, তবে অন্তত ছ'টা ট্রাকে উঠছে তারা।

দ্রুত কাজ শুরু করল রানার মাথা। আদিবাসী বন্দীদের নিয়ে আর্মারড কারটাকে রওনা হতে দেবে শিফটারা, তারপর বিশাল একটা বৃত্ত রচনা করে দু'দিক থেকে ওটার সামনের পথ আটকে দাঁড়াবে ছ'টা ট্রাক। ছ'টা ট্রাকে অন্তত তিনশো সৈনিক থাকছে, তিনশো রাইফেলের বিরতিহীন গুলিবর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া বা অগ্রাহ্য করা নিতম্বিনীর পক্ষে সম্ভব নয়, তার উপর দু'পাঁচটা মেশিনগান কি আর থাকবে না?

মনে উঁকি দেওয়া সম্ভাবনাটা এখন আর শুধু অ্যাডভেঞ্চারের পর্যায়ে থাকল না, আত্মরক্ষার একটা কৌশল বলে মনে হলো রানার। ট্রাক বহরের কাছে সবাই খুব ব্যস্ত, এমনকী সেন্ট্রিরাও দায়িত্ব ভুলে সেদিকে তাকিয়ে আছে। এই সুযোগে ক্রল করে এগোল রানা। দূরত্ব যতই কমল, সশস্ত্র শিফটা সৈনিকদের আরও পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। কেউ কেউ এমনকী ঘুম ভাঙবার পর গায়ে শার্ট চড়াবারও সময় পায়নি, হাতে রাইফেল ধরিয়ে দেওয়া

হয়েছে। নিঃসঙ্গ সেন্ট্রিকে পিছনে ফেলে এল রানা, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল মাটির উপর, গায়ের ছেঁড়া শার্টটা আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে। ট্রাক বহরের উল্টোদিকে পৌঁছে গেছে ও। মাত্র দুশো গজ দূরে শিফটা সৈনিকরা হুটোপুটি করে ট্রাকে চড়ছে।

তিনটে ট্রাকের প্রথমটার আড়ালে রয়েছে রানা। ক্যানভাস ঢাকা পিছনটায় উঁকি দিয়ে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। ট্রাকের পিছনে দশ-বারোটা অ্যামুনিশন বক্স আর থরে থরে সাজানো রাইফেল রয়েছে। তাড়াহুড়ো না করে শিষ দিল রানা, শান্ত পায়ে হেঁটে চলে এল ট্রাকের পাশে। ক্যাবের দরজা খুলে উঁকি দিল ভিতরে। কেউ নেই। শিফটাদের দিকে একটা চোখ রেখে সরে এল ট্রাকের সামনে। হাত রাখল ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলে। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

তিন মিনিট পর ছ'টা ট্রাক ভরে গেল শিফটা সৈনিকে। ট্রাকের পাশে, মাটিতে, আরও অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে হাবভাব দেখে বোঝা গেল অভিযানে তারা অংশগ্রহণ করছে না। ছ'টা ট্রাকের সামনে ছ'জন সৈনিক দাঁড়াল, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলে হাত। একসঙ্গে স্টার্ট দেওয়া হবে। একটা ট্রাকেরও হেডলাইট জ্বলল না।

আর্মারড কারের দিকে আদিবাসী বন্দীরা বোধহয় অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে, আন্দাজ করল রানা।

একসঙ্গে গর্জে উঠল ছ'টা ট্রাক, এক সেকেন্ড পর স্টার্ট নিল অস্ত্রশস্ত্রে ঠাসা সদ্য দখল করা রানার ট্রাকটাও। এক ছুটে ট্রাকের পাশে চলে এল ও, লাফ দিয়ে উঠে বসল ক্যাবে। শিফটা ট্রাকগুলো স্টার্টই নিয়েছে শুধু, এখনও সচল হয়নি, কারণ কাউন্ট ডিকানডিয়া প্রতিটি ট্রাক ড্রাইভারকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘ

ভাষণের মাধ্যমে উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে।

হঠাৎ গোলাবারুদ ভর্তি তিনটে ট্রাকের একটার জোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠল। হতভম্ব হয়ে গেল শিফটারা। কর্কশ শব্দে হেসে উঠে কাউন্ট ডিকানডিয়া জোড়া আলোর দিকে একটা হাত তুলে বলল, 'গর্দভটাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে, ওকে আমার থুথু চাটাব! পই পই করে বারণ করলাম, কোন আলো জ্বালা চলবে না!'

কয়েকজন শিফটা হেডলাইট লক্ষ্য করে পা বাড়াল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আলো জোড়া হঠাৎ সচল হয়ে উঠল। সবাইকে বিস্ময়ে পাথর করে দিয়ে ছুটল ট্রাকটা, প্রতি মুহূর্তে দ্রুত হলো গতি, দেখতে না দেখতে ক্যাম্প ছেড়ে খোলা প্রান্তরে গিয়ে পড়ল ক্যানভাস ঢাকা আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন ট্রাক।

ট্রাক বহরের সামনে রাগে লাফাতে শুরু করল কাউন্ট ডিকানডিয়া। এখনও তার ধারণা, বীরত্ব দেখানোর লোভে শিফটাদেরই একজন সৈনিক আর্মারড কারটাকে বাধা দেওয়ার জন্য রওনা হয়েছে। ট্রাক ড্রাইভাররা কী করবে বুঝতে পারছে না, বোকার মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা, কাউন্টের কাছ থেকে এখনও তারা কোন নির্দেশ পাচ্ছে না।

গালিগালাচ এবং ভাষণ, দুটোই সমানে চালিয়ে যাচ্ছে কাউন্ট। 'বেজন্মাটা গেছে যাক, নিজের প্রতি দরদ থাকলে আর ফিরে আসবে না। আর যদি বোকামি করে ফেরত আসে, সাথে সাথে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে। সেন্ট্রিরা যে যার পোস্টে ফিরে যাও। স্টার শেল!' হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। 'স্টার শেল ছাড়ো! কামান দাগো! ধুলোর সাথে মিশিয়ে দাও আর্মারড কারটাকে। বন্দীরা এখনও পৌঁছায়নি, কামান দেগে উড়িয়ে দাও সব ক'টাকে!'

রানার আন্দাজ প্রায় সঠিক প্রমাণিত হলো, আর্মারড কারের দিকে মাত্র অর্ধেক রাস্তা পেরিয়েছে বন্দীরা। হেডলাইট জ্বেলে ট্রাকটাকে ধেয়ে আসতে দেখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল তারা, তাদের পাশে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করল রানা। 'উঠে পড়ো, পিছনে উঠে পড়ো!' জরুরী তাগাদা দিল রানা, ক্যাব থেকে মাথা বের করে ইশারায় দেখাল ট্রাকের পিছনটা। ইটালিয়ান সৈনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'তুমিও উঠে পড়ো!'

হেডলাইটের আলো দেখে ঘাবড়ে গেল অ্যানি। তারমানে কি রানা ধরা পড়েছে? শিফটারা এবার ওকে ধরতে আসছে? কী করবে ভেবে পেল না সে—আর্মারড কার আর বন্দীদের নিয়ে ছুটবে? কিন্তু সময় পাওয়া গেল না—ঝড় তুলে কাছে চলে এল ট্রাক। বহু লোকের মিলিত কণ্ঠের হৈ-চৈ আর গান শুনতে পেল অ্যানি।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করল রানা, ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল। রানাকে দেখে নিজের অজান্তেই ককিয়ে কেঁদে উঠল অ্যানি, পরম স্বস্তিতে অবশ হয়ে গেল তার শরীর।

অল্প দু'চার কথায় বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে বলল রানা অ্যানিকে। শিফটারা ওদেরকে ফিরতে বাধা দেবে, বিপদ এড়িয়ে পালাতে হবে এখন। তার আগে মুক্ত করে দিতে হবে বন্দীদের।

হ্যাচ খুলে দু'জন বন্দীকে বের করা হলো। ট্রাক থেকে নেমে তাদের সঙ্গে যোগ দিল বয়স্ক ইটালিয়ান লোকটা। রানা বলল, 'তোমরা মুক্ত।' শিফটা ক্যাম্পের দিকে একটা হাত তুলল ও। 'চলে যাও।'

বয়স্ক ইটালিয়ানটা ইতস্তত করল, তার যেন যাবার ইচ্ছে নেই। আর বাকি দু'জন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রানার

দিকে, রানার কথা যেন বোধগম্য হয়নি।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?' ধমক দিল রানা। 'যাও!'

তবু ওরা নড়ল না।

'কী হলো? কিছু বলবে?' রেগে উঠল রানা, এখানে সময় নষ্ট হলে পথে বিপদে পড়তে হবে ওদেরকে।

'ওদিকে কোথায় যাব?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল একজন বন্দী, সেই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। 'আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না...।'

'ওদিকে তোমাদের ক্যাম্প!' বলল রানা। 'তোমরা মুক্ত! দৌড়াও, ছোটো!' বন্দীদের দিকে এক পা এগোল ও।

ঘুরে দাঁড়াল ওরা, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে–সন্দেহ পিছন ফিরলেই রানা যদি গুলি করে। অগত্যা ওদের পিঠে ধাক্কা দিতে হলো রানাকে। তারপর ওরা হাঁটতে শুরু করল।

কিছু দূর গিয়ে বয়স্ক লোকটা আবার ফিরে এল।

'আবার কী হলো?' মারমুখো হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, অ্যানিকে নিয়ে নিতম্বিনীর উপর চড়তে যাচ্ছিল ও।

রানার দিকে নয়, সোজা এগিয়ে এসে অ্যানির সামনে থামল লোকটা। তার চোখে কৃতজ্ঞতার আলো। সবিনয় ভঙ্গিতে ঝুঁকে অ্যানির একটা হাত ধরল সে, হাতটা খানিক তুলে আলতোভাবে চুমো খেলো। 'ধন্যবাদ, ম্যাডাম, অসংখ্য ধন্যবাদ!'

অ্যানির হাত ছেড়ে দিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'আপনার একটা উপকার করতে চাই। কোন দিক দিয়ে যাবেন আপনারা। দয়া করে বলবেন কী?' একটা হাত তুলল সে। 'ওদিক দিয়ে?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওদিকে গেলে কী ঘটবে জানা আছে ওর।

'কাউন্ট কী প্ল্যান করেছেন আমি জানি। ওদিকে যাবেন না প্লিজ...'

হঠাৎ থেমে গেল লোকটা, দেখল করমর্দনের জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানা। লুফে নেওয়ার ভঙ্গিতে রানার হাতটা ধরে খুব করে দু'হাতে ঝাঁকাল সে, চোখে পানি নিয়ে হাসছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল সে।

অ্যানিকে নিয়ে নিতম্বিনীর টারিটে উঠে পড়ল রানা। ট্রাক চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে সদ্য মুক্তি পাওয়া গালাদের একজন, ত্রিশ জনের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম নয়—বারোজন। দু'টো গাড়ি এক সঙ্গে রওনা হবে, সামনে থাকবে আর্মারড কার।

রওনা হতে গিয়েও পুব দিকে একবার তাকাল রানা, আর ঠিক তখনই অন্ধকার চিরে আকাশে উঠল একটা স্টার শেল। চোখ ধাঁধানো আলোটা নেভার অপেক্ষায় না থেকে আর্মারড কার ছেড়ে দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওটার পিছু নিল ট্রাকটা।

কামানের গর্জন শোনা গেল কয়েক মিনিট পর, ইতিমধ্যে আরও প্রায় এক মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা। বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল রানা। গোলাটা পড়ল নিতম্বিনীর ত্রিশ গজ সামনে, তবে অনেকটা ডান দিক ঘেঁষে। গোলাবারুদ ভর্তি ট্রাকের উপর শেল পড়লে কী হবে জানা আছে রানার। পরবর্তী শেলটা পড়ল বেশ অনেকটা পিছনে। শেষ স্টার শেল নিভে যাবার পর নতুন আরেকটা বেশ কিছুক্ষণ জ্বলল না, আর কোন কামানের গোলাও ছুটে এল না ওদের দিকে।

খানিক পর আবার স্টার শেল উঠল আকাশে, কামানও গর্জে উঠল, তবে ইতিমধ্যে নাগালের বাইরে চলে এসেছে ট্রাক আর আর্মারড কার। বুঝতে পেরে আবার ট্রাকের পিছন থেকে গান

গেয়ে উঠল আদিবাসীরা, অ্যামুনিশন বাক্সের গায়ে রাইফেল ঠুকে আনন্দ প্রকাশ করছে।

চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এল ওরা। ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে নিতম্বিনীর গতি মন্থর করল রানা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল যোদ্ধারা। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের সঙ্গে অ্যানি দেখল আর্মারড কারটাকে ঘিরে ফেলল তারা, টারিট থেকে এক রকম ছোঁ দিয়ে রানাকে ছিনিয়ে নিল আট-দশ জোড়া কালো লোমশ হাত।

কামাল হাসানের ক্যাম্পে ইতিমধ্যে মহা শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে গালা গোত্রের প্রধান নূর আয়াঙ। সদলবলে হাজির হয়েছে সে, কামাল হাসানের কাছে বিচার চায়। রানা আর অ্যানি তার মুখের গ্রাস তিনজন ইটালিয়ান বন্দীকে কেড়ে নিয়ে এসেছে, তার দাবি এই মুহূর্তে রানা আর অ্যানিকে তার হাতে তুলে দিতে হবে।

বহুযুগ পর এই প্রথম কামাল হাসানকে ভাবগম্ভীর চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকতে দেখা গেল। বিশেষ করে রানার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতে রাজি নন তিনি। তাঁর ধারণা, রানা যদি বন্দীদের মুক্ত করেই থাকে, তার পিছনে সঙ্গত কোন কারণ না থেকে পারে না।

নূর আয়াঙ হুমকি দিল, কামাল হাসান সুবিচার না করলে আইন নিজের হাতে তুলে নেবে সে।

এই সময় ক্যাম্পে ঢুকল আদিবাসীদের বিজয় মিছিল। শোরগোল শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ কামাল হাসান। মিছিলটা দেখে তাঁর দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। অকস্মাৎ ঘুরলেন তিনি, ছুটে ভিতরে ঢুকলেন, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনলেন নূর আয়াঙ গালাকে। 'যাও, বদলা নাও! করো বিচার!

ওই তো রানা, যাও!’

গোটা ক্যাম্প জ্যান্ত হয়ে উঠল। শিশুরা কেঁদে উঠল হারিয়ে যাওয়া বাবাকে আবার দেখতে পেয়ে, স্ত্রীরা পাগলিনীর মত ছুটল ফিরে আসা স্বামীদের বুকে আছড়ে পড়বার জন্য। একজন গালা ছুটে এসে গোত্রপ্রধানকে জানাল, তিনজন ইটালিয়ান বন্দীর বিনিময়ে ত্রিশজন যোদ্ধাকে কেড়ে নিয়ে এসেছে মাসুদ রানা, তাদের মধ্যে বারোজনই গালা—এই মুহূর্তে তাদের কাঁধেই সওয়ার হয়ে রয়েছে নমস্য উদ্ধারকর্তা।

কামাল হাসানের তর্জন-গর্জন আর লম্ফঝম্পের সামনে টিকতে না পেরে চোরের মত পালিয়ে গেল নূর আয়াঙ। তার নিজের গোত্রের লোকজনই রানাকে নিয়ে এমন মেতে উঠেছে, এখন বিচারের কথা উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক।

দশ

চকচকে ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল জেনারেল ফাদ। সিংহ বধের উল্লাস নিয়ে গর্বিত শিকারীর মত আর্মারড কার গরবিনীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া

লেকরেক। গরবিনীর খোল ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে, পিছনে পড়ে রয়েছে আদিবাসী রাসটা আর হারারি যোদ্ধাদের লাশ, রক্তে লাল হয়ে আছে তাদের শতচ্ছিন্ন আলখেল্লা। জেনারেল ফাদের জানা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা লাশগুলো চাতুর্যের সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়েছে, ওগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই শিফটাদের লাশ। এক দুই করে গুণল জেনারেল ফাদ, প্রায় দুশোর মত হবে। তারমানে, ভাবল সে, কাউন্ট ডিকানডিয়া তার রিপোর্টে কিছুই বাড়িয়ে লেখেনি। সত্যি তা হলে দু'হাজার আদিবাসীকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে শিফটারা।

কর্নেল ডিকানডিয়া নিজের কৃতিত্ব ছবির সাহায্যে রেকর্ড করে রাখতে চাইলেও, এক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ক্যামেরাম্যান সার্জেন্ট বানানটো সাতা বারবার পোজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও, মধ্যমাঠে গিয়ে গরবিনীর পাশে দাঁড়াতে রাজি হয়নি সে। অবশেষে মেজর রাকা রিপোর্ট দিল, শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। তবু সাহস হলো না কাউন্টের, মেজরকে সে নির্দেশ দিল: আর্মারড কারটাকে ক্যাম্পের দিকে অন্তত খানিকটা টেনে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করো, সেই সঙ্গে যোগাড় করো দুশো আদিবাসীর লাশ। মেজর সবিনয়ে জানাল, আদিবাসীরা মারা পড়েছে মাত্র জনা পঞ্চাশ, দুশো লাশ যোগাড় করা সম্ভব নয়। খেপে উঠে কাউন্ট বলল, ফটোয় দেখে লাশ চেনা সহজ কথা নয়। আদিবাসী না হলেও চলবে। বাকি দেড়শো লাশ শিফটাদের হোক না, ক্ষতি কী, তবে ওদের মাথায় বা হাতে লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিয়ো, যাতে কমিউনিস্ট বলে চেনা যায়।

তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মেজর রাকা, কারণ ইতিমধ্যে তার জানা হয়ে গেছে যে জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স কাউন্টকে যোদ্ধা হিসাবে নেপোলিয়নের সমকক্ষ বলে ভাবতে শুরু

করেছে।

ফটোটা নামিয়ে রেখে মি. এক্সের দিকে তাকাল জেনারেল ফাদ। 'কাউন্ট দেখছি তাক লাগিয়ে দিল!'

'ওকে ডেকে পাঠান,' পরামর্শ দিল মি. এক্স। 'ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমাদের অভিনন্দন জানানো দরকার। তা ছাড়া, সেলাসী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্যে আরও তাড়াতাড়ি অ্যাডভান্স করতে হলে তার আর কী সাহায্য দরকার তাও শোনা যাবে।'

হেডকোয়ার্টার থেকে তলব করা হয়েছে, খবর শুনেই পিলে চমকে উঠল কাউন্টের। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিটি রিপোর্টে গাদা গাদা মিথ্যে তথ্য দিয়েছে সে, প্রথমেই তার ধারণা হলো সেগুলো সব ফাঁস হয়ে গেছে। কে ফাঁস করল? মেজরকে সে আগেই ভয় দেখিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে সে যেন জেনারেল ফাদকে কোনও রিপোর্ট না পাঠায়। একটা হুমকি দিতেও ভোলেনি, তার সম্পর্কে কোন কথা জেনারেল ফাদকে লাগালে সেটা মাফিয়াচক্রের কানে উঠবে, ফলাফল অনুমেয়। হুঁশিয়ারিটা মেজরের অন্তরে পৌঁছানোর কথা। তার জানা থাকবার কথা, মাফিয়ার অশুভ দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ইটালিয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়।

মেজরকে ডেকে কাউন্ট বলল, 'আমার বাহিনীতে একজন স্পাই আছে। তার পরিচয় এখনও আমি জানি না, কাজেই তুমিও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নও। আমি আসমারায় যাচ্ছি, ওখান থেকে ফিরে তার পরিচয় জানব। জেনে রাখো, স্পাইয়ের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।'

সার্জেন্ট সাতা আর ড্রাইভারকে নিয়ে আসমারার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল কাউন্ট, সঙ্গে তিন ট্রাক ভর্তি দেহরক্ষী থাকল

একশোজন।

আসমারার প্রধান সড়কে পৌঁছে ক্যাসিনোর সামনে থামল রোলস-রয়েস। কাউন্টের মন খারাপ, জেনারেল ফাদ হয়তো তাকে পদচ্যুত করবে, তাই তার সঙ্গে দেখা করবার আগে শেষবারের মত একটু আনন্দ-ফুর্তি করে নিতে চায় সে।

ক্যাসিনোয় বীরোচিত সম্বর্ধনা পেল কাউন্ট। অল্প বয়েসী যুবতীরা তাকে ছেঁকে ধরল। বেসুরো গলায় কাউন্ট বলল, 'যত পারো আমাকে আনন্দ দাও, কারণ আর হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না! সাতা, ক্যামেরা!' মেয়েরা তাকে কাঁধে তুলে নিল, খিল খিল করে হাসছে সবাই। মিছিল করে রওনা হলো তারা, তাদের সামনে দ্রুত পিছু হটল বানানটো সাতা, ঘন ঘন ক্যামেরার শাটার টিপল সে।

কয়েক ঘণ্টা পর। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে কাউন্ট। তার ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করা হয়েছে। সাতা নিজের হাতে তার চুলে সুগন্ধ তেল ঢেলেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাকে পাউডারের পাফ বুলাল কাউন্ট। হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে বিষণ্ন চিত্তে রওনা হবার আগে মেয়েদের চুমো খেলো সে, শেষ এক গ্লাস কনিয়াক গিলল, মন থেকে ভয় তাড়ানোর জন্য বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাসল, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে এল ক্যাসিনোর বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে তাকে নিয়ে ছুটে চলল রোলস-রয়েস, হেডকোয়ার্টারের দিকে।

চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। হেডকোয়ার্টারের বিশাল গেট দিয়ে রোলস-রয়েস ঢুকছে, কাছের একটা গির্জা থেকে চারটে বাজার সময় সংকেত শোনা গেল। পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা হলো কাউন্টকে, নির্জন করিডর ধরে উল্টো দিকে ছুটবার একটা প্রবণতাকে অতিকষ্টে দমন করল সে। অনুভব করল, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পেটের ভিতর ভুট-ভাট শব্দ হচ্ছে, নিজের ইচ্ছের

বিরুদ্ধে কাঁপছে চোখের পাতা। পথ-প্রদর্শক একজন সার্জেন্ট হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে।

ভিতরে ঢুকে কাউন্ট দেখল শিফটাদের অনেক অফিসার উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে ইটালিয়ান উপদেষ্টাদের সংখ্যাও কম নয়। নতুন ধরনের ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারা সবাই পাইলট। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট–জেনারেল ফাদ একজন স্যাডিস্ট, লোকজনের সামনে তাকে অপদস্থ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত একটা শব্দের দ্বারা আক্রান্ত হলো কাউন্ট। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল তার শরীর, মুখ লুকাল আস্তিনের আড়ালে। তারপর ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে আস্তিনের আড়াল থেকে উঁকি দিল সে। কামরা ভর্তি অফিসাররা উল্লাসে হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, পরস্পরের কাঁধে আর হাতে চাপড় মারছে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কাউন্ট। ঝট্ করে পিছনে তাকাল সে, আরও অবাক হয়ে গেল সেদিকে কেউ দাঁড়িয়ে নেই দেখে। এতক্ষণে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করল সে, এত উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে নিয়েই। অপ্রত্যাশিত হলেও, এই উষ্ণ সম্বর্ধনা তার উদ্দেশেই নিবেদিত।

আবার যখন সামনে তাকাল কাউন্ট, দেখতে পেল অফিসারদের ভিড় ঠেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী আজরাইলের মত খোদ জেনারেল আবদেল কাদের ফাদ। পিছন দিকে আরেকবার তাকাল কাউন্ট, কিন্তু সবগুলো বন্ধ দরজার সামনে একজন করে সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালানোর চিন্তা বাদ দিতে হলো তাকে। তবে নিজের অজান্তে পিছু হটতে শুরু করল সে।

মি. এক্সের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জেনারেল ফাদ। ‘দেখুন, দেখুন– কাউন্ট কেমন লজ্জা পাচ্ছেন!’ চুল-দাড়িতে ঢাকা প্রকাণ্ড মুখ নিয়ে ছুটে এল সে।

ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল জেনারেল ফাদ, তার বিশাল বপুর চাপে কাউন্টের সমস্ত দম বেরিয়ে গেল। ফাদের বুকে মুখ ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

‘একজন বীরকে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য হলো আমার!’ হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করল ফাদ, ‘কাউন্ট ডিকানডিয়া আমার মায়ের পেটের ভাই!’

ছাড়া পাবার আগেই রাগে দাঁত চাপল কাউন্ট ডিকানডিয়া, সাতা ব্যাটা করছেটা কী!

‘সম্ভাব্য সব রকম সাপোর্ট এখন পাওনা হয়েছে আপনার,’ জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করল। ‘সত্যি কথা বলতে কি, ওগুলো আপনাকে দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।’ হেডকোয়ার্টারের প্রাইভেট স্টাডিরুমে এই মুহূর্তে ওরা শুধু তিনজন উপস্থিত–কাউন্ট, জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স। গোল টেবিলে ভাঁজ খোলা একটা ম্যাপ আর মদ্যপানের সরঞ্জাম রয়েছে।

‘আমার আর্মার দরকার,’ ইতস্তত না করে বলল কাউন্ট, মোটা ইস্পাতের প্লেট চিরকালই তাকে আকৃষ্ট করে, নিরাপত্তার একটা নিশ্চয়তা এনে দেয়।

‘আমরা আপনাকে এক স্কোয়াড্রন হালকা সিভি থ্রি দেব,’ বলল ফাদ, অর্ডারটা টুকল প্যাডে। সিভি থ্রি মান্ধাতা আমলের বাতিল ট্যাংক, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওগুলোর প্রচলন উঠে গেছে। ইথিওপিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যারা গোপন ষড়যন্ত্রে মেতেছে, নিজেদের পরিচয় আড়াল করবার জন্য টাকা-পয়সা

ইত্যাদি সবই জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের মাধ্যমে খরচ করতে হয় তাদেরকে, তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ ভালভাবেই নিচ্ছে ওরা দু'জন। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র কিনবার মত যথেষ্ট টাকা পেলেও, খুঁজে খুঁজে পরিত্যক্ত অস্ত্র আর আর্মার কিনছে ওরা, বাকি টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা করছে।

'আর এয়ার সাপোর্ট দরকার আমার।'

'ওয়েলস অভ চান্ডিতে আপনার এঞ্জিনিয়াররা কি একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করতে পারবে?' ম্যাপে আঙুল রেখে প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট করল ফাদ।

'এলাকাটা খোলা আর সমতল। তেমন কোন সমস্যা হবে বলে মনে করি না,' আগ্রহের সঙ্গে বলল কাউন্ট। মাই গড!—ভাবল সে।—ট্যাংক, প্লেন, মেশিনগান! এসব পেলে ইতিহাসের পাতা থেকে নেপোলিয়নের নাম পর্যন্ত মুছে দেবে সে।

'এয়ার স্ট্রিপ তৈরি হওয়া মাত্র রেডিও মেসেজ পাঠাবেন আমার কাছে, ক্যাপরোনিস-এর একটা ফ্লাইট পাঠিয়ে দেব। তার আগে ফুয়েল আর আর্মামেন্ট যা লাগে সব পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে, অবশ্য আমার এয়ারফোর্স উপদেষ্টার সাথে কয়েকটা বিষয়ে আলাপ করে নিতে হবে। তবে আমার মনে হয়, একশো কিলো বোমা খুব কাজ দেবে ওখানে। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন।'

'ইয়েস, ইয়েস,' ব্যাকুলকণ্ঠে সায় দিল কাউন্ট।

'আর নাইট্রোজেন মাসটারড-গ্যাস ব্যবহার করতে কোন অসুবিধে নেই তো?'

'না! না! কোন অসুবিধে নেই!' প্রায় চিৎকার করে উঠল কাউন্ট। কিছু পাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা তার স্বভাব নয়। যা

দেওয়া হবে সবই সে গিলবে।

'গুড।' বলল ফাদ, প্যাড আর পেন্সিল রেখে দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। 'পেটে পা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলা উচিত!'

ভয়ানক চমকে উঠল কাউন্ট, বুঝতে পারল না তাকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হলো কিনা। বিড়বিড় করে সে বলল, 'পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।'

'আমরা ইথিওপিয়ায় কমিউনিস্টদের শেষ দেখতে চাই।'

'কোন রকম দয়া দেখানো চলবে না,' গর্জে উঠল কাউন্ট।

'এবার আরেকটা বিষয়।' নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মি. এক্স। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জেনারেল ফাদের দিকে তাকাল সে।

ফাদ হাততালি দিল। স্টাডির দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল একজন দীর্ঘদেহী ইটালিয়ান যুবক।

'সিনর মাস্ত্রোনি–আমার এবং মি. এক্সের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন,' বলল ফাদ। 'পলিটিক্যাল ব্যাপারটা উনি খুব ভাল বোঝেন। সিনর মাস্ত্রোনি, আপনি শুরু করতে পারেন।' কাউন্টের দিকে ফিরল সে। 'সিনর মাস্ত্রোনি আপনাকে ক্ষেত্র-বিশেষে গাইড করবেন।'

সাদা গ্যাবার্ডিনের সুট পরে আছে মাস্ত্রোনি, চেহারায় আভিজাত্য। খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল সে, তারপর শুরু করল, 'এ সিদ্ধান্ত আমাদের যাঁরা মুরুব্বি, তাঁদের। পরিচয় প্রসঙ্গে বৃহৎ শক্তি বলাই যথেষ্ট, আশা করি। তাঁরা চাইছেন, রাসটাফারিয়ান, গালা আর হারারি গোত্রগুলো যে বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস করছে সেখানে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। এই মুহূর্তে এলাকাগুলো কমিউনিস্ট সমর্থক কামাল হাসান আর তার ছেলে হাসান সালের দখলে রয়েছে। যুদ্ধে ওরা হেরে যাবার পর নতুন একজনকে শাসনকর্তা বা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করার

সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

কাউন্ট ঠিক বুঝতে পারল না। আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য স্টাডিরুমে নেচে ওঠা উচিত হবে কিনা। জেনারেল ফাদকে সে তেমন ভয় পায় না, ভয় পায় তার হিংস্র চেহারাটাকে।

'দীর্ঘ আলোচনার পর সমস্ত আয়োজন শেষ করে আনা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ-ধরনের চুক্তিতে কোটি কোটি ডলার খরচ অর্থাৎ হাতবদল করার দরকার পড়ে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপযুক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করবেন, তাঁর বিশাল যোদ্ধা বাহিনী নিয়ে যোগ দেবেন কাউন্ট ডিকানডিয়া বাহিনীর সাথে।'

হতাশায় চুপসে গেল কাউন্ট। 'কে সে? কাকে নতুন গভর্নর নিয়োগ করা হচ্ছে?'

'ভদ্রলোক যে এলাকাটা আংশিক নিয়ন্ত্রণ করেন সেই এলাকাই দখল করার জন্যে লড়ছেন আপনি, কাউন্ট ডিকানডিয়া। আপনি সারডি গিরিসংকট দখল করে সারডি শহরে পৌঁছুনোর পরপরই আমাদের এই গোত্রপ্রধান তাঁর দলবল নিয়ে আপনার সাথে যোগদান করবেন।'

'তার নাম?' আবার জিজ্ঞেস করল কাউন্ট। 'কে সে?'

কিন্তু কথা বলবার নিজস্ব একটা ঢং রয়েছে রাজনৈতিক এজেন্ট মাস্ত্রোনির। 'আপনার দায়িত্ব হবে এই গোত্রপ্রধানের সাথে মিলিত হওয়া, তারপর তাঁর শক্তির সাথে নিজের শক্তি এক করে সেলাসী বাহিনীর সাথে যোগ দেয়া। ভাল কথা, তাঁকে কিছু সোনা দিতে হবে—সে ব্যবস্থাও আপনি করবেন।'

'সোনা? আমি সোনা পাব কোথায়?' আকাশ থেকে পড়ল কাউন্ট।

'রাসটা আর হারারি গোত্রগুলোর কাছে টন টন না হলেও মনকে মন সোনা রয়েছে,' মাস্ত্রোনি বলল। 'ওদেরকে পরাজিত করার পর সেই সোনা এক জায়গায় জড়ো করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। বেশি না, ভদ্রলোককে মাত্র দশ মন দিতে হবে।'

একটা ঢোক গিলল কাউন্ট। 'আর আমি? আমার কী হবে? আমি কী পাব?'

'আপনিই তো পাবেন হীরের টুকরোটা,' বলল জেনারেল ফাদ, কিন্তু ব্যাখ্যা না করে মাস্ত্রোনির দিকে তাকাল সে।

'সম্রাট হাইলে সেলাসীর বর্তমান বিপদ কেটে গেলে আপনাকে নিযুক্ত করা হবে গোটা ইরিত্রিয়ার গভর্নর,' ঘোষণা করল মাস্ত্রোনি।

কাউন্ট অনুভব করল, একসঙ্গে এত আনন্দ ধারণ করবার শক্তি প্রকৃতি তাকে দেয়নি, অনুভব করল তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে, এখুনি একবার বাথরুমে যেতে পারলে খুব ভাল হয়। 'আমি তৃপ্ত, আমি আনন্দিত...,' বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমার আর কিছু জানার নেই...।' ইরিত্রিয়ার গভর্নর, তারমানে রাজা বনে যাবে সে।

কিন্তু মি. এক্স তার হাত ধরে মৃদু টান দিল, বৈঠক এখনও শেষ হয়নি।

'ভদ্রলোক গালা গোত্রের একজন বীর,' বলে চলেছে মাস্ত্রোনি। 'এই মুহূর্তে সারডিতে আপনার বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি, তবে পরিস্থিতি বদলে যাবে...' থামল সে, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে দিল কাউন্টের দিকে। 'চুক্তিপত্রটা পড়ে দেখতে পারেন, তারপর সই করুন, প্লিজ।'

পড়ে দেখবার সময় কোথায় কাউন্টের, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না পারায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। এনভেলাপ থেকে কাগজটা কাঁপা হাতে বের করে ততধিক কাঁপা হাতে সই করল

সে, তার হাত আর স্বাক্ষরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল মাস্ত্রোনি।

তারপর সে অন্য আরেক প্রসঙ্গ তুলল। 'আপনার রিপোর্টে আপনি তিনজন বিদেশীর কথা বলেছেন, কাউন্ট ডিকানডিয়া। যাদেরকে আপনি বুদ্ধিমত্তা চাতুর্য আর অসমসাহসের সাহায্যে বন্দী করেছিলেন, এবং যাদেরকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে আপনি দুশো শিফটাকে মুক্ত করে আনেন।' বলাই বাহুল্য, বন্দী তিনজন ইটালিয়ান সম্পর্কে কাউন্ট তার রিপোর্টে কিছুই লেখেনি। 'তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই মেয়েটি আসলে কমিউনিস্টদের দালাল। জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছে সে, কাজ করে একটা মার্কিন পত্রিকায়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ইউরোপ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আগে থেকেই ছিল এখন নতুন করে যোগ হলো কমিউনিস্টদের সমর্থক। এই মেয়েটার পাঠানো রিপোর্ট এরইমধ্যে প্রচার করা হয়েছে সারা দুনিয়ায়, ফলে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু বাস্তব অসুবিধের মধ্যে পড়তে হতে পারে, তবে এখনই উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণ আমি দেখছি না...।'

'সংক্ষেপ করুন, প্লিজ!' ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানাল কাউন্ট। তার চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ভয়ে ভয়ে, পেটের উপর কোনরকম চাপ যাতে না পড়ে।

'আপনার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকল, কমিউনিস্টদের এই মেয়ে স্পাইটিকে যে-কোন মূল্যে ধরতে হবে। এবং ধরা পড়ামাত্র, ওই এলাকার নতুন গভর্নরের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে। এরপর আপনি আর মেয়েটার ব্যাপারে মাথা

ঘামাবেন না, বুঝতে পারছেন তো? নূর আয়াঙ গালা তাকে নিয়ে যাই করুন না কেন, আপনার সেটা দেখার বিষয় নয়, পরিষ্কার?’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল কাউন্ট, সবাই ধরে নিল এটা তার সম্মতি প্রকাশের ভঙ্গি, আসলে তা নয়–শারীরিক অস্বস্তিবোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় উন্মাদসুলভ আচরণ করছে সে।

‘বাকি দু’জন বিদেশী সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি–ওরা সন্ত্রাসবাদী। ওরা যদি বন্দী হয়, গুলি করে মেরে ফেলতে হবে, গায়েব করে দিতে হবে লাশ।’

‘আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,’ বলল কাউন্ট, চেয়ার ছাড়বার চমৎকার একটা কৌশল পেয়ে সামান্য স্বস্তি বোধ করছে। কনিয়াক ভরা গ্লাসটা ধরল সে, মুখের কাছে তুলে ছেড়ে দিল। ভিজে ইউনিফর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ‘এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন,’ বলে বাথরুমের দিকে ছুটল।

ওয়েলস অভ চান্ডিতে ফিরে আসবার পর দিনকয়েক একটা ঘোরের মধ্যে কাটল কাউন্টের। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় না থেকে, যুদ্ধজয়ের শর্ত পালন না করে, নিজেকে সে ইরিত্রিয়ার গভর্নর হিসাবে প্রচার করে দিল। বিশাল একটা প্রদেশের গভর্নর মানে রাজা, কাজেই তার আচরণে রাজাসুলভ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠল। কোন কাজ করে না, কেউ কোন অপরাধ করুক বা না করুক আশপাশে যাকে পায় তাকেই শুধু দণ্ড দেয়, সময় কাটায় যুবতী মেয়েদের কোলে মাথা রেখে। হপ্তা ছাড়িয়ে যেতে চলেছে নতুন ট্যাংক বহর পৌঁচেছে ক্যাম্পে, সেগুলো সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখাল না। তারপর হঠাৎ একদিন ছ’টা ট্যাংকের সামনে হাজির হলো সে। ট্যাংক বহরের কমান্ডারকে নির্দেশ দিল, ‘চালাও, চালিয়ে দেখাও!’

ট্যাংকগুলো দ্রুতগতি, কুঁজবিশিষ্ট টারিট, ভোঁতা চেহারা ইত্যাদি দেখে তার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি গজাল। কাউন্ট দেখল, ট্যাংকগুলো কোন বাধাই মানে না, আপনগতিতে নিজের পথে যেতে থাকে। একটা ট্যাংকের ভিতর ঢুকবার পর তার মনে হলো, দুনিয়ায় এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হতে পারে না। বাহ্, শিকারে যাবার জন্য এমন চমৎকার বাহন থাকা সত্ত্বেও বসে আছে সে!

কাউন্ট নির্দেশ দিল, 'আয়োজন করো। ইরিত্রিয়ার গভর্নর শিকারে বেরুবেন!'

রাসটা আর হারারিরা ছটফটে, তাদের ধৈর্য নেই বললেই চলে। অল্প ক'দিনের যুদ্ধবিরতিতে একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়ল তারা, রোজই কিছু লোক তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর গবাদি পশু নিয়ে ক্যাম্প ছাড়ল। ছোট ছোট দলগুলো ধীরগতিতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল নিজেদের পাথুরে গ্রামগুলোর দিকে, ঠাণ্ডা আর প্রিয় আবহাওয়ার আশ্রয়ে। বাড়ি মানেই মিষ্টি একটা পরিবেশ, আরাম আর আনন্দ। যাবার সময় সবাই গোত্রপ্রধান কামাল হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিল, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ডাকলেই আবার তারা যুদ্ধ করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। তবু নিজের সেনাবাহিনী এভাবে আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর, একদণ্ডের জন্যও ভুলতে পারলেন না যে তাঁদের পবিত্র জন্মভূমির এক প্রান্তে সদলবলে ওত পেতে বসে রয়েছে শিফটা বাহিনী।

বেশিরভাগই অবশ্য রয়ে গেল, তবে আকারে ছোট হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী বাহিনীর ভিতর উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে

গেল কয়েক গুণ। প্রতি দিনই নতুন নতুন গুজব ছড়াল, কারও সাধ্য নেই সত্যি মিথ্যে যাচাই করে দেখে। রানা আর মাইকেলও কম উদ্বিগ্ন নয়, যার যার ডিপার্টমেন্টে শৃংখলা বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা।

রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে শিফটা ক্যাম্পের কাছাকাছি আরেকবার যেতে হলো রানাকে। গরবিনীকে শিফটারা ক্যাম্পের দিকে কেন টেনে নিয়ে গেছে বোধগম্য হলো না ওর। হুড পরানো বুল'স আই লণ্ঠনের আলোয় আর্মারড কারের পার্টসগুলো এক এক করে খুলল ও, ওকে সাহায্য করল আব্বাস। বেন্টলি এঞ্জিনটা ভাগ ভাগ করে চটের বস্তায় ভরা হলো, গাধাগুলো যাতে বইতে পারে। ভোরের দিকে গিরিসংকটের নীচে ক্যাম্পে ফিরে এসেও থামল না রানা, ভাগ্যদেবীর অচল পার্টস ফেলে দিয়ে নতুন পার্টস ফিট করল। ছোটখাট মেরামত দরকার হলো বাকি দুটো গাড়িরও। কাজ শেষ করবার পর তৃপ্তিবোধ করল রানা, আদিবাসীদের আর্মার শক্তি প্রায় আগের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, তিনটে কার নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি গাড়ি বহু বছর আগে কারখানা থেকে বেরুবার সময় যেমন নিখুঁত ছিল আজও প্রায় তেমনি নিখুঁত।

মাইকেলও ইতিমধ্যে আদিবাসীদের কয়েকজনকে ট্রেনিং দিয়ে ভিকার্স মেশিনগান চালানো শিখিয়ে ফেলেছে। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে সংক্ষিপ্ত একটা কোর্স শেষ করাল সে, ট্রেনারের ভূমিকায় তার সঙ্গে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গানাররাও থাকল। ভিকার্স মেশিনগানের ছত্রছায়া কীভাবে ব্যবহার করতে হবে শেখানো হলো অশ্বারোহী বাহিনীকে, পদাতিক বাহিনীকে শেখানো হলো পিছু হটবার সময়ও কীভাবে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন সম্ভব।

গিরিসংকট ধরে পিছু হটবার পথটা সার্ভে করবার সময় বের করে নিল মাইকেল। প্রতিটি ডিফেন্সিভ পজিশন চিহ্নিত করল সে, গিরিসংকটের খাড়া গায়ে প্রতিটি মেশিনগান নেট আর সাপোর্ট ট্রেঞ্চ তৈরি হওয়ার সময় সশরীরে উপস্থিত থেকে সুপারভাইজ করল। চুলের কাঁটার মত বাঁকা ট্র্যাক ধরে এগোবার সময় প্রতিটি বাঁকে ওদের মুষলধারা গুলিবর্ষণের সামনে পড়তে হবে শিফটাদের, একই সঙ্গে পিছনের ট্রেঞ্চে লুকিয়ে থাকা পদাতিক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে শত্রুপক্ষের পিছু হটবার পথও বন্ধ করে দেবে।

গিরিসংকট বেয়ে উঠবার পুরোটা ট্র্যাক সমান করা হয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাতে আর্মারড কারগুলো পিছু হটতে পারে। সব কাজ শেষ, সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, কিন্তু প্রত্যাশিত হামলা হচ্ছে না বলে সবাই ভারি অস্থির।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নতুন ধরনের একটা গুজব শোনা গেল। গুজবের কোন কমতি নেই, কাজেই কোনটাই তেমন গুরুত্ব পায় না, কিন্তু এটার উৎস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। শিফটা ঘাঁটির উপর রাতদিন নজর রাখছে একদল স্কাউট, তারাই নিজেদের চোখে দেখে এসে রিপোর্ট করল কামাল হাসানের কাছে।

অদ্ভুতদর্শন কয়েকটা বাহন, ঝড়ের বেগে ছোটে, চাকা বা পা কিছুই নেই। বাহনগুলো প্রায় রোজই গোটা মরু চষে বেড়াচ্ছে, খোলা প্রান্তরেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

রিপোর্ট শুনে রানা আর মাইকেলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকালেন কামাল হাসান, জিজ্ঞেস করলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'চাকা নেই,' চিন্তিত দেখাল মাইকেলকে, রানার দিকে ফিরল, উঁচু করল একটা ভুরু। 'কী হতে পারে বুঝতেই পারছ, কী?'

‘পারছি,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তবে নিজেদের গিয়ে একবার দেখে আসা দরকার।’

আকাশে চাঁদ আধখানা হলেও, তার আলোয় ইস্পাতের তৈরি ট্র্যাকের গভীর দাগ পরিষ্কার চেনা গেল মাটিতে। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানা, খুঁটিয়ে দেখল দাগগুলো, উপলব্ধি করল ওর সবচেয়ে ভীতিকর আশংকাটাই সত্যি হতে চলেছে। ওর প্রিয় লৌহমানবীগুলোকে এবার লড়তে হবে ট্র্যাক লাগানো আরও অনেক ভারি বাহনের সঙ্গে। ওগুলোয় কী আছে কল্পনা করে নিল রানা—রিভলভিং টারিট, বড় বোর-এর দ্রুতবর্ষণক্ষম ভারী আগ্নেয়াস্ত্র।

কী ঘটতে পারে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল ও। ভারি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে এল একটা মিসাইল, নিতম্বিনীর সামনের আর্মার ভেদ করে এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে ঢুকল, সব চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেল খোল ভেঙে নিয়ে, যাবার সময় ছাতু করে দিয়ে গেল পথে ক্রুদের যে-ক'জনকে পেল। ‘ট্যাংক,’ বিড়বিড় করে বলল ও। ‘ব্লাডি ট্যাংক!’

‘আমি বলব, আমাদের মধ্যে একজন শ্যেন স্কাউট রয়েছে,’ বলল মাইকেল, চঞ্চলার টারিটে আয়েশ করে বসে রয়েছে সে। ‘নবিস কেউ হলে ধরে নিত দাগগুলোর জন্যে নিশ্চয়ই কোন ডাইনোসর দায়ী—কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি মাসুদ রানাকে ফাঁকি দেয়া অত সহজ নয়।’ কথা শেষ করে চুরুটের শেষ মাথাটা টারিটের পাশে ঘষে নেভানোর জন্য হাত লম্বা করল সে, জানে কাজটা খেপিয়ে তুলবে রানাকে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে সিধে হলো রানা। ‘তোমার আগামী জন্মদিনে উপহারটা পাবে—একটা ছাইদানি।’ রাইফেল, মেশিনগান

বা কামানের গোলাগুলি খেয়ে ওর আর্মারড কার ঝাঁঝরা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ওটার গায়ে জ্বলন্ত তামাক ঘষে নোংরা করলে ওর পিত্তি জ্বলে যায়, জানে সেই উদ্দেশ্যেই কাজটা করা হলো।

'দুঃখিত, ওল্ড চ্যাপ,' অবাধ নিঃশব্দ হাসি ফুটল মাইকেলের ঠোঁটে। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আর কখনও হবে না। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করার লোভ সামলাতে পারিনি। ট্রেনিং পাওয়া আর্টিলারির লোক যদি না হও, তোমার এত লাগে কেন? মেজর বা কর্নেল, কী?'

জবাব না দিয়ে আঙটা ধরে গাড়ির মাথায় চড়ল রানা, হ্যাচ গলে নেমে পড়ল ড্রাইভিং সিটে, এঞ্জিনের আওয়াজ যতটা সম্ভব কম রেখে ছেড়ে দিল চঞ্চলাকে, খোলা প্রান্তর ধরে ধীরগতিতে এগোল ওরা।

সেই পুরনো চিন্তাটা ফিরে এল রানার মাথায়, ওদের তিনজনের কথা ভাবছে, যেমন রোজই ভাবে। অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, মাইকেল যেখানে শুদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবার সুযোগ খুঁজছে সেখানে তার কাছ থেকে অ্যানিকে কেড়ে নেওয়ার মত নির্মম আচরণ ওর দ্বারা সম্ভব নয়। অ্যানিকে সত্যি পছন্দ করে ও, জানে মাইকেল না রানা এই উভয়সংকটসূচক প্রশ্ন নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার দ্বিধায় ভোগাটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। মাইকেলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার পর অ্যানি একটা পবিত্রতা অর্জন করেছে, তারপর নৈতিক কারণেই রানা আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ওদের মিলন আর প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে রানার মনে। ভাল হত যদি এখানেই শেষ হত সমস্যাটা।

রানা সতর্ক হবার পর কয়েক হপ্তা কেটে গেছে। ইতিমধ্যে

বেশ কয়েকবার মাইকেলের অনুপস্থিতিতে রানার তাঁবুতে এসেছে অ্যানি। খোলা প্রান্তরে বা গিরিখাদে কাজ করবার সময়ও রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে মেয়েটা। রানা চেষ্টা করেছে সে যেন মনে কোন আঘাত না পায়। ইঙ্গিতে মাইকেলের প্রশংসা করেছে ও, নিজের বাউণ্ডুলে জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলে ঠকতে হতে পারে। আভাসে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছে অ্যানি, সাড়া না পেয়ে রেগে গেছে সে, এমনকি রানাকে এ প্রশ্ন শুনতে হয়েছে–তুমি কি কাপুরুষ? নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করেছে রানা, হাসি মুখে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। সৎ পরামর্শ দিয়ে বলেছে, যে তোমাকে পেলে উপকৃত হবে, সমস্ত দ্বিধা আর ভাবাবেগ ঝেড়ে ফেলে তার কাছেই যাওয়া দরকার তোমার। কিন্তু অ্যানি বোঝেনি, বা বুঝতে চায়নি। যতই দিন যাচ্ছে, রানার প্রতি ততই ঝুঁকে পড়ছে সে। তবে মাইকেলের প্রতি যে তার টান নেই তা নয়। অ্যানি আর মাইকেলের মধ্যে এখনও কৌতুক আদান-প্রদান হয়। মাঝে মধ্যে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে রানা–ক্যাম্পের উপর খাড়া কোন পাথরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে হাঁটছে, কথা বলার সময় ঝুঁকে আছে পরস্পরের দিকে। দু'দিন একই সময়ে দু'জনেই ওরা ক্যাম্পে অনুপস্থিত ছিল–পুরোটা সকাল। অকস্মাৎ খিলখিল শব্দে অ্যানির হেসে ওঠা, কিংবা অস্ফুট কোন মন্তব্য শুনবার জন্য ঝুঁকে মাইকেলের ঘনিষ্ঠ হওয়া, মাইকেলের শ্রুতিমধুর কৌতুক বা লম্ফঝম্পবহুল অঙ্গভঙ্গি দেখে কৃত্রিম রাগ বা বিস্ময় প্রকাশ করা ইত্যাদি আগের মত নির্ভেজাল আছে, কিন্তু তারপরও অ্যানি মাইকেলকে ডিঙিয়ে রানাকেই যেন পেতে চায়।

অ্যানিকে পরিষ্কার করে কিছু বলা রানার জন্য অত্যন্ত কঠিন।

আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি না বা তোমার প্রেমিক হতে চাই না, এ-ধরনের কথা মুখ ফুটে কেউ বলে না, বলা উচিত নয়।

আর মাইকেলকে সত্যি পছন্দ করে রানা—শুধু পছন্দ নয়, তারচেয়েও বেশি, উপলব্ধি করে ও। দু'জন পুরুষমানুষের গভীর বন্ধুত্ব কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না। মাইকেলের সুদর্শন চেহারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দারুণ উপভোগ করে ও। তার স্মার্ট, পালিশ করা চকচকে বহিরাবরণ, অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট ভূমিকা, বেপরোয়া জীবনদর্শন, কৃত্রিম স্বার্থপরতার নীচে অন্য এক জাতের পুরুষ লুকিয়ে আছে, যাকে সত্যিকার একজন মানুষ হিসাবে চিনতে ভুল হয়নি রানার। তাকে কতটুকু ভালবাসে ও, নিজেও কী জানে?

'সে আমার বন্ধু,' ঠোঁটে ক্ষীণ, বাঁকা হাসি নিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে এগোচ্ছে দক্ষিণ আর পুব দিকে, জানে আকাশের গায়ে লালচে হয়ে থাকা অংশটার নীচেই শিফটাদের ক্যাম্প। 'তাকে আমি ভালবাসি।'

কিন্তু মাইকেল অত্যন্ত চালাক, এরইমধ্যে রানার আচরণে নিরুত্তাপ একটা ভাব লক্ষ করছে সে। আভাসে ইঙ্গিতে জানতেও চেয়েছে, খেলা ভাল জমছে না কেন? এখন যদি সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়, রানা প্রতিযোগিতায় কোন দিন ছিল না বা নেই—বলা যায় না, স্রেফ অ্যানির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে। তার পক্ষে এ-ধরনের আচরণ যে সম্ভব, বেশ বুঝতে পারে রানা। নিলে জিতে নেব, এটা তার শুধু মুখের কথা ছিল না।

কাজেই, সেই পুরনো সিদ্ধান্তটাই বহাল থাকল—আরও কিছু

দিন অভিনয় করে যেতে হবে রানাকে।

এক সময় টারিট থেকে হ্যাচ গলে নীচের দিকে ঝুঁকল মাইকেল, রানার কাঁধে টোকা দিল। 'সামনে, বাঁ দিকে একটা নালা। ওটাতেই বোধহয় কাজ হবে।'

চঞ্চলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, কয়েক সেকেন্ড পর থামল। 'কিন্তু বেশি গভীর,' মন্তব্য করল ও।

'সূর্য ওঠার পর তাতে বরং সুবিধেই হবে, রিজ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাব, আর পুব দিকে গোটা প্রান্তরে চোখ রাখা যাবে।' হাত তুলে শিফটা সার্চলাইটের আভা আর তার সামনের খোলা মরুভূমিটা দেখাল মাইকেল। 'সম্ভবত ওদিকেই রোজ ওরা খেলাধুলো করে। এখান থেকে দেখতে কোন অসুবিধে নেই। এখনই আমাদের আড়াল নিতে হয়, ওল্ড চ্যাপ।'

ওদের প্ল্যান হলো শিফটা স্কোয়াড্রনের গতিবিধি দেখবার জন্য সারাটা দিন ব্যয় করবে, রাতের অন্ধকারে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে ফিরে যাবে ক্যাম্পে। মাইকেলের যুক্তি মেনে নিল রানা, চঞ্চলাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নালার ভিতর নামল। এক সময় থামল ও, আর্মারড কারের শুধু টারিটের খানিকটা অংশ পাড় ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকল, দূর থেকে দেখে চেনা যাবে না। পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকল চঞ্চলা, ওটার সামনে মসৃণ একটা ঢাল, প্রয়োজনের সময় ঢালটা বেয়ে দ্রুত উঠতে পারবে ওরা, হঠাৎ করে পালানোর দরকার হতে পারে।

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাতে কুড়াল নিয়ে খোলা মরুতে হাঁটল দু'জন পাশাপাশি, কাঁটাঝোপ কেটে এনে ঢেকে দিল টারিটের বেরিয়ে থাকা অংশটুকু।

বালি ভর্তি একটা বালতিতে স্পেয়ার ক্যান থেকে গ্যাসোলিন ঢালল রানা, নালার তলায় এনে আগুন ধরাল তাতে। গায়ে

আগুনের আঁচ থাকায় মরুর হিম বাতাস কাঁপ ধরাতে পারল না, ওদিকে কফির জন্য পানিও গরম হচ্ছে। দু'জনেই ওরা চুপচাপ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন। 'আমার মনে হয়, আমাদের একটা সমস্যা আছে,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে।

'যত পিছনেই তাকাই, সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, এই দৃশ্য ছাড়া আর তো কিছু আমি দেখতে পাই না, ওল্ড চ্যাপ,' মৃদুকণ্ঠে বলল মাইকেল। 'তবে কয়েকটা ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করলে–যেমন, অভিশপ্ত একটা মরুভূমিতে আটকা পড়েছি, আশপাশের সঙ্গী-সাথীরা সবাই অসভ্য আর রক্তখেকো খুনী, শিফটা বাহিনীর সাথে শিক্ষিত, সভ্য ইটালিয়ানরাও আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, ক্যাশ হয় কিনা সন্দেহ আছে এমন একটা চেক ছাড়া পকেট খালি, শত মাইলের মধ্যে ভাল কোন মদের বোতল দেখতে পাচ্ছি না, আর শিগ্‌গির পালাবার কোন সম্ভাবনাও নেই ইত্যাদি দেখেও যদি না দেখার ভান করি, তা হলে বলব, ওল্ড চ্যাপ, আমার আকার-আকৃতি এখন পর্যন্ত অবিকৃতই আছে, কাজেই আমিও বেশ সুখে আছি, কী?'

'আমি অ্যানির কথা ভাবছিলাম।'

'আহ্! অ্যানি!'

'তুমি জানো আমি ওর প্রেমে পড়েছি।'

'আমাকে তুমি অবাক করলে,' আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় নিঃশব্দে শয়তানী হাসি হাসল মাইকেল। 'সে জন্যেই কি ভাবাবেগে ভেজা মুখ হাঁ করে হাবার মত ঘুর-ঘুর করছ ক'দিন ধরে, হাম্বা হাম্বা করছ মিলনের মরশুমে ষাঁড় যেমন করে? গুড লর্ড, তুমি না বললে আমার কল্পনাতেও আসত না!'

'আমি সিরিয়াস, মাইকেল।'

'ওটাই তো তোমার এক নম্বর সমস্যা, ওল্ড চ্যাপ। সব কিছুই তুমি অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নাও। তিন ভাগের দু'ভাগ সম্ভাবনা, বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার মনে এরইমধ্যে আইভি লতায় ঢাকা কটেজের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে, কটেজের সামনে সুন্দর বাগান, বাড়ির পিছনে ছোট্ট সুইমিং পুল, অদূরে বিশাল গম খেত, একধারে বনভূমি, খোঁয়াড়ে হাজার দেড়েক গরু-মোষ, পুকুরে বড় বড় মাছ–মিলছে তো, কী?'

'ছবিটা অনেকটা ওরকমই–প্রায়,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'হ্যাঁ ব্যাপারটা সিরিয়াস।'

'এ-ব্যাপারে আর কার কী ভূমিকা? তুমি আর আমি, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?'

বুক পকেট থেকে দুটো চুরুট বের করল মাইকেল, একটা রানার দুই ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিল, শুকনো একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে রানার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। বিদ্রূপাত্মক হাসি খসে পড়েছে তার ঠোঁট থেকে, চিন্তিত গলা, কিন্তু তার মুখের ভাব আগুনের অনিশ্চিত আলোয় বুঝতে পারা কঠিন। 'কর্নওয়ালের কাছাকাছি, জায়গাটা চিনি আমি। দেড়শো একর। ছবির মত সুন্দর পুরনো একটা ফার্মহাউস, অবশ্যই। ছোটখাট কিছু মেরামতের কাজ করতে হতে পারে, নিজের রুচি মত এক আধটু বদলে নেব, তবে শেডের তলায় গরু আর ঘোড়াগুলো ভারি স্বাস্থ্যবান। তুমি জানো, ওল্ড চ্যাপ, নিজের হাতে দুধ দোয়াতে ভালবাসি আমি? জীবনের মজাটা তো গাঁয়েই হে, শিকার করো, মাছ ধরো, গম ফলাও, এলাকার মাথা হয়ে থাকো, সাধারণ মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো। চেক ভাঙিয়ে যা টাকা পাব, তার সাথে ব্যাংক লোন বিয়োগ করে যা দাঁড়াবে, বোধহয় হয়ে

যাবে, কী?'

এরপর দু'জনেই ওরা চুপ করে থাকল, কাপে কফি ঢেলে আগুন নেভাল রানা, নড়েচড়ে মাইকেলের দিকে মুখ করে বসল আবার।

'ব্যাপারটা অতটুকুই সিরিয়াস,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল মাইকেল।

'তা হলে শান্তি বা সমঝোতায় আসার কোন উপায় নেই? ভদ্রলোকের চুক্তি সম্ভব নয়?' ঠোঁটের কাছে মগ তুলে বিড়বিড় করল রানা।

'প্রাণ থাকতে নয়,' বলল মাইকেল। 'সেরা লোকটিকে জিততে দাও, এবং কথা দিচ্ছি প্রিয় গাভীর প্রথম বাচ্চাটার নাম রাখব আমরা তোমার নামের সাথে মিলিয়ে, প্রতিজ্ঞা করলাম।'

আবার ওরা চুপ করে গেল, যে যার নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক, মগে চুমুক দিল, টান দিল চুরুটে।

'দু'জনের একজন ঘুমালে পারি,' এক সময় বলল রানা।

'টস করে দেখা যাক কে ঘুমাবে,' পকেট থেকে সেই মুদ্রাটা বের করে আঙুলের টোকায় শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো মাইকেল।

'হেডস,' বলল রানা।

ছুঁড়ে দিয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে কব্জির উপর মুদ্রাটা থামাল মাইকেল। 'তোমার কপাল মন্দ, ওল্ড চ্যাপ।' পয়সাটা পকেটে চালান করে দিয়ে মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ফেলে দিল সে, নালার নরম বালির উপর একটা কম্বল বিছাল। খানিক পরই তার নাক ডাকবার আওয়াজ পেল রানা।

ভোরে আস্তে করে নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙাল রানা, ঠোঁটে আঙুল রেখে সাবধান করল। দ্রুত সজাগ হলো মাইকেল, চোখ পিট পিট করে ঘুম তাড়াল, দু'হাত দিয়ে সরিয়ে সমান করল মাথার চুল। কোন প্রশ্ন না করে একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়াল সে, চঞ্চলার আড়ালে থেকে পিছু নিল রানার।

আজকের ভোর যেন লাল আর সোনালির নিঃশব্দ বিস্ফোরণ, পুব আকাশের অর্ধেকটা রাঙিয়ে তুলেছে; উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে, নীচের ছায়াগুলো ধূসর-নীল। অস্তগামী আধখানা চাঁদ হাঙরের সাদা দাঁতের মত, পশ্চিম দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে।

'শুনতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, মাথা ঘুরিয়ে নিস্তব্ধ ভোরে কান পাতল মাইকেল।

কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ।

'কী?'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল, চোখে বিনকিউলার তুলল। ধীরে ধীরে রোদ লাগা রিজগুলোর উপর দৃষ্টি বুলাল।

'ওদিকে,' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে বলল রানা, ওর হাত অনুসরণ করে বিনকিউলার ঘোরাল মাইকেল।

কয়েক মাইল দূরে, অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে কালো কয়েকটা বিন্দু সমতল প্রান্তরের ডেবে থাকা একটা অংশে নড়াচড়া করছে। এত দূরে আর ঘন ছায়ার ভিতর যে গ্লাসের ম্যাগনিফায়িং লেন্সেও পরিষ্কার নয়, কাঠামোগুলো ভাল করে চেনা গেল না।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওরা, ওদের সামনে বিশাল শুকনো পুকুর-আকৃতির গর্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে বিন্দুগুলো, ওগুলোর সামনে একটা ঢাল ক্রমশ উঠে গেছে উপর দিকে, সারির প্রথম বিন্দুটা এরইমধ্যে ঢাল বেয়ে

উঠতে শুরু করেছে। কিনারা ছাড়িয়ে উঠে এল সেটা, সোনালি সূর্যের উজ্জ্বল রোদে চকচক করে উঠল গা, কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ধরা পড়ল ওদের চোখে।

‘সিভি থ্রি ক্যাভলরি ট্যাংক,’ ইতস্তত না করে বলল মাইকেল। ‘ফিফটি হর্স পাওয়ার আলফা এঞ্জিন। ফ্রন্টাল আর্মার টেন সেন্টিমিটারস। ঘণ্টায় আঠারো মাইল টপ স্পীড।’ সে যেন ক্যাটালগে চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছে। ‘মোট ক্রু তিনজন—ড্রাইভার, লোডারগানার আর কমান্ডার। যতদূর বুঝতে পারছি, মাউন্টিঙে ওটা ফিফটি-এম এম স্প্যান্ডাউ। এক হাজার গজের মধ্যে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, রেট অভ ফায়ার প্রতি মিনিটে পনেরো রাউন্ড।’

সে থামবার আগেই সামনের ট্যাংকটা রিজ-এর পরবর্তী ঢালের কিনারা দিয়ে নেমে গেল, এক এক করে বাকি পাঁচটা বিন্দুও অনুসরণ করল সেটাকে, ওগুলো অদৃশ্য হবার পর এঞ্জিনের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে মুচকি হাসল মাইকেল। ‘বুঝতেই পারছ, ওল্ড চ্যাপ, আমরা খানিক বেকাদায় পড়ে গেছি। ওই স্প্যান্ডাউগুলোয় রয়েছে রিভলভিং টারিট।’

‘আমাদের আর্মার কারের স্পীড বেশি,’ সোজা-সাপটা বলল রানা; সেই মায়ের মত, যার ছেলেদের তিরস্কার করা হয়েছে।

‘ওই একটাই সুবিধে,’ মন্তব্য করল মাইকেল। ‘আর সব দিক থেকে আমরা নিকৃষ্ট হয়ে গেছি।’

‘ব্রেকফাস্ট চলবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। তারপর অনেকটা আপনমনে বিড়বিড় করল, ‘সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকা!’

টিনের কৌটা থেকে স্টু বেরুল, গরম করা হলো বালতির আগুনে। তারপর কাগজে মোড়া রুটি চায়ের মগে ডুবিয়ে খেলো

ওরা। শেষ করবার আগেই আকাশের অনেকটা উপরে উঠে এল সূর্য।

'শুলাম,' বলে চঞ্চলার খোলের পাশে, ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, হাঁটু ভাঁজ করা আকৃতিটা দেখতে হলো বিশাল এক বাদামি কুকুরের মত।

টারিটের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল মাইকেল, খোলা প্রান্তরের দিকে চোখ, সেদিকে এরইমধ্যে তাপ-তরঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। পালাবদলের সময়টা ভালই বেছেছে বলে নিজেকে অভিনন্দন জানাল সে, রাতে বেশ ক'ঘণ্টা ভাল ঘুম হয়েছে, আর এখন সকালের ঠাণ্ডার ভিতর বসে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আবার যখন রানার পালা শুরু হবে, মুচকি হেসে সে ভাবল, আকাশের নীচে প্রান্তর হয়ে উঠবে জ্বলন্ত তন্দুর, চঞ্চলার খোল হয়ে উঠবে অদৃশ্য আগুন।

'এক নম্বরটাকে দেখতে পাও কিনা দেখো,' বিড়বিড় করল সে, অলসভঙ্গিতে চোখে বিনকিউলার তুলে দিগন্তরেখার উপর দৃষ্টি বুলাল। চুপিসারে এগিয়ে এসে শিফটা টহলদাররা চমকে দেবে ওদেরকে, সে সম্ভাবনা নেই। অভিজ্ঞ সৈনিকের সতর্ক দৃষ্টির সাহায্যে এই জায়গাটি নির্বাচন করেছে সে, চুরুট ধরাবার আগে সেজন্য আরেকবার নিজেকে অভিনন্দন জানাল।

'এবার, জরুরী একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও, মাই ডিয়ার মাইকেল,' আবার বিড়বিড় করল সে। 'তোমার আর্টিলারি নেই, মাইনফিল্ড বা আর্মার-ভেদী গান নেই অথচ এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ধ্বংস করতে হবে—কীভাবে তা সম্ভব?'

সমস্যাটা নিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা মাথা ঘামাল মাইকেল। সমাধান একটা পেল বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে, নির্দিষ্ট একটা জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাংকগুলোর

আসবার উপর। ‘উঁহুঁ, ব্যাপারটা অবাস্তব হয়ে দাঁড়াচ্ছে!’ তারমানে আরও চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আরও এক ঘণ্টা পেরোল। মাইকেল উপলব্ধি করল, একটাই মাত্র উপায় আছে যার সাহায্যে শিফটা ট্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করবার জন্য প্ররোচিত হবে। ‘সেই পুরনো গাধা আর মুলোর গল্প,’ ভাবল সে। ‘এখন শুধু আমাদের একটা মুলো দরকার।’ চট করে রানা যেদিকে শুয়ে আছে সেদিকে একবার তাকাল সে। এই তিন ঘণ্টায় একবারও নড়েনি রানা। দীর্ঘ, ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া বুঝবার উপায় নেই বেঁচে আছে কিনা। রানা এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এতটা গভীর ঘুম ঘুমাতে পারে দেখে কেন কে জানে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করল মাইকেল।

প্রখর রোদ মাইকেলের মাথায় আগুন ঢালছে। লোমকূপ থেকে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, চামড়ায় রয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ মিহি লবণের প্রলেপ। চোখে বিনকিউলার তুলে আবার দিগন্তের দিকে তাকাল সে।

তাপ-তরঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে আছে দিগন্তরেখা, কাছাকাছি রিজগুলোর প্রায় কোন অস্তিত্বই ধরা পড়ল না। গরম বাতাস দ্রুত জায়গা বদল করল, পানির মত ভারি আর পুরু, কোথাও মৃদুমন্দ গতিতে, কখনও দমকা ঝোড়ো স্বভাব নিয়ে; অলসভঙ্গিতে মোচড় খেলো, পাক খেলো ঘূর্ণির মত।

ঘন ঘন চোখ পিট পিট করল মাইকেল, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ফেলে দিল ঘামের ফোঁটা। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল সে। রানার পালা শুরু হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি দেখে মুহূর্তের জন্য কুবুদ্ধি চাপল মাথায়, ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেবে নাকি? রোদের মধ্যে খোলের মাথায় আর গরম চুলোর মাথায় বসে

থাকা একই কথা। আরেকবার ছায়ায় নেতিয়ে থাকা রানার দিকে তাকাল সে। আবার কথাটা ভাবল, দেবে নাকি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে?

এই সময় ভারি, উত্তপ্ত বাতাস অদ্ভুত একটা শব্দ বয়ে আনল। কাঁপা কাঁপা, কোমল একটা শব্দ; অনেকটা যেন মৌমাছির গুঞ্জন। বুঝবার কোন উপায় নেই কোন্ দিক থেকে আসছে, হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে সতর্ক হলো মাইকেল, সমস্ত ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সজাগ। মিলিয়ে গেল আওয়াজটা, আবার ফিরে এল, এবার আগের চেয়ে জোরাল—মাটির বিশৃংখল উত্থান-পতন ও উত্তপ্ত বাতাসের অস্থির আলোড়ন ওর কানের সঙ্গে কৌতুক করছে। আচমকা শব্দের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গেল, ভোঁতা গর্জনের মত, কাঁপিয়ে দিল চারদিকের বাতাস।

গ্লাস জোড়া ঝট করে পুব দিকে ঘোরাল মাইকেল। তার মনে হলো গোটা পুব দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছে আওয়াজটা, পাথুরে তীরভূমিতে পশুসুলভ হিংস্রতা নিয়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়বার মত।

মাত্র এক নিমেষের জন্য নৃত্যরত তাপ-তরঙ্গ সরে গেল সামনে থেকে, ছোট্ট ফাঁকের ভিতর গাঢ় রঙের অস্পষ্ট একটা বিকট আকৃতি দেখতে পেল মাইকেল, আকারে বিশাল, থামের মত মোটা পা নিয়ে অচেনা এক দানব যেন, সম্ভবত তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। পরমুহূর্তে তাপ-তরঙ্গ ঢেকে দিল ফাঁকটুকু, হতচকিত মাইকেলকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল, সত্যিই কি জিনিসটা দেখেছে সে? কিন্তু গর্জনটা তো আর মিথ্যে নয়! আওয়াজটা এখন আকাশ বাতাস সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

'রানা,' ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকল সে, জবাবে আরও বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা, পাশ ফিরে শুলো। টারিট থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিল মাইকেল, লাগল রানার ঘাড়ের পিছনে।

রাগের সঙ্গে ঘুম ভাঙল রানার, ঘুসি মারবার জন্য শক্ত করল মুঠো। 'কী পেয়েছ...!' খেঁকিয়ে উঠল ও।

'এখানে এসো, তাড়াতাড়ি!' রুদ্ধশ্বাসে ডাকল মাইকেল।

'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করে বলল রানা, টারিটের উপর মাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, চোখে গ্লাস তুলে পুব দিগন্তে তাকিয়ে আছে। আওয়াজটা আগের চেয়ে ভারি হয়েছে, গম্ভীর সুরে মেঘ ডাকবার মত, কিন্তু তাপ-তরঙ্গের দেয়াল আর চোখ-ধাঁধানো রোদ এমন নিরেট যে ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল।

'ওহ্ মাই গড!' আর্তনাদ করে উঠল রানা।

অকস্মাৎ বিশাল আকৃতিটা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, লাফ দিল ওদের দিকে। অত্যন্ত কাছে, কুচকুচে কালো আর লম্বা, তাপ-তরঙ্গের ভিতর বলে কাঠামোটা এবড়োখেবড়ো আর কিম্ভূতকিমাকার, প্রতি মুহূর্তে আকার আর আকৃতি বদলে যেতে লাগল—কখনও মনে হলো চারটে মাস্তুল নিয়ে একটা পালতোলা জাহাজ, কালো পালগুলো বাতাসে ফুলে আছে, পরমুহূর্তে আকৃতি বদলে গিয়ে জিনিসটা দেখতে হলো বেঙাচির মত, আলোড়িত স্বচ্ছ পানির মত বাতাসে সাঁতার কাটবার ঢঙে ভাসছে।

'কী ওটা?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল মাইকেল, হাঁপিয়ে উঠল সে।

'কী জানি!' অজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'তবে জিনিসটা শব্দ করছে শিফটাদের এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকের মত, আর তেড়ে আসছে এদিকেই!'

এগারো

শিফটা ট্যাংক স্কোয়াড্রন-এর লিডার ক্যাপটেন লোকটা অত্যন্ত রাগী, তার উপর বেচারার স্বপ্নটা ভেঙে গেছে, ফলে তার ভিতর মাথাচাড়া দিয়েছে অশুভ প্রতিহিংসা।

লোকটা রোমান্টিক, ঝুঁকিবহুল অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনবার ব্যাকুল একটা ইচ্ছা সর্বক্ষণ তাকে তাড়া করে ফিরছে। সব সময় ইস্ত্রি করা আঁটসাঁট ইউনিফর্ম পরে থাকে সে, চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে রাখে, চলাফেরার মধ্যে ক্ষিপ্র একটা ভঙ্গি থেকেই যায়। তার ধারণা ছিল, সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছুবে সে, অসভ্য আদিবাসীদের মিছিলের উপর ট্যাংক চালাবে, বেতন বাদেও লাশ গুণে হাজার দশেক ডলার উপরি আয় করবে, বিজয়ীর বেশে ফিরে যাবে অন্য কোন যুদ্ধে। কিন্তু ওয়েলস অভ চান্ডিতে এসে দেখল, শয়তানের ঔরসজাত একটা মরুতে আটকা পড়েছে সে, যেখানে দিনের পর দিন তার প্রিয় ফাইটিং মেশিনগুলোকে পাঠানো হয় বুনো পশু খুঁজে বের করবার কাজে, সেগুলোকে খেদিয়ে আগে থেকে নির্ধারিত একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হয়, ওখানে উন্মাদ এক কাউন্ট সেগুলোকে গুলি করে মারবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

এতে করে ক্যাপটেনের গর্ব আর যুদ্ধজয়ের অভিলাষ যে পরিমাণে চূর্ণ হলো তার তুলনায় ট্যাংকগুলোর ক্ষতির পরিমাণ—জ্বালানির খরচ, বা হীরের মত শক্ত বালিতে ঘষা খেয়ে ট্র্যাকের ক্ষয়—সামান্যই বলা চলে।

তার পদমর্যাদা ছোট হতে হতে গেমকীপারে নেমে এসেছে, স্রেফ একটা বেয়ারা বানানো হয়েছে তাকে। প্রতিটি দিনের

বেশিরভাগ সময় প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থায় কাটে ক্যাপটেনের, এই অবমাননা তার আর সহ্য হয় না। সম্ভাব্য জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতি সন্ধ্যায় পাগল কাউন্টের কাছে অভিযোগ জানায় সে, প্রতিবাদে মুখর হয়, কিন্তু পরদিন সকালে আবার বাধ্য হয় মরুর উপর হিংস্র পশুদের ট্যাংক নিয়ে ধাওয়া করতে।

ইতিমধ্যে গোটা সাতেক সিংহ আর বুনো কুকুর মারা পড়েছে, তবে নিহত হরিণের সংখ্যা অনেক। খেদিয়ে যখন অপেক্ষারত কাউন্টের কাছে নিয়ে আসা হয়, সব ক'টা আধমরা হয়ে গিয়েছিল, ঘামে ভিজে চকচক করছিল গা, চোয়াল থেকে লালা ঝরছিল, খোলা প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়া খাবার পর তখন ওগুলোর দাঁড়াবার শক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

পশুদের এই দুর্বলতা বা দুর্দশা কাউন্টের শিকার করবার আনন্দে এতটুকু বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি, সে বরং কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে ওগুলোকে যথেষ্ট দৌড় খাটিয়ে ক্লান্ত করবার পরই কেবল তার দিকে খেদিয়ে আনতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি দেখে যে কোন পশু সশব্দে হাঁপাচ্ছে না তা হলে তার খুব রাগ হবে, আর তার রাগ যে কী জিনিস ক্যাপটেনকে সেটা বানানটো সাতার কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে। কাউন্টের চাই সহজ শিকার, আর সুন্দর ফটোগ্রাফ, প্রাণের উপর ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

শিকারের সংখ্যা যত বাড়বে, তত বাড়বে ফটোগ্রাফের সংখ্যা, কাজেই ট্যাংক আসবার পর মহাফুর্তিতে আছে কাউন্ট। কিন্তু ক'দিন যেতেই সমস্যা দেখা দিল, কারণ ডানাকিল মরু অগুনতি বন্যপ্রাণীর ভরণপোষণের সামর্থ্য রাখে না। তাড়া খেয়ে কিছু পশু মারা পড়ল, কিছু পালিয়ে গেল। ভারি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে

উঠল কাউন্ট। ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেনকে ডেকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করল সে, নিজের অজান্তে লোকটার অতৃপ্তি আর প্রতিহিংসা বাড়িয়ে দিল বিপুল পরিমাণে।

বুড়ো মদ্দাটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাপটেন, প্রথমে জ্যান্ত একটা হাতি বলে চিনতেই পারেনি, খোলা প্রান্তরে বিশাল একটা মনুমেন্ট অথবা ক্ষুদে পাহাড় বলে মনে হয়েছিল।

হাতিটা প্রকাণ্ড, ছিন্নভিন্ন কান দুটো প্রাচীন জাহাজের জোড়া পালের মত, চামড়ার অসংখ্য গভীর ভাঁজ একটা জাল বুনে রেখেছে, তার মাঝখানে ছোট ছোট চোখ দুটোয় রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। তার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভাঙা, অপরটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা আর হলুদ, বাঁকের শেষ মাথায় ডগাটা ঘষা খেয়ে খেয়ে, গোল আর ভোঁতা হয়ে আছে।

হাতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে ট্যাংক থামাল ক্যাপটেন, বিনকিউলারের সাহায্যে ওটার আকার আর মতিগতি বুঝবার চেষ্টা করল, তারপর ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা, সরু গোঁফ জোড়ার নীচে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল প্রতিশোধপরায়ণ হাসি, কালো চোখে ঝিক্ করে উঠল অশুভ একটা আলো।

'তা হলে, মাই কর্নেল, শিকার চাই তোমার, তাই না?' আপনমনে ফিসফিস করল সে। 'পাবে, শিকার তুমি পাবে। কথা দিচ্ছি।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে পুব দিক থেকে এগোল ক্যাপটেন, অত্যন্ত ধীর গতিতে ট্যাংকটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল, মাটির উপর যেন একটা পোকা চরছে। কিন্তু সাত ঘাটের পানি খাওয়া হাতির চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়, ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে আসতে দেখল সে। তার কান অসম্ভব চওড়া আর টান টান হয়ে

উঠল, লম্বা শুঁড় বাতাস টানল, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুকে গেল মুখের ভিতর, স্বাদ গ্রহণ করল বাতাসের, নিঃশ্বাস ফেলল উপরের ঠোঁটের ওলফ্যাকটরি গ্ল্যান্ডে, কিম্ভূতকিমাকার আকৃতিটার গন্ধ বুঝতে চায়।

বুড়োটা খুব বদমেজাজী, শিকারীরা তাকে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে কয়েক হাজার মাইল তাড়া করে ফিরেছে, দাগ আর ভাঁজে ভরা তার প্রাচীন পেটের ভিতর তীর, বর্শা আর জ্যাকেট পরানো বুলেটের সংখ্যা কম নয়। এই বয়সে এখন সে শুধু একটু একা থাকতে চায়–যুবতী বা সন্তান উৎপাদনক্ষম হস্তিনীর চাহিদা ফুরিয়েছে তার, শিশু হাতিদের সঙ্গে খেলা করবার মন নেই, ইচ্ছে নেই নেতৃত্ব দিয়ে হাতির পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর, একগুঁয়ে শিকারীর পাল্লায় পড়তে চায় না। নির্জন, প্রায় জনপ্রাণীশূন্য মরুতে সেজন্যই চলে এসেছে সে; শেষ বয়সটা, নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিতে চায়। ধীর গতিতে, থেমে থেমে, ওয়েলস অভ চান্ডির দিকে যাচ্ছে সে, ওখানকার পানি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শেষবার খেয়েছে বুড়ো, তখন ছিল তার যৌবন কাল।

অচেনা আকৃতিটা সগর্জনে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তেল পোড়ার গন্ধ পেল সে, ভারি অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করল। মাথা ঝাঁকাল বুড়ো, বিশাল কান ঝাপটে আরেক দিকের বাতাস নিল শুঁড়ে, একাধারে নালিশ আর হুমকির সুরে ডাক ছাড়ল একটা।

গুড়ি গুড়ি এগিয়ে এল অচেনা আকৃতি, শুঁড় গুটিয়ে বুকের কাছে তুলে আনল বুড়ো, কান দুটো অর্ধেকটা পিছিয়ে এনে ডগাগুলো গুটাল–কিন্তু ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেন বিপদ-সংকেত চিনতে পারল না, যেমন আসছিল তেমনি আসতে থাকল সে।

পরমুহূর্তে হামলা করল হাতি, দ্রুতগতি বিশাল আকৃতি নিয়ে। তার দুই জোড়া পায়ের চাপে মাটির সঙ্গে সেঁটে গেল কাঁটাঝোপ, থর থর করে কেঁপে উঠল মাটি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। দৌড় শুরু করবার জন্য কোন সময় নেয়নি সে, এই বয়সেও তার ক্ষিপ্রতা তাক লাগানোর মত, আর গতিও এত দ্রুত যে এক নিমেষে প্রায় ধরে ফেলল ট্যাংকটাকে।

ধরতে পারলে, দানবীয় সবটুকু শক্তি ব্যবহার না করেই স্রেফ মৃদু একটা ধাক্কায় ট্যাংকটাকে উল্টে দিত সে। কিন্তু ড্রাইভারও তারই মত ক্ষিপ্র, লম্বা করা শুঁড়ের ঠিক নীচে দিয়ে ট্যাংক ঘুরিয়ে নিল সে, তারপর ফুলস্পীডে ছুটল, এক দৌড়ে পার করে দিল আধ মাইল। ধাওয়া করেছিল হাতি, খানিকদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'মাই ক্যাপটেন, দানবটাকে আমি স্প্যান্ডাউ দিয়ে ঘায়েল করি,' অনুমতি প্রার্থনা করল গানার। হাতিটার ধাওয়া উপভোগ করেনি সে।

'না! না!' আনন্দ আর উত্তেজনায় আর বেশি কিছু বলতে পারল না ক্যাপটেন।

'হিংস্র, বদমেজাজী আর খুব বিপজ্জনক,' ক্যাপটেনকে বোঝাবার চেষ্টা করল গানার।

'ঠিক!' খুশিতে হেসে উঠল ক্যাপটেন, তৃপ্তিতে দুই হাতের তালু এক করে ঘষল। 'আমার তরফ থেকে কাউন্টের জন্যে ওটা একটা বিশেষ উপহার।'

ছয়টা ট্যাংকই ব্যবহার করল ক্যাপটেন, এক এক করে ছয়বার হাতিটার কাছাকাছি গেল ড্রাইভাররা। এরপর, ওগুলোকে ধাওয়া করে কোন ফল হচ্ছে না বুঝতে পেরে, বিরক্ত হয়ে সে চেষ্টা বাদ দিল হাতিটা। তার পেট থেকে প্রতিবাদমুখর গুড় গুড় শব্দ বেরিয়ে

এল, মোচড় খেলো লেজ, চোখের পিছনের গ্ল্যানড্ থেকে পানি বেরিয়ে এসে ভিজে একটা মোটা দাগ তৈরি করল ধুলো মাখা গালে, তাড়া খেয়ে ছুটে চলল পশ্চিম দিকে, পিছনে নিয়ে আসছে এক লাইনে ছয়টা ট্যাংক। তবে এখনও সে রেগে আছে।

'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না,' প্রায় নরম সুরে বলল মাইকেল। 'আমি নিজেও ঠিক জানি না বিশ্বাস করা উচিত কিনা। তবে, দৃষ্টিভ্রম যদি না হয়, ওটা একটা হাতি—ছয়টা শিফটা ট্যাংকের একটা স্কোয়াড্রনকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে, সোজা আমাদের দিকে।'

'বিশ্বাস আমিও করি না,' বলল রানা। 'যদিও তুমি যা দেখেছ আমিও তাই দেখেছি—কিন্তু, এ কীভাবে সম্ভব? তারমানে ওটাকে ওরা ব্লাডহাউন্ডের মত ট্রেনিং দিয়েছে! তা কী সম্ভব, নাকি পাগল হতে আর বেশি দেরি নেই আমার?'

'দুটোই সত্যি,' বলল মাইকেল। 'যদি পরামর্শ দেই, লেজ তুলে পালাবার জন্যে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার, তুমি কিছু মনে করবে? তোমার মনে হচ্ছে না, এভাবে ওদের কাছে চলে আসাটা নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ, ওল্ড চ্যাপ, কী?'

লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের সামনে পড়ল রানা।

ড্রাইভারের হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে এল মাইকেল, ব্যস্ত হাতে ইগনিশন আর থ্রটল সেটিং অ্যাডজাস্ট করল। 'অল সেট,' বলল সে, উদ্বিগ্ন চোখে কাঁধের উপর দিয়ে বারবার তাকাল।

এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে হাতি। সমান বেগে আসছে সে, লম্বা পা ফেলে, হাঁটা ও দৌড়ের মাঝামাঝি—একটা গতি, কোনরকম বিরতি বা বিশ্রাম না নিয়ে যে-কোন হাতি এই

ভঙ্গিতে ত্রিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারে।

‘আমাকে সাথে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, কী?’ চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল।

আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল রানা, কিন্তু চঞ্চলা কোন সাড়া দিল না, এমনকী রানাকে উৎসাহ দিয়ে পরের বার একটু কাশলও না।

মূল্যবান একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। দুই হাঁটুতে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাচ্ছে রানা।

‘এই শালার বজ্জাত কারটা...,’ শুরু করল মাইকেল।

রানার আঁতকে ওঠায় কোন কৃত্রিমতা নেই, ঝট্ করে সিধে হলো ও। ‘গাল দিয়ো না, তা হলে কোনদিনই স্টার্ট নেবে না। আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল। ‘বিপদের সময় গোলমাল করতে নেই, লক্ষ্মী সোনা!’ ফিসফিস করল ও, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরাল।

কাঁধের উপর দিয়ে আরেকবার দ্রুত তাকাল মাইকেল। বিপজ্জনক মিছিলটা কাছে, অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে মাথা বের করে একপাশে কাত হলো সে, চঞ্চলার এঞ্জিন-কাউলিঙে আদর করে হাত বুলাল, নরম সুরে বলল, ‘রাগ কোরো না, মাণিক। রাগের মাথায় কী বলেছি ভুলে যাও। এবার হাসো তো, সুন্দরী!’

মাথার উপর ও চারধারে জোড়া ক্যানভাসের পর্দা, একদল শিকারীকে নিয়ে কোলাপসিবল ক্যাম্প চেয়ারে বসে রয়েছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক। টুকরো বরফ সহযোগে ঠাণ্ডা পানীয় আর হালকা নাস্তা পরিবেশন করছে মেস সার্ভেন্টরা, ক্যানভাস অনবরত পতপত করায় মরুর গরম সহ্য করবার মত যথেষ্ট বাতাস লাগছে

গায়ে।

দারুণ খোশমেজাজে রয়েছে কাউন্ট, তার একটা কারণ পেটটা কোন গোলমাল করছে না। ছ'জন অফিসারকে আপ্যায়ন করছে সে, সবাই তারা ভাড়াটে যোদ্ধা, শিফটাদের উপদেষ্টা অথবা বিভিন্ন পদমর্যাদায় কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে—বলাই বাহুল্য, ছ'জনই তারা শ্বেতাঙ্গ। এই মুহূর্তে সবাই তারা শিকারীর পোশাক পরে রয়েছে, সবার হাতের কাছে একটা করে স্পোর্টিং রাইফেল।

'আমার মন বলছে আজ আমরা খুব ভাল শিকার পাব। খেদাড়েদের যেভাবে ভড়কে দিয়েছি, জান-প্রাণ বাজি রেখে খুঁজছে ওরা।' হাসল কাউন্ট, একটা চোখ টিপল, কর্তব্য মনে করে পাল্টা হেসে দায়িত্ব পালন করল অফিসাররা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি আশা করছি...।'

'মাই কাউন্ট! মাই কাউন্ট!' ভূতে পাওয়া লোকের মত দিশেহারা চেহারা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল বানানটো সাতা। 'ওরা আসছে! রিজ থেকে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি!'

'আহ্!' গভীর তৃপ্তির সঙ্গে আওয়াজটা ছাড়ল কাউন্ট। 'চলো তা হলে দেখা যাক আমাদের ট্যাংক বহরের মহৎপ্রাণ ক্যাপটেন আজ আমাদের জন্যে কী নিয়ে আসছে!' সাদা মদ ভর্তি গ্লাসটা তিন চুমুকে শেষ করল সে, তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করবার জন্য শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সাতা, তারপর তার দিকে মুখ করে পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ডিনো যেখানে রোলস-রয়েসের তোবড়ানো গা থেকে ধুলো পরিষ্কার করছে।

ছোট্ট মিছিলটা, কাউন্টের রোলস-রয়েসের নেতৃত্বে, নিচু

রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এল মাচাগুলোর মাঝখানে।

নিচু একটা চওড়া উপত্যকার উপর মাচাগুলো, তৈরি করেছে ইটালিয়ান এঞ্জিনিয়াররা। মোটা বাঁশ এসেছে আসমারা থেকে, লাল মাটি খুঁড়ে অনেক গভীরে পোঁতা হয়েছে সেগুলো, মাচা যাতে কাঁটাঝোপের চেয়ে বেশি উঁচু না হয়। মাচা হলেও, ভিতরে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মাচাকে ঘাসের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে, রোদ ঠেকানোর জন্য, বেড়ার গায়ে গর্ত করা আছে খেদিয়ে নিয়ে আসা পশুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়বার জন্য। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে, তাই ক্যাম্প চেয়ার রাখা হয়েছে একটা করে। একটা মাচাকে শুধু বার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বরফ থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব রকম মদ আর হালকা নাস্তাও পাওয়া যাবে। ল্যাট্রিনের সংখ্যা দুটো—একটা সবার জন্য, অপরটি একা কাউন্টের জন্য। দ্বিতীয় ল্যাট্রিনে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভুল বা ইচ্ছে করে কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না পারে, শুধু ওটার মাথার উপরই রঙিন কাপড়ের পর্দা।

এক সার মাচা, মাঝখানেরটা কাউন্টের। আকারে তারটাই সবচেয়ে বড়, ভিতরে আরাম-আয়েশের আয়োজনও ব্যাপক। মাচার জায়গাটি এমনভাবে বাছা হয়েছে, খেদিয়ে নিয়ে আসা বেশির ভাগ পশু ওটার সামনে দিয়েই যাবে। ইতিমধ্যে তার জুনিয়র অফিসাররা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে দুর্ভাগ্যক্রমে কাউন্টের চেয়ে তাদের কপালে যদি বেশি শিকার জোটে তা হলে কি হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে। কোন ক্লান্ত পশু যদি তাদের সামনে দিয়ে যায়, প্রথম গুলিটা কাউন্ট না করবার আগে অন্য কেউ সেটার দিকে রাইফেল পর্যন্ত তুলতে পারবে না। এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করায় একজন ক্যাপটেনের পদমর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে লেফটেন্যান্ট বানানো হয়েছে, তারপর তাকে

আর অভিযানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আইন অমান্যকারী দ্বিতীয় অফিসারকে চাকুরিচ্যুত করে ফেরত পাঠানো হয়েছে আসমারায়।

হাত আর কোমর ধরে কাউন্টকে রোলস থেকে নামাল সাতা, তিনজন সৈনিক কাঁধে তুলে নিল তাকে, সিঁড়ি বেয়ে তুলে দিয়ে এল মাচায়। স্যালুট করল ডিনো, পিছু হটে রোলস-রয়েসে চড়ল আবার, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেল রিজের উল্টোদিকে।

ক্যানভাস চেয়ারে আরাম করে বসল কাউন্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকেটের বোতাম খুলল সে, বরফে ভেজানো একটা রুমাল নিল সাতার হাত থেকে। কাউন্ট তার মুখ থেকে মিহি ঘাম মুছছে, দামী হুইস্কির একটা বোতল খুলল সাতা, বরফ ভরা বালতিতে আরও কয়েকটা বোতল রয়েছে। হুইস্কি ভর্তি লম্বা গ্লাসটা কাউন্টের সামনে ফোল্ডিং টেবিলের উপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল সাতা। এরপর ম্যানলিকার রাইফেলটা লোড করল, সদ্য খোলা নতুন প্যাকেট থেকে চকচকে কার্টিজ বেরুল।

ভিজে কাপড়টা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল কাউন্ট, বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে তাপদগ্ধ প্রান্তরে তাকাল, তাপ-তরঙ্গের ভিতর ঘাসের চাপড়া আর কাঁটাঝোপগুলো নাচছে। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, বুঝলে সাতা, আজ আমরা শিকার করে ভারি আনন্দ পাব।'

'পাবেনই তো, মাই কাউন্ট!' বিশ্বস্ততার সঙ্গে সায় দিল সার্জেন্ট বানানটো, খর্বকায় শরীর নিয়ে কাউন্টের চেয়ারের পিছনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ধরে রেখেছে ম্যানলিকারটা। 'আনন্দ পাওয়াই তো আপনার কাজ!'

'কাম অন, ডার্লিং,' কর্কশ গলা, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের উপর ঝুঁকে দম

নিল, চিবুক থেকে ঘামের ফোঁটা পড়ল বুকের কাছে শার্টে, এবার নিয়ে বোধহয় একশোবার হ্যান্ডেলটা ঘোরাল রানা। 'স্টার্ট না নিলে আমরা ডুবব, সুইটহার্ট!'

হ্যাচ থেকে চঞ্চলার টারিটে উঠে এল মাইকেল, মরিয়া হয়ে আরেকবার তাকাল পিছন দিকে। অনুভব করল, হঠাৎ কী যেন একটা অচল হয়ে গেল তার পেটের ভিতর, দমটা আটকে গেল গলায়। বিশাল হাতি আর মাত্র দুশো গজ দূরে, হেঁটে আসছে সোজা ওদের দিকে, বিশাল কালো কান বাতাসে ঝাপটা মারছে, কুঁৎকুঁতে চোখ জোড়ায় আক্রোশ আর ঘৃণা।

ওটার ঠিক পিছনে, দু'দিকে ছড়ানো, ধাওয়া করে আসছে শিফটা ট্যাংক বহর। ট্যাংকের নিটোল গোলাকৃতি ফ্রন্টাল আর্মার রোদ লেগে চকচক করছে, শিফটাদের বহুরঙা পতাকা পতপত করছে বাতাসে, প্রতিটি হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আছে কালো হেলমেট পরা ট্যাংক কমান্ডারের মাথা। বিনকিউলার চোখে থাকায় প্রত্যেক কমান্ডারের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল মাইকেল, এত কাছে চলে এসেছে তারা।

আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, চঞ্চলাকে পাশ কাটিয়ে যাবে শিফটা ট্যাংকগুলো। কমান্ডাররা যে ওদেরকে দেখতে পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাতিটা ট্যাংকগুলোকে সরাসরি নালার দিকে টেনে আনছে, চঞ্চলার টারিটে ডালপালা থাকলেও শিফটারা একশো গজের ভিতর চলে এলে ঠিকই চিনতে পারবে ওটাকে।

পালাবার উপায় নেই, আত্মরক্ষারও সুযোগ নেই। শত্রুরা যেদিক থেকে আসছে তার ঠিক উল্টোদিকে মুখ করে রয়েছে ভিকার্স মেশিনগান, সেটা বল মাউন্টিঙের উপর থাকায় এই মুহূর্তে প্রয়োজন মত ঘোরানোও সম্ভব নয়। চঞ্চলার উপর অকস্মাৎ অন্ধ আক্রোশে কেঁপে উঠল মাইকেল, ঝেড়ে একটা লাথি মারল

টারিটে। ‘দুশ্চরিত্রা!’ খেঁকিয়ে উঠল সে, দাঁত চাপল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাগের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল চঞ্চলা, স্টার্ট নিল, সাবলীল যান্ত্রিক শব্দে চালু থাকল কোন বিরতি ছাড়াই।

আঙটা ধরে এক লাফে চঞ্চলার উপর উঠে এল রানা, ভিজে চুল থেকে ঘাম ঝরল চারদিকে, চেহারা লাল, মাইকেলের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে। ‘চঞ্চলা বুঝতে পেরেছে তুমি ওকে আদর করছ!’

‘সব মেয়ের বেলাতেই সাইকোলজিক্যাল একটা মুহূর্ত থাকে, আঘাত বা অপমান তখন অনুকূল ফল দেয়, কী?’ ঠোঁট টিপে হাসল মাইকেল, চেহারায় পরম স্বস্তি, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল টারিটের আশ্রয়ে। হ্যাচ গলে কন্ট্রোলে নেমে গেল রানা।

থ্রটলে চাপ দিল রানা, এক ঝাঁকিতে মাথা থেকে সব ডালপালা ফেলে দিল চঞ্চলা, নালার মেঝেতে আলগা বালির উপর ঘুরতে শুরু করল চাকাগুলো, লাল ধুলোর ভিতর ঢাকা পড়ল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এল আর্মারড কার, খোলা প্রান্তর ধরে ছুটল–লম্বা করা শুঁড়ের ডগা আরেকটু হলে নাগাল পেয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে বুড়ো হাতিটাকে যথেষ্ট খোঁচানো হয়েছে। রাগ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে, এখন তার শুধু উন্মাদ হতে বাকি। আগুনে ঘি পড়লে যা হয়, শুঁড়ের ডগায় নতুন আরেকটা উপদ্রব চঞ্চলাকে দেখে তারও ঠিক সেই অবস্থা হলো। এতক্ষণ দ্রুতবেগে, হন হন করে হেঁটে আসছিল সে, তার বিপুল শক্তি আর সহ্যক্ষমতা এক বিন্দু খরচ হয়নি, কিন্তু এবার সে খেপে গেল। মত্ত হাতির পায়ের ধাক্কায় ভূমিকম্প শুরু হলো, একনাগাড়ে সহস্র বজ্রপাতের শব্দ বেরিয়ে এল তার পেট থেকে। খুলির সঙ্গে সেঁটে গেল কান দুটো, বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকাল শুঁড়টা।

উঁচু নিচু পাথুরে মাটির উপর চঞ্চলার চেয়ে বেশি তার গতি, সচল পাহাড়ের মত আর্মারড কারটাকে ধাওয়া করল সে–বিশাল, রোমহর্ষক, অজেয়।

সতর্ক ক্যাপটেন হাতিটাকে শান্তভাবে খেদিয়ে আনছিল, হাতি তার আসুরিক শক্তি ব্যয় করুক তা সে চায়নি। লোকটার ইচ্ছে, সে তার কমান্ডিং অফিসারের সামনে এমন একটা শিকার পরিবেশন করবে যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অটুট, অথচ মেজাজ উঠে আছে তুঙ্গে।

টারিটে বসে আনন্দে বগল বাজাচ্ছে লোকটা, আপন মনে হাসছে আর মাথা দোলাচ্ছে, কারণ শিকারীদের মাচা আর মাত্র এক মাইল দূরে। এই সময় হঠাৎ তার সামনের মাটি থেকে বিস্ফোরিত হলো ধুলো, ভিতরে একটা আস্ত আর্মারড কারকে ছুটতে দেখা গেল। ক্যাপটেনের ট্যাংকগুলো যদি পুরনো হয়, আর্মারড কারটাকে বলতে হয় প্রাচীন। সামরিক ইতিহাসের সচিত্র বইতে এগুলোর ছবি দেখেছে সে।

কী দেখছে, বিশ্বাস করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। সংবিৎ ফিরল একটা ঝাঁকি খেয়ে। বহুরঙা পতাকা দেখে চিনতে পেরেছে ওটা শত্রুপক্ষের বাহন। 'অ্যাডভান্স!' গর্জে উঠল ক্যাপটেন। 'স্কোয়াড্রন, অ্যাডভান্স!' তরোয়ালের খাঁজে হাতড়াতে শুরু করল সে। 'এনগেজ দ্য এনিমি!'

তার দু'পাশ থেকে সগর্জনে সামনে বাড়ল দুটো ট্যাংক, ক্যাপটেনের ট্যাংককে পিছনে রেখে ধাওয়া করল আর্মারড কারটাকে।

তরোয়াল না পেয়ে, হেলমেট খুলে মাথার উপর সেটা ঘন ঘন দোলাল ক্যাপটেন। 'চার্জ!' গলার রগ ফুলে উঠল। 'ফরওয়ার্ড ইনটু ব্যাট্‌ল্‌!' এতদিনে বেয়ারা অর্থাৎ খেদাড়ের চাকরি থেকে

অব্যাহতি পেয়েছে সে, ফিরে পেয়েছে যোদ্ধার ভূমিকা।

ক্যাপটেনের উত্তেজনা সংক্রমিত হলো অন্যান্য ট্যাংক কমান্ডারদের মধ্যেও। সামনের দুটো ট্যাংকে যারা রয়েছে তাদের নাকের ডগায় ধুলোর মেঘ, লালচে মেঘের ভিতর অতিকায় হাতি, হাতির শুঁড়ের ডগায় আর্মারড কার। ট্যাংক দুটোর ক্রুরা দেখতেই পেল না নীচে পনেরো ফুট গভীর একটা নালা রয়েছে, কিনারা থেকে ঝপ্ করে নেমে গেছে খাড়া গা। ওগুলো এমনভাবে বিধ্বস্ত হলো যেন আকাশ থেকে একশো কিলো বোমা ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় রাইডিং হুইলগুলো ট্যাংক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল, ভারি ইস্পাতের ট্র্যাকগুলো আলগা হয়ে এঁকেবেঁকে উড়ে গেল ঠিক যেন একজোড়া হিংস্র কেউটে। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো রিভলভিং টারিট, সেই সঙ্গে ক্রুদের শরীর কোমরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো প্রায় নিখুঁতভাবে, যেন প্রকাণ্ড এক কাঁচি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

টারিটে কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে মাইকেল দেখল দুটো ট্যাংক অদৃশ্য হয়ে গেল মাটি থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ধুলোর পাহাড় লাফিয়ে উঠল আকাশে। 'দুটো গেল,' চিৎকার করল সে।

'আরও চারটে আছে,' বলল রানা, এবড়োখেবড়ো মাটির উপর দিয়ে চঞ্চলাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। 'কিন্তু জাম্বো জেটের খবর কী?'

'খবর জানতে চেয়ো না!'

মাটি যতই উঁচু-নিচু হোক, কোন বাধাই মানছে না রানার জাম্বো জেট। হাতিটার সামনে আর্মারড কার অনবরত লাফাচ্ছে, ধরা দিয়েও দিচ্ছে না, পিছনে জোড়া ট্যাংকের সংঘর্ষজনিত কর্কশ আওয়াজ, সব মিলিয়ে উন্মাদ করে তুলল তাকে।

‘এখনও সে আমাদের প্রতিবেশী, ঘাড়ে চাপতে চায়,’ ব্যগ্রকণ্ঠে আবার বলল মাইকেল। হাতি ইতিমধ্যে এত কাছে চলে এসেছে যে সেটার দিকে মুখ তুলে তাকাতে হলো তাকে। তাকিয়ে আছে, দেখল বুক থেকে তুলে শুঁড়ের কুণ্ডলী লম্বা করল হাতি, তাকে পেঁচিয়ে টারিট থেকে তুলে নেওয়ার জন্য সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ‘যত জোরে পারো, ওল্ড চ্যাপ! তা না হলে অচিরেই দেখতে পাবে জাম্বো জেট তোমার ঘাড়ের ওপর বসে আছে।’

বারো

‘গর্দভটাকে আমি বারণ করেছি শিকারকে যেন বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া না করে,’ খেঁকিয়ে উঠল কাউন্ট। ‘কতবার বলেছি, সাতা? দশ-বারো বার হবে?’

‘বত্রিশ বার, মাই কাউন্ট!’

‘প্রথম দিকে খুব তাড়া করতে হবে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওগুলো, তারপর শেষ এক মাইল শান্তভাবে খেদিয়ে মাচার দিকে আনতে হবে।’ রাগের সঙ্গে গ্লাসে একটা চুমুক দিল কাউন্ট। ‘লোকটা নেহাতই বোকা, ওর বাপ ছিল বোকা, চোদ্দগুষ্টি ছিল বোকার হদ্দ। জানে না নিজের কী ক্ষতি করছে। তুমি তো জানো, সাতা, আশপাশে বোকা লোক থাকলে আমার সহ্য হয় না, গা

জ্বালা করে।’

‘গায়ে আগুন ধরে যায়, মাই কাউন্ট।’

‘বলতে পারো, লোকটাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়? আসমারায় ফেরত পাঠাব? বরখাস্ত করব? নাকি…,’ কথা শেষ না করে হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল কাউন্ট, কর্কশ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ করে উঠল চেয়ারটা। ‘সাতা,’ বিড়বিড় করল সে, চেহারায় উদ্বেগ ফুটছে। ‘ওদিকে কী যেন অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটছে!’

বেড়ার ফুটো দিয়ে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকল দু’জন। ধুলোর সচল মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর কী যেন দেখে আঁতকে উঠল কাউন্ট।

‘সাতা, এ কি সম্ভব?’ জিজ্ঞেস করল সে, কপালে ঘাম ফুটি ফুটি করছে।

‘না, মাই কাউন্ট,’ সার্জেন্ট বানানটো সাতা আশ্বস্ত করল তাকে, যদিও গলায় তেমন জোর পেল না। ‘দৃষ্টিভ্রম, মাই কাউন্ট। এ সম্ভব নয়।’

‘তুমি ঠিক জানো, সাতা?’ কাউন্টের চাপা কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

‘না, মাই কাউন্ট। ঠিক জানি না।’

‘আমিও না, সাতা। দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?’

‘জিনিসটা দেখতে…,’ গলায় শব্দ আটকে গেল, দ্রুত বার দুই ঢোক গিলল সাতা। ‘বলতে ইচ্ছে করছে না, মাই কাউন্ট,’ ফিসফিস করল সে। ‘আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

ঠিক সেই মুহূর্তে, পলায়নরত আর্মারড কার আর ভূমিকম্পের জন্য দায়ী হাতিটাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে শিফটা ট্যাংক

বহরের ক্যাপটেন ওগুলোর উপর ফায়ার ওপেন করল—গর্জে উঠল পঞ্চাশ এম এম স্প্যান্ডাউ।

বলা উচিত, ওগুলোর উপর নয়, ওগুলোর দিকে গোলাবর্ষণ করল সে। আবার, ঠিক ওগুলোর দিকেও নয়—তার সামনে ধুলোর পাহাড় মোচড় আর পাক খাচ্ছে, সেটার দিকে অর্থাৎ আন্দাজের উপর নির্ভর করে গোলাবর্ষণ করল সে। ধুলো তার দৃষ্টিপথে বাধা তৈরি করেছে, মাঝে মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে গাড়ি আর পশু। লক্ষ্যস্থির করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, কারণ হাতির নাগালের বাইরে থাকবার জন্য আর্মারড কারটা এঁকেবেঁকে ছুটছে, শেলগুলো এমন জায়গায় গিয়ে বিস্ফোরিত হলো যেখানে আর্মারড কার বা হাতি এক সময় ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

'ফায়ার!' হুংকার ছাড়ল ক্যাপটেন। 'কীপ ফায়ারিং!'

তার গানার এক এক করে ছয়টা হাই-এক্সপ্লোসিভ শেল ছুঁড়ল সামনের প্রান্তরে। অন্যান্য ট্যাংকের গানাররা ক্যাপটেনের কামান গর্জে উঠল শুনে উৎসাহিত বোধ করল, তারাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করল তার দৃষ্টান্ত।

আতংক মিশ্রিত দিশেহারা ভাব স্তম্ভিত করে তুলেছে কাউন্ট আর সাতাকে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে, দ্বিতীয় দফার প্রথম শেলটা তাদের মাচার সামনের দেয়ালে লাগল। নরম, ভঙ্গুর ঘাসের বেড়ায় লেগে শেল বিস্ফোরিত হলো না বটে, কিন্তু হাই-এক্সপ্লোসিভ শেলটা ছুটে গেল কাউন্টের বাম কানের আঠারো কি সতেরো ইঞ্চি পাশ দিয়ে। বাতাসের তীব্র শব্দ ও আলোড়নে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো কাউন্ট। পিছনের বেড়া চুরমার করে দিয়ে খোলা প্রান্তর ধরে আরও এক মাইল ছুটে গেল শেলটা, তারপর মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো।

'আমাকে যদি কাউন্টের আর দরকার না হয়...।' অবিশ্বাস্য

ব্যস্ততার সঙ্গে একটা স্যালুট ঠুকল সাতা, নিজেকে সামলে নিয়ে কাউন্ট তাকে বাধা দেওয়ার আগেই পিছনের বেড়ার দেয়ালে সদ্য তৈরি গর্ত লক্ষ্য করে ডাইভ দিল সে, মাটিতে পড়েই প্রাণপণে দৌড়াল।

সাতা একা নয়। প্রতিটি মাচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল শিকারীরা, তাদের সম্মিলিত বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে এঞ্জিনগুলোর কান ফাটানো আওয়াজ, কামানের গর্জন, আর হাতির হুংকার প্রায় চাপা পড়ে গেল।

চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করল কাউন্ট, কিন্তু পা জোড়া তার সঙ্গে বেঈমানী করল, কেউ দেখলে ভাবত বসে বসে লাফ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। মড়ার মত শুকনো সাদাটে অবয়বে মস্ত হাঁ হয়ে আছে মুখ, কিন্তু ভিতর থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। কাউন্ট বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, প্রায় অচল–শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে আর একবার সে শুধু বসা অবস্থা থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারল। লাভের মধ্যে, সামনের দিকে কাত হয়ে পড়ল চেয়ারটা, মাচা থেকে নিক্ষিপ্ত হলো কাউন্ট, নীচের গর্তে পড়ে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো, দু'হাত দিয়ে ঢাকল মাথাটা।

মাটিতে, গর্তের ভিতর পড়ে আছে কাউন্ট, ভাবছে গর্ত থেকে বেরুতে পারবে কিনা, বেরিয়ে ছুটতে পারবে কিনা। এই সময় মাচাগুলোর গায়ে ফুলস্পীডে ধাক্কা খেলো আর্মারড কার, ঘাসের দেয়াল আর বাঁশের খুঁটি পাখির পালকের মত উড়ে গেল চারদিকে, এক লাফে পেরিয়ে গেল গর্তটা। ঘুরন্ত চাকাগুলো কাউন্টের অসাড় শরীর ছুঁতে ছুঁতেও ছুঁলো না, তবে মনখানেক বালি আর কাঁকর মেশানো মাটি ফেলে গেল তার গায়ে।

কাঁপা পায়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে, দাঁড়াবার চেষ্টা করল কাউন্ট, প্রায় সফল হতে চলেছে, এমন সময় অতিকায় বুড়ো হাতিটা সদ্য অস্তিত্ব হারানো মাচার উপর দিয়ে ছুটে গেল। তার একটা প্রকাণ্ড পা কাউন্টের কাঁধ ছুঁলো কি ছুঁলো না, কাঠের উপর করাত চালানোর মত কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, গর্তের ভিতর আবার মুখ থুবড়ে পড়ল সে। হাতির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আগের মতই দূরদিগন্ত লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে সে, এখনও ধাওয়া করছে আর্মারড কারটাকে।

মাটি কাঁপতে শুরু করে জানিয়ে দিল আরও একটা ভারি কিছুর আগমন ঘটতে যাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে আরও ভিতরে ঢুকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল কাউন্ট—কানে তালা লেগে গেছে, মাথা ঘুরছে, আতংকে পঙ্গু। এই অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না সে, হঠাৎ দেখল গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাংক বহরের কমান্ডার অর্থাৎ ক্যাপটেন, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করল, 'শিকার উপভোগ্য হয়েছে তো, মাই কর্নেল?'

আরও অনেক পরে ফিরে এল বানানটো সাতা, অতি কষ্টে গর্ত থেকে তুলল কাউন্টকে, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল, ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল রোলস-রয়েসে। পুরোটা সময় ভয়ে ভয়ে থাকল সাতা, তার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ একনাগাড়ে অশ্লীল গালিগালাজ আর রোমহর্ষক হুমকি দিয়ে চলেছে কাউন্ট, কার বাপের সাধ্যি তার সামনে দাঁড়ায়।

ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কাউন্টকে গাড়িতে তুলবার সময় সাতাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল সে, কাউন্ট মার মার করে উঠল, 'খবরদার, আমাকে ছুঁয়ো না! আমার গায়ে তোমার মত কাপুরুষের ছোঁয়া লাগলে কবরে আমার চোদ্দপুরুষের শান্তি বিনষ্ট হবে। তোমাকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে

অভিযুক্ত করা হলো! তুমি দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছ! বানরের লেজের তলায় যে ফুটো থাকে, তুমি তাই!’

রোলস-রয়েসে তোলা হলো কাউন্টকে, গাড়ি ছেড়ে দিল ডিনো। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কাউন্ট, ক্যাপটেনের দিকে থুথুর কণা ছিটিয়ে আবার শুরু করল, ‘তুমি যুগের কলংক! তুমি ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট! আমি তোমার জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থা করব…।’ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তার চিৎকার, রিজ বেয়ে উঠে পড়ল রোলস-রয়েস, শিফটা ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বহু দূর থেকেও দেখা গেল আকাশের গায়ে হাত ছুঁড়ছে কাউন্ট ডিকানডিয়া।

ওদের পিছু নিয়ে মরুর আরও বহু পথ পেরিয়ে এল হাতি, অনেক আগেই পিছিয়ে পড়া ট্যাংক বহর তার নাগাল পাবার আশা ত্যাগ করেছে। শেষ এক মাইল পেরোবার সময় আর্মারড কারের সঙ্গে তার দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়ল, অবশেষে সে-ও শুঁড়ের প্যাঁচে মাইকেল সেভারসকে জড়িয়ে নেওয়ার আশা ত্যাগ করল, দাঁড়িয়ে পড়ল খোলা প্রান্তরের মাঝখানে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বিশাল আকৃতি এদিক ওদিক দুলছে, যদিও এখনও কান ঝাপটাচ্ছে সে, সবেগে শূন্যে তুলে দিচ্ছে শুঁড়—শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানোর তার এই ভঙ্গি অনেকটাই ক্রোধোন্মত্ত মানুষের সঙ্গে মিলে যায়।

নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে হাতিকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে আর্মারড কার, টারিটের পাশে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তাকে স্যালুট করল মাইকেল। তারপর দুটো চুরুট ধরাল সে, হ্যাচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকল, একটা চুরুট ধরিয়ে দিল রানার হাতে। ‘দিনটাকে স্বর্ণ ডিম্বপ্রসবিনী বলা যেতে পারে, ওল্ড চ্যাপ,

কী? ইস্পাতের একজোড়া দানবকে প্র্যাং করে দিয়েছি, বাকিগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছি সুস্থ মানসিকতা!'

'কী রকম?' ব্যাখ্যা দাবি করল রানা, কৃতজ্ঞচিত্তে টান দিল চুরুটে।

'এরপর ট্যাংকম্যানরা আমাদের দেখলে, পরিণতির কথা ভেবে ইতস্তত করবে না–ভাদ্রমাসে মরদগুলো আমার মাদী কুকুরটাকে যেভাবে তাড়া করে, ওরাও সেভাবে আমাদের পিছু নেবে।'

'তোমার ধারণা, আমাদের জন্যে সেটা শুভ হবে?' চোখে অবিশ্বাস, প্রশ্নটা করবার জন্য মুখ থেকে চুরুট নামাল রানা।

'তবে আর বলছি কী!' রানাকে আশ্বস্ত করল মাইকেল।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল, দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী। তারপর জিজ্ঞেস করল ও, 'প্র্যাং? কী ধরনের শব্দ হলো ওটা?'

'টুপ করে এইমাত্র মনে পড়ল,' বলল মাইকেল। 'অর্থবহ, কী?'

খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে কাউন্ট, পরনে শুধু সিল্ক আন্ডারঅয়্যার, তাতে বংশমর্যাদার নিদর্শনগুলো লাল আর নীল সুতো দিয়ে বোনা।

তার নরম, ফ্যাকাসে, দাগহীন শরীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, আঁচড়ের দাগে ভরা, চামড়া লাল হয়ে আছে, ক্ষতগুলো থেকে ঝরছে দামী রক্ত।

একাধারে ব্যথা ও আরামে গোঙাচ্ছে কাউন্ট–শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে তার উপর ঝুঁকে রয়েছে বানানটো সাতা, কাউন্টের পিঠ আর পায়ের পিছনে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাচ্ছে সে, মাঝে

মধ্যে ম্যাসেজের সাহায্যে শিথিল করবার চেষ্টা করছে পেশীগুলো।

'আরেকটু আস্তে, সাতা। বুঝতে পারছ না, আমি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছি!'

'অত্যন্ত দুঃখিত, মাই কর্নেল,' কাতর কণ্ঠে বলল সাতা। কাউন্ট আবার গোঙাতে শুরু করল, মোচড় খেলো বিছানার উপর। নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে সাতা, কিন্তু চেহারায় ব্যাকুলতা নিয়ে কী যেন ভাবছে সে।

'মাই কর্নেল, আমি কি কথা বলতে পারি?' হঠাৎ এক সময় অনুমতি প্রার্থনা করল সার্জেন্ট।

'না,' ধমকে উঠল কাউন্ট। 'শেষবার যথেষ্ট উদারতার সাথে তোমার বেতন পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। না, সাতা, বেতন প্রসঙ্গে তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।'

'মাই কর্নেল, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। এমন একটা বিপদের সময়ে বেতনের মত তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'শুনে ভারি খুশি হলাম, সাতা।' ব্যথায় উহ্ করে উঠল কাউন্ট। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওখানটায়, ভাল করে ডলো...ভাল করে!'

কাউন্টের কাঁধ ডলতে ডলতে, কয়েক সেকেন্ড পর, আবার মুখ খুলল সাতা। 'আপনি যদি ইটালিয়ান বীর জেনারেলদের জীবনী পড়েন, তা হলে দেখতে পাবেন, জুলিয়াস সীজার ও...ও...ও,' তোতলাতে শুরু করল সে, অপক্ষোকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অন্য কোন বীরের নাম উল্লেখ করতে চায়, কিন্তু নাম খুঁজে পাচ্ছে না। '...ও...ঠিক আছে, জুলিয়াস সীজারকেই উদাহরণ হিসেবে ধরুন।'

'বেশ।'

'এমনকি স্বয়ং জুলিয়াস সীজারও নিজের হাতে তরোয়াল ঘোরাননি। সত্যিকার গ্রেট কমান্ডাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা পরিচালনা করেন, প্ল্যান দেন, আদেশ করেন–নিকৃষ্ট মরণশীলদের।'

'তা ঠিক, সাতা।'

'যে-কোন একটা চাষাও তরোয়াল ঘোরাতে বা বন্দুক চালাতে পারে–কিন্তু নেহাতই গাধা-গরু ছাড়া আর কী বলা যায় তাদের, আপনিই বলুন?'

'তাও সত্যি।'

'নেপোলিয়ানের কথাই ধরুন না, কিংবা ধরুন...' আবার আমতা আমতা করে থেমে গেল সাতা।

'আচ্ছা, নেপোলিয়ান হলেই চলবে–তার কথাই ধরলাম,' উৎসাহ দিল কাউন্ট।

'তিনি যখন যুদ্ধ করলেন, সংঘর্ষের জায়গা থেকে দূরেই থাকলেন, একবারও কাছে ভিড়লেন না। ইতিহাসে আমরা পাই নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছিলেন, ওয়াটারলু-তে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ছিল? দু'জনের মাঝখানে ছিল কয়েক মাইলের ব্যবধান। তারা নিজেদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন...।'

'তুমি আসলে ঠিক কী বলতে চাইছ, সাতা?'

'মাফ করবেন, মাই কর্নেল–আমার আবেদন, আপনার সাহস যেন আপনাকে অন্ধ করে না দেয়; আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, শত্রুরা আপনার নাম শুনলেই আধমরা হয়ে যায়, কাজেই সত্যিকার একজন কমান্ডারের দূরে সরে থাকার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আপনারও উচিত...,' দীর্ঘ বাক্যটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গঠনরীতি বদলে প্রশ্নাকারে শেষ করল সে, '...মাই

কর্নেল, আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি?'

অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনার সঙ্গে কাউন্ট কী বলে শুনবার অপেক্ষায় থাকল সাতা। কথাগুলো বলবার জন্য সবটুকু সাহস একত্রিত করতে হয়েছে তাকে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে, কথাগুলো শুনবার পর কাউন্ট যদি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়, তাও ভাল, তবু কাউন্টের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে যাবে না। কাউন্টের পাশেই তার জায়গা, কাউন্টকে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা যায় তা হলে তারও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

'প্লিজ, মাই কাউন্ট। আপনি আমাদের দিকেও একটিবার মুখ তুলে তাকান! ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি কিছু হয়, আমরা স্রেফ এতিম হয়ে যাবো! মহাপরাক্রমশালী বীরদের মত আপনিও নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে ভাবুন...।'

কাউন্টের মনের কথাই বলেছে সাতা, সে-ও গত ক'দিন ধরে ভাবছে কোন অজুহাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকা যেত! পৈত্রিক প্রাণের উপর কার না মায়া আছে। 'সাতা,' কাউন্ট বলল, 'তুমি একজন দার্শনিক।'

বিনয়ে বিগলিত হলো সাতা। 'আপনি আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছেন, মাই কাউন্ট।'

'না, সাতা! না! এ তোমার ন্যায্য পাওনা! হতে পারে তোমার জন্ম হয়েছে রাস্তার ধারে বা নর্দমার পারে, কিন্তু তুমি একটা প্রতিভা।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নত করল সাতা।

'আমার সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি আমি অন্যায় করেছি,' বলল কাউন্ট। তার বেদনাকাতর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল, উদ্ভাসিত

হয়ে উঠল মুখ, চোখে জ্বলে উঠল কীসের যেন একটা আলো, সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েদীর চোখেই সচরাচর দেখা যায় আলোটা। 'এতদিন আমি শুধু নিজের কথাই ভেবেছি–নিজের গর্ব, নিজের সম্মান। বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, বিপদের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মৃত্যুর মুখে, ভেবে দেখিনি কী মূল্য দিতে হতে পারে। একবারও মনে পড়েনি আমি না থাকলে আমার সাহসী যোদ্ধারা এতিম হয়ে যাবে, নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল সাতা। 'আপনার বিকল্প কোথায় পাব আমরা?' প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থা হলো তার।

'সাতা।' পিতাসুলভ নরম সুরে ডাকল কাউন্ট, সাতার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাকে আরও কম স্বার্থপর হতে হবে।'

'মাই কাউন্ট, শুনে কী যে আমার আনন্দ হচ্ছে সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না!' কেঁদেই ফেলল সাতা, চান্ডি ক্যাম্পে নিরাপদে সময় কাটানোর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, ভাবতেও পারেনি সে। 'আপনার কাজ হলো কমান্ড করা।'

'প্ল্যান দেয়া,' বলল কাউন্ট।

'পরিচালনা করা,' কাঁদতে কাঁদতে হাসল সাতা।

'আমার ভয়, এটাই আমার নিয়তি।'

'ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব।' উত্তেজনায় খাটিয়ার উপর বসে পড়েছিল কাউন্ট, তাকে ধরে ধীরে ধীরে আবার শুইয়ে দিল সাতা।

'সাতা,' বলল কাউন্ট। 'শেষবার তোমার বেতন নিয়ে কবে আমরা আলোচনা করি বলতে পারবে?'

'অনেক মাস পেরিয়ে গেছে, মাই কাউন্ট।'

'এসো, বিষয়টা নিয়ে এখুনি আলোচনাটা সেরে ফেলি,' বলল কাউন্ট। 'তুমি তো একটা রত্ন–অমূল্য! ধরো, আরও এক হাজার

লিরা, প্রতি মাসে?’

‘মনে উঁকি দিয়েছিল দেড় হাজার লিরার কথা,’ সকরুণ সুরে বিড়বিড় করল বানানটো সাতা।

লজ্জার লেশমাত্র নেই, বানানটো সাতার আবিষ্কৃত সামরিক দর্শন নিজের বলে চালিয়ে দিল কাউন্ট ডিকানডিয়া। সেদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে তার অফিসাররা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করল কাউন্টকে, মদ আর ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করল সে। শিফটা বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনার ধারণাটি শুধু যে বাস্তবসম্মত তাই নয়, ভারি উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। অফিসারদের উৎসাহ হঠাৎ করে ভাটা পড়ল যখন তারা জানতে পারল যে নতুন দর্শন তাদের কারও জন্য প্রযোজ্য নয়, একা শুধু কাউন্টের বেলায় খাটবে। বাকি সবাইকে ঈশ্বরের পবিত্র নামে আত্মবলি দেওয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ অকৃপণভাবে দান করা হবে। বলাই বাহুল্য, এই পর্যায়ে দর্শনটির জনপ্রিয়তা সর্ব নিু পর্যায়ে নেমে এল।

সবশেষে, বেশিরভাগ প্রতিবাদ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে, কাউন্ট সিদ্ধান্ত দিল–নতুন দর্শন মাত্র তিনজনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তার আর সাতার নামের সঙ্গে আরেকটা নাম যোগ হলো, মেজর লুইগি রাকা। এখন থেকে এই তিনজনই থার্ড ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেবে।

নতুন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে খুশি হলো মেজর লুইগি রাকা। এতদিন শিফটা বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে নামকাওয়াস্তে ছিল সে, কাউন্ট নাক গলানোয় যুদ্ধ পরিচালানায় তেমন কোন ভূমিকা সে রাখতে পারেনি। নতুন দর্শনের কথা

শুনেই সে বুঝতে পারল, ভয়ে গা বাঁচাতে চাইছে কাউন্ট। সে ভাবল, এই সুযোগটাই নিতে হবে তাকে। কাউন্টকে পিছিয়ে থাকবার উৎসাহ দিয়ে সুযোগ মত নিজে সামনে এগিয়ে আসবে সে, শিফটা বাহিনীকে নিজের খুশিমত পরিচালনা করবে। বুদ্ধিটা তাকে এতই আত্মহারা করে তুলল, নিজের তাঁবুতে ফিরল সে বগলের তলায় এক বোতল স্থানীয় তেজ নিয়ে।

পরদিন সকালে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে বাহিনীর সামনে উপস্থিত হলো মেজর, তার চোটপাট আর মারমুখো ভাব দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শিফটারা। সাত সকালেই দেখা গেল, মেজরের নির্দেশে সৈনিকরা তাদের রাইফেল পরিষ্কার করতে বসেছে। ইউনিফর্মের তামার বোতাম ঘষে মেজে চকচকে করা হলো, গলার কাছে শেষ বোতামটিও লাগাতে হলো সবাইকে। কাজের সময় কেউ সিগারেট ধরাতে পারল না, নির্দিষ্ট সময়ের পর ল্যাট্রিনের দিকে কাউকে যেতে দেখা গেলে বাধা দেওয়া হলো, এমনকী প্রস্রাব করবার সময়ও বেঁধে দেওয়া হলো, প্রতি ছ'ঘণ্টায় একবার। বাহিনীর প্রতিটি গ্রুপের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল মেজর রাকা, দায়িত্ব আর কাজ ভাগ করে দিল সবাইকে। মোটা ছড়ি দিয়ে দু'চার ঘা লাগাল দু'একজনকে, স্রেফ কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য।

বিকেলে অনার গার্ডদের প্যারেড প্রত্যক্ষ করল মেজর। সদ্য তৈরি এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় থামল তারা, বিমানবহরের প্রথম চালান হিসাবে একটা প্লেন আজ আসবার কথা। অনুষ্ঠানে কাউন্ট ডিকানডিয়াও উপস্থিত।

ওটা একটা ক্যাপরনি বম্বার, এঞ্জিনের সংখ্যা তিন। উত্তর আকাশের কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে উড়ে এল সেটা, কাঁচা মাটির দীর্ঘ রানওয়ের উপর বার কয়েক চক্কর দিল, তারপর লাল ধুলোর ঝড় তুলে নেমে এল নীচে।

রূপালি ফিউজিলাজ থেকে প্রথমে নামল জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের রাজনৈতিক প্রতিনিধি, সিনর মাস্ত্রোনি। পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা লিনেনের সুট, ভাবগম্ভীর চেহারা। কাউন্ট অপেক্ষা করে থাকল, তার ধারণা মাস্ত্রোনি তাকে স্যালুট করবে। কিন্তু তা করছে না অথচ সময়ও বয়ে চলেছে, ধৈর্য হারিয়ে সে-ই মাস্ত্রোনিকে ঠকাস করে স্যালুট করল। এতক্ষণে ক্ষীণ হাসি ফুটল মাস্ত্রোনির ঠোঁটে–কাউন্টের মত সে-ও অপেক্ষা করছিল। স্যালুটের উত্তরে মাথার পানামাটা দু'আঙুলে ধরে সামান্য একটু উঁচু করল, তারপর মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে পাইলটের দিকে ফিরল কাউন্ট। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিল সে, 'আমি তোমার মেশিনে চড়তে চাই।' ইতিমধ্যে ট্যাংকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে, প্রকৃতপক্ষে ট্যাংক বহর আর তার ক্যাপটেনের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে তার।

মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার পর ক্যাপটেন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদলেছে কাউন্ট। তাকে বহিষ্কার করেনি, আসমারায় ফেরত পাঠায়নি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনেও দাঁড় করায়নি–লোকটার জন্য আরও ভীতিকর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সে। ক্যাপটেনের সার্ভিস রিপোর্টে দু'পৃষ্ঠা জুড়ে অভিযোগ আর দুর্নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এর মত অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেয়াদপ, কাপুরুষ ক্যাপটেন জীবনে কখনও দেখেনি কাউন্ট। কাউন্ট জানে, লোকটার ক্যারিয়ার ধ্বংস করবার জন্য এই রিপোর্ট জাদুমন্ত্রের মত কাজ করবে। মনের মত প্রতিশোধ নিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করেছে সে, তবে ট্যাংক সম্পর্কে তার আর কোন আগ্রহ নেই। এখন তার অধীনে একটা প্লেন

পাঠানো হয়েছে। প্লেনে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা অত্যন্ত উত্তেজক আর রোমান্টিক অভিজ্ঞতা হবে, সন্দেহ কী!

'এনিমি পজিশনের ওপর দিয়ে উড়ে যাব আমরা,' আবার বলল কাউন্ট, 'মাটি থেকে যথেষ্ট ওপর থাকব, সম্মানসূচক একটা দূরত্ব অবশ্যই থাকা উচিত।' আসলে সে বলতে চাইছে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে প্লেনটাকে।

'পরে,' বলল মাস্ত্রোনি, তার কথার মধ্যে এমন কর্তৃত্বের সুর ফুটল যে মর্যাদাসচেতন কাউন্টের শিরদাঁড়া ঝট করে খাড়া হয়ে গেল। লোকটার দিকে কটমট করে তাকাল সে।

'জেনারেল ফাদ ও মি. এক্সের ব্যক্তিগত বার্তা বহন করছি আমি,' বলল মাস্ত্রোনি, কাউন্টের আগুনে দৃষ্টি গ্রাহ্যই করল না।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল কাউন্ট আর তার মর্যাদাবোধ। 'তা হলে এক গ্লাস ওয়াইন,' বিড়বিড় করে বলল সে, মাস্ত্রোনির হাত ধরে অপেক্ষারত রোলস-রয়েসের দিকে এগোল।

'প্রিন্স হাসান সালেকে সম্রাট হাইলে সেলাসী গৃহবন্দী করে রেখেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একজন কমিউনিস্ট। কিন্তু গৃহবন্দী থাকলেও, গুজব রটেছে যে প্রিন্স নাকি সামরিক সাহায্য চেয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে গোপন বার্তা পাঠিয়েছে। তার বার্তায় সম্ভবত কাজও হয়েছে, কমিউনিস্টদের বিরাট একটা বাহিনী উত্তর থেকে রওনা হয়েছিল আগেই, তারা ডেসি রোড হয়ে লেক টানার দিকে যাবে সেলাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গেরিলাদের সাথে মিলিত হবার জন্যে—ধারণা করা হচ্ছে, ডেসি রোডে পৌঁছে দু'ভাগে ভাগ হবে তারা, এক ভাগ চলে আসবে সারডিতে, প্রিন্স হাসানের বাবা কামাল হাসান আর তার আদিবাসী বাহিনীকে শিফটাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য। ভয়ের কিছু

নেই, কমিউনিস্ট বাহিনীকে ধাওয়া করে ধ্বংসের জন্যে শিফটাদের আরেকটা বাহিনী উত্তরে আদাজল খেয়ে লেগেছে। তবে তারা যদি ডেসি রোডে পৌঁছুতে সমর্থ হয়, তা হলে আপনার এবং এই এলাকার ভাবী গভর্নর নূর আয়াঙ গালার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। কী করতে হবে আপনি জানেন।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে মাস্ত্রোনির কথাগুলো শুনল কাউন্ট, দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'খুব ভাল করে জানি।'

'ডেসি রোডে কমিউনিস্টদের বাধা দেয়ার জন্যে নূর আয়াঙ গালার সাহায্য দরকার আমাদের। আমি এসেছি তার সাথে আপনার একটা চুক্তি তদারক করতে। সে আর তার বাহিনী যদি আপনাকে সাহায্য করে, সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে কমিউনিস্ট বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্যে আপনিও অ্যাডভান্স করতে পারবেন। এবার, দশ মন সোনার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। কোথায় সেটা?'

'কথা ছিল আদিবাসীরা পরাজিত হলে তাদের স্বর্ণালংকার লুঠ করা হবে,' বলল কাউন্ট। 'কিন্তু প্লেন পৌঁছুতে দেরি হওয়ায় এখনও আমরা আক্রমণে যেতে পারিনি...।'

'মি. এক্স ও জেনারেল ফাদ জানতেন সোনা সংগ্রহে ব্যর্থ হবেন আপনি, তাই তাঁরা কয়েক বাক্স সোনার বার পাঠিয়ে দিয়েছেন–মন পাঁচেক হবে,' বলল মাস্ত্রোনি। 'এবার শুনুন, জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করার কী আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকজন লোক আমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে পাহাড়ে, তারাই জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোনার বাক্স হস্তান্তর করব। আজ রাতেই বৈঠক। গাইড হিসেবে লোক

আছে আমার সাথে। বৈঠকের স্থান ঠিক করা হয়েছে এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে, সন্ধ্যার পরপরই রওনা হব আমরা। মাঝরাতে বৈঠক, আশা করি সময়মতই পৌঁছুতে পারব।'

'ভেরি গুড,' খুশি মনে বলল কাউন্ট। 'সৈনিক বা ট্রাক যা লাগে সব আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।'

ট্রাফিক পুলিশের মত একটা হাত তুলল মাস্ত্রোনি। 'মাই ডিয়ার কর্নেল, জনাব নূর আয়াঙের সাথে দেখা করার জন্যে আমাদের যে প্রতিনিধিদল যাচ্ছে, আপনিই তার নেতৃত্ব দেবেন।'

'অসম্ভব!' এত সহজে তার নতুন দর্শন বিসর্জন দিতে রাজি নয় কাউন্ট। 'এখানে আমার কত কাজ, আক্রমণের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে।' সময়সীমা মধ্যরাত, স্থান বিপজ্জনক ডানাকিল মরু, কে জানে নতুন কী বিপদ ওত পেতে আছে ওখানে!

'চুক্তিপত্রে আপনাকে সই করতে হবে, সহযোগিতার এই নতুন দুয়ার খুলতে হলে আপনার শারীরিক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, বুঝতে পারছেন না? আপনার ইউনিফর্ম গালাদের প্রভাবিত করবে...।'

'আমার কাঁধ!' হঠাৎ ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কাউন্ট। 'এমন আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার আমাকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে! আমার বদলে আমার একজন অফিসার যাবে। ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন। তার ইউনিফর্ম আমার চেয়ে কোন অংশে কম...।'

মাথা নাড়ল মাস্ত্রোনি। 'না।'

'তা হলে আমার একজন মেজরকে নিয়ে যান,' প্রস্তাব দিল কাউন্ট। 'মেজর লুইগি রাকা, লোকটা বাকচাতুরী জানে বটে!'

'না।'

'তা হলে আপনি নিজেই...।'

'জেনারেল ফাদ বলেছেন, প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন

আপনি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, রেডিও অপারেটরকে এখুনি আসমারার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাউন্ট, হাঁ করল, মুখ বন্ধ করল আবার, মনে মনে ত্যাগ করল শিফটা বাহিনীর পিছনে ওয়েলস অভ চাল্ডির নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সংকল্প। 'ঠিক আছে, ঈশ্বরের নামে সন্ধ্যার পর রওনা হব আমরা।'

বোকার মত আবার বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় কাউন্ট। সন্ধ্যা-উত্তর লালিমার ভিতর চাল্ডি থেকে রওনা হলো কনভয়, সামনে একজোড়া সিভি থ্রি ট্যাংক থাকল এসকর্ট হিসাবে, তার পিছনে চার ট্রাক ভর্তি শিফটা সৈনিক, মাঝখানে রোলস-রয়েস, আর পিছনে থাকল বাকি ট্যাংক দুটো।

রোলস-রয়েসে রয়েছে কাউন্টের দু'পাশে মাস্ত্রোনি আর তার গালা গাইড। কাঠের একজোড়া বাক্সের উপর পা দিয়ে রেখেছে মাস্ত্রোনি। সামনের সিটের নীচে রয়েছে আরও দুটো বাক্স, সিটের উপর দিয়ে উঁকি মেরে মাঝে মধ্যেই সেগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সে। গাইড গালা লোকটার বয়স হবে তিরিশের মত, গোত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সে-ও কুৎসিত কদাকার চেহারার অধিকারী, তার উপর সারা মুখে ফোঁটা আকৃতির বসন্তের আর লম্বা আকৃতির কাটাকুটির দাগ, হিংস্র খুনীর পরিচয় আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। পরনে সাদা আলখেল্লা, বছরখানেক বা তারও বেশি হলো ওটার রঙ কালো হয়ে গেছে। সিকি সেকেন্ড তার ঘ্রাণ নিল কাউন্ট, পরমুহূর্তে সুগন্ধী মাখানো রুমালটা চেপে ধরল নাকে।

'লোকটাকে বলুন সে যেন সামনের একটা ট্যাংকে গিয়ে বসে,

ক্যাপটেনের সাথে,' মাস্ত্রোনিকে বলল কাউন্ট। 'ডিনো, গাড়ি থামাও!'

রোলস-রয়েস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেয়ে সামনের ট্যাংক জোড়াও থেমে গেল। সিটের উপর দাঁড়াল কাউন্ট, সামনের একটা ট্যাংকের টারিটে ক্যাপটেনকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল, 'এদিকে এসো, তোমার কমান্ডার তোমাকে ডাকছে।'

ট্যাংক থেকে নেমে এল ক্যাপটেন। 'তোমাকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিলাম, ক্যাপটেন,' বলল কাউন্ট, পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'এ হলো একজন গালা, আমাদের গাইড। একে তোমার পাশে বসতে দিতে হবে!' নির্দেশ দেওয়ার সময় কাউন্টের চোখ জোড়া আত্মতৃপ্তিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

গালা গাইডকে নিয়ে ট্যাংকের টারিটে ফিরে গেল ক্যাপটেন।

আলো না জ্বেলে গাড়ি চালাল ওরা, প্রান্তর জুড়ে চাঁদের আলো থাকলেও দু'পাশের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পাদদেশ অন্ধকারে ঢাকা। নির্দিষ্ট জায়গায় নিঃসঙ্গ একজন অশ্বারোহী ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, কাঁটা ঝোপের কালো আকৃতির পাশে আরও কালো একটা ছায়ামূর্তি। অ্যামহারিক ভাষায় তার সঙ্গে কথা হলো মাস্ত্রোনির।

'জনাব নূর আয়াঙ গালার ভয়, তার সাথে বেঈমানী করা হতে পারে,' কাউন্টকে বলল মাস্ত্রোনি। 'এসকর্ট এখানে রেখে লোকটার সাথে শুধু গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল কাউন্ট। 'না! না! অসম্ভব! আমি রাজি হব না!'

কাউন্টকে রাজি করাতে দশ মিনিট লাগল, বার কয়েক জেনারেল ফাদ আর মি. এক্সের ভয় দেখানোয় কাজ হলো। এই দশ মিনিটে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেল কাউন্ট, হাঁপাতে

হাঁপাতে আবার রোলস-রয়েসে চড়ল সে। ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু পাহাড়ী পথ ধরে ধীরগতিতে এগোল গাড়ি। আধ ঘণ্টা এগোবার পর পাথর ছড়ানো ঢালের নীচে থামতে হলো ডিনোকে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় হলো কাউন্টকে রাজি করাতে। কাঠের দুটো বাক্স রশি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রাখা হলো, বাকি দুটো কাঁধে তুলে নিল ডিনো আর সাতা। ছোট্ট দলটার মাঝখানে থাকল কাউন্ট, হাতে পিস্তল। হোঁচট খেতে খেতে এগোল ওরা।

এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পা ফেলতে সামান্য ভুল করলে সরাসরি নীচের খাদে পড়তে হবে। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে থাকল কাউন্ট, মাস্ত্রোনি তার একটা হাত ধরে আছে। খোলা, চওড়া একটা জায়গায় উঠে এল ওরা, সামনে পিরিচ আকৃতির একটা বিশাল গর্ত, গর্তের কিনারায় কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কালো ভূতের মত প্রহরীরা। গালাদের সম্পর্কে, তাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে, অনেক গল্প শুনেছে কাউন্ট, ভাগ্যের ফেরে তাদের মাঝখানে পড়তে হবে তাকে, ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবেনি সে। পায়ে জোর পেল না, ধড়ফড় করে উঠল বুক। ইচ্ছে হলো বসে পড়ে, কিন্তু মাস্ত্রোনি তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। ভূতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাদের শুধু চোখের সাদা অংশ দেখা যায়, বাকি সব অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে। ঢাল বেয়ে পিরিচের ভিতর নামল ওরা।

নীচে খোলা মাঠে লাল কার্পেটের উপর অনেকগুলো তাকিয়া, সেগুলোর মাঝখানে বহুরঙা সিল্কের আলখেল্লা পরে বিশালকায় এক লোক আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে, তার মাথার পিছনে কাঠের দুটো নিচু স্তম্ভের মাথায় জ্বলছে একজোড়া প্যারাফিন

ল্যাম্প। নূর আয়াঙের দু'পাশে বসেছে দুই যুবতী, কোমরের উপর স্বর্ণালংকার ছাড়া কোন আবরণ নেই। প্রথমেই কাউন্টের চোখ পড়ল মেয়ে দুটোর বুকের উপর। অন্য কোন পরিস্থিতি হলে নিজেকে চাঙা হয়ে উঠবার অনুমতি দিত সে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে প্রশ্ন ওঠে না–এখনকার জরুরী কাজটা হলো পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে শিফটা বাহিনীর যতটা সম্ভব পিছনে ফিরে যাওয়া।

'গালা, হারারি ও রাসটাফারিয়ানদের ভাবী গভর্নর,' নূর আয়াঙের সামনে কাউন্টকে নিয়ে বসল মাস্ত্রোনি, পরিচয় করিয়ে দিল। কাউন্ট দেখল, গালা প্রধানের একেকটা আঙুল সাগরকলার মত মোটা, প্রতিটি আঙুলে পাথর বসানো সোনার আঙটি। কাউন্টকে দেখে, কেন কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়ে দুটো। নূর আয়াঙ গালা তাদের নগ্ন ঊরুতে সশব্দ থাবা মেরে চুপ করাল।

অ্যামহারিক ভাষায় নূর আয়াঙ বলল, 'খোশ আমদেদ।'

মাস্ত্রোনিকে হুকুম করল কাউন্ট, 'যথোপযুক্ত জবাব দিন!' তার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল মাস্ত্রোনি। তার কথায় কান না দিয়ে একদৃষ্টে কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল নূর আয়াঙ গালা। কাউন্টের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তার মনে হলো, কর্নেল অত্যন্ত বদমেজাজী, সত্যিকারের বীরযোদ্ধারা যেমন হয়ে থাকে। কাউন্টের চেহারা, ল্যাম্পের আলোয়, থমথমে লাগল তার চোখে–শক্তিমান পুরুষের নমুনা। কর্নেলের কালো ইউনিফর্মে লটকে থাকা মেডেল, পদক আর ব্যাজগুলো গুণতে শুরু করে শেষ করতে পারল না সে। শুনতে পেল কাউন্ট ক্রোধোন্মত্ত ষাঁড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক প্রভাবিত হলো নূর আয়াঙ গালা।

এরপর ল্যাম্পের আলোয় উদয় হলো ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু ডিনো আর সাতা, সঙ্গে একজন প্রহরী, প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে কাঠের বাক্স। বাক্সের ভারে প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে আছে। বাক্সগুলো গালা প্রধানের সামনে নামানো হলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নূর আয়াঙ, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মাস্ত্রোনির বক্তৃতা। কার্পেটের বাইরে অন্ধকার, অন্ধকার থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে, সেদিকে ভয়ে ভয়ে বারবার তাকাচ্ছে কাউন্ট। রক্ত হিম করা আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এল গালাপ্রধানের গলা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের গুঞ্জনও এবার থেমে গেল। ফিসফাস থামল, তবে অদৃশ্য ভিড়টা এগিয়ে এল কার্পেটের আরও কাছাকাছি, কারণ গোত্রপ্রধানের দেহরক্ষীরা কাঠের বাক্স খুলতে শুরু করেছে।

দড়িদড়া খোলা হলো। এরপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নূর আয়াঙ, কোমরের ছোরা বের করে সামনে এগোল সে, ছোরার ডগা দিয়ে একটা বাক্সের ডালা তুলল।

বাক্স ভর্তি সোনার বার দেখে দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ। কয়েক সেকেন্ড নড়ল না সে, তারপর হাত দুটো লম্বা করে দিল সে, দুই মুঠোয় সোনার কয়েকটা বার নিয়ে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে। গালাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হলো।

উঁকি মেরে কাউন্টও বাক্সের ভিতরটা দেখল একবার। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়, তবু এক সঙ্গে এত সোনা দেখে মাথাটা একবার ঘুরে উঠল। 'এ তো সাত রাজার ধন!' বিড়বিড় করল সে। 'আর পাচ্ছে কিনা একটা অসভ্য জল্লাদ! জেনারেল ফাদের এ ভারি অন্যায় আচরণ!'

নিচু গলায় মাস্ত্রোনি বলল, 'কিন্তু ভেবে দেখুন, যুদ্ধ শেষ হলে

আপনি কী পাচ্ছেন! গোটা ইরিত্রিয়া!’

থপ থপ পা ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এল নূর আয়াঙ, গদিতে বসে তাকিয়ায় হেলান দেওয়ার বদলে হেলান দিল কাউন্টের গায়ে, তার কাঁধে আধ মন ওজনের একটা চাপড় মেরে খ্যাক খ্যাক করে হাসল কিছুক্ষণ, অপর হাতটা দিয়ে মেয়েদের একজনের ঘাড় ধরল, তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নামিয়ে আনল কাউন্টের কোলের উপর। ‘এটা আপনার,’ অ্যামহারিক ভাষায় ঘোষণা করল সে।

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন,’ মাস্ত্রোনিকে নির্দেশ দিল কাউন্ট।

কিন্তু মাস্ত্রোনি কিছু বলবার আগে নূর আয়াঙই শুরু করল।

সে থামবার পর মাস্ত্রোনি কাউন্টকে বলল, ‘উনি আধুনিক রাইফেল আর মেশিনগান চাইছেন।’

কোলে গালা যুবতীকে নিয়ে কাউন্ট প্রশ্ন করল, ‘আমাদের পজিশন কী?’

‘অবশ্যই তাঁকে আমরা ও-সব দিতে পারি না! এক মাস, কিংবা এক বছর পর উনি আর আমাদের মিত্র নাও থাকতে পারেন। গালাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।’

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন।’

‘উনি আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা দাবি করছেন যে কমিউনিস্টদের স্পাই মেয়েটা আর বিদেশী দুই সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার হওয়ামাত্র ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে।’

‘আপত্তি করার কোন কারণ আছে কি?’

‘ওঁর হাতে তুলে দিলেই বরং বেঁচে যাই আমরা, ওদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হৈ-চৈ শুরু হলে বলতে পারব, আমরা কিছু জানি না।’

‘কিন্তু ওদেরকে তার এত কেন দরকার? ওরা তো বরং আমার

বীর যোদ্ধাদের টরচার করেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্দীদের! ওদের শাস্তি দেয়ার অধিকার একা আমার…।'

'শাস্তির কথা যদি ওঠে, আপনার চেয়ে বরং উনিই ভাল দিতে পারবেন। উনি যে শাস্তি দেবেন, দুঃস্বপ্নেও আপনি তা কোন দিন দেখবেন না।' নূর আয়াঙের দিকে ফিরল সে, অ্যামহারিক ভাষায় জানাল, 'আমরা কথা দিলাম, ওদেরকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের নিয়ে যা খুশি করতে পারবেন আপনি।'

কালো আর মোটা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল নূর আয়াঙ, পাশে বসা মেয়েটার গাল টিপে দিল।

দেখাদেখি কাউন্টও তার কোলে বসা ধুমসী মেয়েটার গাল টিপে দিল। ইতিমধ্যে নূর আয়াঙ গালা তাকে কামড়ে বা খামচে দেয়নি দেখে, ধীরে ধীরে তার সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে। মাস্ত্রোনিকে সে বলল, 'ভাবী গভর্নরকে বলুন, বিনিময়ে আমার কিছু তথ্য দরকার। শত্রুপক্ষের শক্তি কতটুকু জানতে চাই আমি–রাইফেল আর মেশিনগানের সংখ্যা, লোকবল, গিরিসংকটে ঢোকার মুখে ক'টা আর্মারড কার রয়েছে। জানতে চাই ট্রেঞ্চগুলোর পজিশন, স্ট্রং পয়েন্ট, আর বিশেষ করে, নূর আয়াঙের বাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে।' আঙুলের গিঁট গুণে প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করছে সে, মাথা একদিকে কাত করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথাগুলো গিলছে নূর আয়াঙ গালা।

'ফাঁদে ফেলতে হলে টোপ দিতে হবে?' প্রশ্ন করল মাইকেল। 'হ্যাঁ, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

চঞ্চলার ছায়ায় পাশাপাশি উবু হয়ে বসে রয়েছে ওরা, রানার হাতে ছোট একটা শুকনো ডাল সেটা দিয়ে বালির উপর ম্যাপ

আঁকছে সে, মাইকেলের সঙ্গে আলোচনা করছে শিফটাদের নতুন শক্তিকে কীভাবে ঠেকানো যায়।

‘অশ্বারোহী পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। একবার কাজ হয়েছে, দ্বিতীয়বার আশা করা বোকামি হবে।’

কথা বলল না মাইকেল, রানার আঁকা জটিল ম্যাপটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল।

‘ট্যাংক কমান্ডারকে ওষুধ যা দেয়ার দেয়া হয়েছে। এরপর আর্মারড কারের ছায়া দেখলেই হয়, তেড়ে আসবে ঠিক তোমার পোষা...।’

‘হ্যাঁ, জানি।’ মাইকেল হাসছে না। ‘আবার আমার মনে হচ্ছে, একজন সামরিক অফিসারের কথা শুনছি আমি।’

‘আমরা একটা কার পাঠাব,’ বলল রানা। ‘একটাই যথেষ্ট। আরেকটাকে রিজার্ভ রাখব—এখানে।’ বালির ম্যাপে আঙুল রাখল সে। ‘প্রথম কারটা যদি কোন বিপদে পড়ে বা...।’

‘যদি হাই-এক্সপ্লোসিভ একটা শেল ওটাকে গুঁড়িয়ে দেয়, বলতে চাইছ?’

‘ঠিক তাই। তা যদি ঘটে, দ্বিতীয় কারটা গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠবে, আর ওটার দিকে ধেয়ে আসবে ওরা।’

‘পানির মত সোজা, ওল্ড চ্যাপ, কোন ব্যাপারই না। অখ্যাত প্রতিভা মাসুদ রানার ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার।’

‘প্রথম কারে কে থাকবে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এসো টস করি,’ প্রস্তাব দিল মাইকেল, রূপালি মুদ্রাটা ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল তার হাতে, রানা হেড বলায় আঙুলের টোকা দিয়ে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, সশব্দে দু'হাতের তালু এক করে ধরে ফেলল।

এক করা তালু খুলল মাইকেল। ‘তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড

চ্যাপ! টেইলস!'

আফ্রিকার মামবা সাপের মত ছোবল মারল রানার হাত, মাইকেলের কব্জি চেপে ধরল ও।

'কী হলো!' প্রতিবাদ জানাল মাইকেল। 'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'নো অফেন্স,' আশ্বস্ত করল রানা, মাইকেলের হাতটা টেনে নিল নিজের দিকে, তালুতে রাখা মুদ্রাটা পরীক্ষা করল এপিঠ-ওপিঠ।

'পয়সার গায়ে ওটা কার ছবি আমি জানি না,' সহাস্যে বলল মাইকেল। 'কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, খাসা একখানা মাল, কি? ঠোঁটের হাসিটা দেখছ? যেন, চুমো খেতে বলছে...।'

রানা তার কব্জি ছেড়ে দিল, ঠিকই আছে মুদ্রা। ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, অপ্রতিভ ভাবটা লুকোবার জন্য হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়ল। 'চলে এসো, আব্বাস,' ডাকল ও। 'আমরা বরং এখুনি তৈরি হয়ে নিই।' ওদিকে প্রস্তুতি চলছে, তার তদারকিতে ব্যস্ত আব্বাস খায়ের, নিজের দায়িত্ব আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে পা বাড়াল রানার দিকে।

'গুড লাক, ওল্ড চ্যাপ,' রানার পিছন থেকে বলল মাইকেল। 'মাথা নিচু করে রেখো। তোমার কিছু হলে হৃদয়ে যে পেরেকটা বিঁধবে তার ব্যথা আমার সহ্য হবে না।'

তেরো

টারিটের কিনারায় বসে হ্যাচের ভিতর পা ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা,

মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পাহাড়গুলোর দিকে। ওগুলোর শুধু নীচের ঢাল দেখা গেল; খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে আকাশ-ছোঁয়া, দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘের ভিতর।

ধীরে ধীরে গোটা আকাশ দখল করে নিচ্ছে মেঘ। ডানাকিল মরুতে প্রবেশ করবার পর এই প্রথম অদৃশ্য হলো সূর্য। মেঘ থেকে হিম বয়ে নিয়ে এল ঝড়ো বাতাস, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রানার।

ওর পাশে টারিটে বসে রয়েছে আব্বাস, কালো মেঘের দিকের চোখ। 'তুমুল বৃষ্টি হবে।'

'এদিকে?'

'নাহ্। তবে পাহাড়গুলো একেবারে ভেসে যাবে।'

মেঘেদের নড়াচড়া দেখে রানার মনে হলো, ওখানে যেন ব্যাপক রণ-প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণ পর সেদিকে পিছন ফিরল ও, তাকাল পুব দিকে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে খানিক পর পর এক আধটা গাছ বা কাঁটাঝোপ, কোন প্রাণী নেই, কিছুই নড়ছে না। স্কাউটরা রিপোর্ট করেছে, শিফটারা অ্যাডভান্স করবে। কিন্তু তার কোন আলামত চোখে পড়ল না। আবার ঘুরল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে গিরিসংকটের নীচের ঢালগুলোয় দৃষ্টি বুলাল, ওদিক থেকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি টের পেলে সংকেত দিয়ে জানাবে মাইকেল। পাথরের বিশাল স্তূপ আর অসংখ্য ঢাল ছাড়া দেখবার কিছু নেই।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরও নীচে নামিয়ে আনল রানা, পাহাড়শ্রেণীর পাথুরে বিস্তৃতির পর ছোট ছোট লাল বালিয়াড়ি মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে, যেন স্থির হয়ে আছে অসংখ্য ঢেউ। প্রান্তরের মাটি ওদিকে আঁচড়ানো, কোঁচকানো; কর্কশ ঘাসে মোড়া, তারপর শুরু হয়েছে কাঁটাঝোপ আর অচেনা গাছের জঙ্গল। বেশ

লম্বা আর ঘন, কয়েকশো আদিবাসী অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। রানা জানে, এই মুহূর্তে ধৈর্যের সঙ্গে কর্কশ মাটির উপর শুয়ে রয়েছে তারা।

গোটা প্ল্যানটা রানার। শুধু টোপ দিয়ে শিফটা ট্যাংকগুলোকে ফাঁদে ফেলা নয়, সেগুলোকে কীভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে সে বুদ্ধিও ওর মাথা থেকে গজিয়েছে।

আব্বাসের নেতৃত্বে একশো আদিবাসী আর পঞ্চাশটা উট সারডি শহর থেকে ঘুরে এসেছে। রেল স্টেশনের শান্টিং ইয়ার্ড থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমিতে নামিয়ে আনা হয়েছে অনেকগুলো লম্বা আর ভারি স্টীল রেইল।

রেইলগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে রানার কাছ থেকে। প্রতিটি গ্রুপে বিশজন লোক রেখেছে সে, রেইল নিয়ে ট্রেনিংও দিয়েছে তারা। এখন শুধু দেখতে হবে শিফটারা উদয় হয় কিনা, উদয় হলে তাদের ট্যাংকগুলোকে রানার চঞ্চলা নিচু বালিয়াড়ির দিকে টেনে আনতে পারে কিনা।

আর্মার-এর সাহায্য ছাড়া, মাইকেল ও রানার ধারণা, শিফটাদের ওরা এক হপ্তা আটকে রাখতে পারবে গিরিসংকটের মুখে। ওদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আয়োজনে হারারি আর রাসটারা পজিশন নিয়েছে বাঁ দিকে আর মাঝখানে, আর গালারা পজিশন নিয়েছে ডান দিকে। ভিকার্স মেশিনগানগুলো এমন পজিশনে রাখা হয়েছে, আর্মারড কাভার ছাড়া শিফটারা এগোতে চেষ্টা করলেই শয়ে শয়ে মারা পড়বে।

গিরিসংকটে ঢুকতে হলে কামান আর বোমারু বিমানের সাহায্য পেতে হবে তাদের।

গিরিসংকটের মুখ দখল করা এক কথা, ভিতরে ঢুকে এগোতে

পারা সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রতিটি বাঁকে অ্যামবুশ পাতা আছে, নিরাপদ আড়াল থেকে শিফটাদের উপর পাথর আর গুলিবর্ষণ করবে আদিবাসীরা। তবে শেষ পর্যন্ত শিফটারা সারডি শহরে পৌঁছুতে পারবে, কারণ সংখ্যায় তারা আদিবাসীদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাতে আরও সাতদিন সময় লাগবে।

গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সারডিতে শিফটারা পৌঁছুবার পর কী ঘটবে সবাই তা জানে, কিন্তু কেউ আলোচনা করতে চায় না। এক কি দু'দিন হয়তো আর্মারড কারের সাহায্যে তাদেরকে গিরিসংকটের মুখে আটকে রাখতে পারবে রানা, তার বেশি নয়। সারডি দখল করবার পর শিফটারা দ্রুতগতিতে ডেসি রোডের দিকে ছুটবে—ফাঁদের চোয়াল বন্ধ করবার জন্য। কার ভাগ্যে কী ঘটবে তা নির্ভর করবে কে পালাতে পারবে আর কে পারবে না তার উপর।

পরিস্থিতি ও আয়োজন সম্পর্কে সবই প্রিন্স হাসান সালেকে আদ্দিস আবাবায় টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। অনেক দেরি করে উত্তর একটা এসেছে বটে, কিন্তু সেটা বয়ে নিয়ে এসেছে ভীতি আর দুঃসংবাদ।

আভাসে প্রিন্স সালে জানিয়েছে, রাজধানীতে নজরবন্দী রাখা হয়েছে তাকে। তবে এখনও সম্রাটকে বোঝাবার আশা ত্যাগ করেনি সে। তার ধারণা, আরেকবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলেই তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সে মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে পারবে, তখন সেলাসী বাহিনীর সাহায্য পাওয়া আদিবাসীদের জন্য কোন সমস্যা হবে না। রানা আর মাইকেলের প্রতি আবেদন জানিয়েছে সে, কোন রকমে আর দু'হপ্তা গিরিসংকট দখল করে রাখুন, তারপর আপনাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। সে আরও আভাস দিয়েছে, সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বার্তা পাঠানো

হয়েছে আরেক পক্ষকে, সম্ভবত অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে।

তারমানে মরু প্রান্তরে আরও এক হপ্তা টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। তা সম্ভব কিনা নির্ভর করছে শিফটাদের আর্মার-এর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষটার কী পরিণতি দাঁড়ায় তার উপর। রানা আর মাইকেলের হিসাবে, স্কাউটদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারেও বটে, শিফটাদের ট্যাংকের সংখ্যা চারটে। একটা মাত্র আঘাতে চারটেই অচল করে দিতে হবে ওদের, গিরিসংকটের গোটা প্রতিরক্ষা এই একটি বিষয়ের উপর ঝুলে আছে।

এক সময় রানার মনে হলো, দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে, হিসাবের মধ্যে যেগুলো ধরা হচ্ছে না। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল আব্বাস।

'মাসুদ ভাই! সংকেত!'

ঝট করে পাহাড়ী ঢালগুলোর দিকে তাকাল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলবার দরকার হলো না। টয়লেট ব্যাগ থেকে শেভিং-মিরর বের করে সঙ্গে রেখেছে মাইকেল, হেলিয়োগ্রাফের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করছে ক্ষুদে আয়নাটা। অত দূর থেকেও আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন রানার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

'উপত্যকা ধরে এগিয়ে আসছে ওগুলো, পাশাপাশি চারটে ট্যাংক সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে ট্রাক ভর্তি পদাতিক বাহিনী।' সংকেত পড়া শেষ করল রানা, হ্যাচ গলে ঝুপ করে নেমে গেল চঞ্চলার ড্রাইভিং সিটে, একই সঙ্গে লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের সামনে পড়ল আব্বাস।

'দ্যাট'স মাই ডার্লিং!' চঞ্চলার এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠতেই ধন্যবাদ দিল রানা, আব্বাস হ্যাচ গলে টারিটে উঠে আসতেই তাকে বলল, 'ঘোরার সময় প্রতিবার জানাব তোমাকে।'

'ইয়েস, মাসুদ ভাই।' ছেলেটার চোখ দু'টুকরো অঙ্গারের মত জ্বলছে দেখে নিঃশব্দে হাসল রানা।

'দাদুর মতই রক্তপিপাসু!' ক্লাচ ছেড়ে দিল ও। চঞ্চলার গতি দ্রুত বাড়ল, ঢালের নীচ থেকে কিনারা পেরিয়ে উঠে এল ওরা, খোলা প্রান্তরে ধুলোর মেঘ উঠে দুনিয়ার সবাইকে জানিয়ে দিল ওদের অস্তিত্ব।

শিফটা ট্যাংকের রেখাটা সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে, ওদের পাশে দেড় মাইল দূরে এখনও।

'ঘুরছি,' সতর্ক করল রানা।

পাল্টা চিৎকার করে আব্বাস জানাল, 'রেডি!' টারিটের উপর, ভিকার্স মেশিনগানের পিছনে উবু হয়ে বসে রয়েছে সে, মেশিনগানের মাজল বরাবর ট্যাংকগুলোকে পেলেই গুলি করবার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

দ্রুত, বন বন করে হুইল ঘোরাল রানা। দূরবর্তী গাঢ় রঙের পোকা আকৃতির শিফটা আর্মার-এর দিকে ঘুরে গেল চঞ্চলা, সরাসরি ওগুলোর দাঁত লক্ষ্য করে ছুটল।

রানার মাথার উপর গর্জে উঠল ভিকার্স, খালি কার্তুজগুলো পাথর বৃষ্টির মত নেমে এল হ্যাচ গলে, ঠন ঠন আওয়াজ করল ইস্পাতের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, পোড়া করডাইটের আকস্মিক ঝাঁঝে রানার চোখে পানি বেরিয়ে এল।

চোখ পিট পিট করে রানা দেখল বিদ্যুৎ-সাদা ট্রেসার খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ছুটছে। সামনের একটা ট্যাংকের কাছাকাছি পড়ল সেটা। প্রায় দেড় মাইল দূরে হলেও, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে লাফিয়ে ওঠা ধুলোর ক্ষুদে ঝর্ণাগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও। 'গুড বয়!' আব্বাসের প্রশংসা করল, কারণ চঞ্চলা অনবরত ঝাঁকি খাওয়া সত্ত্বেও এত দূর

থেকে লক্ষ্যভেদে প্রায় সফল হয়েছে সে। অবশ্য সিভি থ্রির মোটা আর্মার ভেদ করতে পারবে না বুলেটগুলো, তবে কোন সন্দেহ নেই ক্রুদের খেপিয়ে তুলতে পারবে, প্ররোচিত করবে ধাওয়া করে পাল্টা আঘাত হানবার জন্য।

ঘটলও ঠিক তাই। কমান্ডার টার্গেটের দিকে লক্ষ্যস্থির করবার নির্দেশ দেওয়ায় ট্যাংকটার টারিট ঘুরে গেল। স্প্যান্ডাউ-এর মোটা ব্যারেল দ্রুত খাটো হলো, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, সরাসরি ওটার মাজল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা।

ধীরে ধীরে তিন পর্যন্ত গুণল ও। ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করে তৈরি হতে তার বেশি সময় লাগবে না। তারপরই রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘুরছি!'

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, ফলে দুই চাকার উপর সচল থাকল চঞ্চলা, শত্রুদের সামনে থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে। চোখের কোণে মাজল ফ্ল্যাশ-এর আভা দেখতে পেল ও, প্রায় পরমুহূর্তেই পাশ ঘেঁষে ছুটে যাওয়া শেলের গর্জন শুনতে পেল।

'সান অভ আ গান—দ্যাট ওয়াজ ক্লোজ!' বিড়বিড় করল ও, ভাইজর আর হ্যাচ খুলবার জন্য হাত তুলল। বন্ধ চঞ্চলার ভিতর থাকায় কোন লাভ নেই, আর্মারড কারের যে-কোন অংশ পাতলা কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলবার ক্ষমতা রাখে স্প্যান্ডাউ। বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তগুলোয় দৃষ্টিসীমা বরং অবারিত থাকা দরকার।

শিফটা লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ছুটছে চঞ্চলা, পাশে তাকিয়ে রানা দেখল চারটে ট্যাংকই এখন ফায়ার করছে, তবে এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে সব ক'টা। চঞ্চলার দিকে ঘুরবার জন্য দিক বদলাতে বাধ্য হয়েছে ওগুলো, পদাতিক

বাহিনীকে পিছনে রেখে এগিয়ে আসতে হয়েছে লাইনের বাইরে, দ্রুত ধাবমান চঞ্চলাকে ধাওয়া করবে নাকি থেমে শেল ছুঁড়বে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করায় মন্থর হয়ে পড়েছে গতি। চারটে ট্যাংক, প্রায়ই একটার সামনে পড়ে যাচ্ছে আরেকটা।

'আয় শালারা!' বিড়বিড় করল রানা। 'যুদ্ধের সাধ তোদের মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি,' বিপজ্জনক এই মুহূর্তেও নিঃশব্দে হাসছে রানা।

কাছেই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো, বালি আর কাঁকর বৃষ্টি হলো হ্যাচের ভিতর। এতক্ষণে সঠিক রেঞ্জ আন্দাজ করতে পেরেছে শিফটারা। যে-কোন পরবর্তী শেল আর্মারড কার ভেদ করতে পারে। একটা কিছু করা দরকার।

মুখ থেকে বালি ফেলে চিৎকার করল রানা, 'ঘুরছি! গুলি চালাও!'

সাবলীলভাবে শিফটা লাইনের দিকে ঘুরে গেল চঞ্চলা। চোখ ভরা অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে শিফটারা দেখল ওদের দিকে তেড়ে আসছে আর্মারড কার।

মাঝখানের দূরত্ব ভয়ানক কমে এল। একনাগাড়ে গুলি করছে আব্বাস। শিফটা লাইন এত কাছে চলে এসেছে যে সামনের ট্যাংকটার গায়ে ভিকার্স বুলেটের মাথা ঠুকবার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। ঝাঁকের প্রথম ট্যাংকটাকে বেছে নিয়েছে আব্বাস, ওটাতেই রয়েছে বহরের কমান্ডার।

'ঠিক,' বিড়বিড় করে সায় দিল রানা, 'ব্যাটার রক্ত গরম করে তোলো...।' থেমে গেল রানা, মাথার কাছে বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ হয়েছে, যেন কোন দানব হাজার মন ওজনের একটা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরেছে ইস্পাতের খোলে—প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আরেক দিকে ছুটল চঞ্চলা, চাকাগুলো ঘুরে গেছে।

‘শেল লেগেছে!’ ভাবল রানা, মুছে গেছে ঠোঁটের হাসি। বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেছে ওর, পোড়া রঙ আর গরম ধাতুর উৎকট গন্ধ পেল নাকে। ভয়ে ভয়ে হুইল ঘোরাল ও, পরম স্বস্তি বোধ করল চঞ্চলা ঘুরতে শুরু করায়। শিফটা লাইনের দিকে পিছন ফিরল আর্মারড কার।

নিজের কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, বাইরে মাথা বের করেই বুঝল ভাগ্য কতটুকু সহায়তা করছে ওদের। ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে গাড়ির মাথায় একটা লোহার আঙটা লাগিয়েছিল ও, অ্যামুনিশনের বাক্স রশি দিয়ে বাঁধবার জন্য, শেল সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। খোলের গায়ে দাঁত বসালেও, ফুটো করতে পারেনি।

‘তুমি ঠিক আছ, আব্বাস?’ নিজের সিটে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ওরা পিছু নিয়েছে, মাসুদ ভাই,’ পাল্টা চিৎকার করে জানাল আব্বাস, আঘাতটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ‘ধাওয়া শুরু করেছে–ওরা সবাই।’

‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি–এই রওনা হলাম!’ বলল রানা, শিফটাদের দিকে আগেই পিছন ফিরেছে চঞ্চলা, এবার গতি বাড়িয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল–রেঞ্জ আর লক্ষ্য বদলাতে বাধ্য হবে শিফটা গানাররা।

শেলের বিরতিহীন বিস্ফোরণ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল, তবে একটাও চঞ্চলাকে ছুঁতে পারল না। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে কেঁপে উঠল ওরা।

‘অনেক দূরে চলে আসছি আমরা, মাসুদ ভাই,’ হাঁক ছেড়ে বলল আব্বাস, ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখতে পেল নিজের অজান্তেই কখন যেন হ্যাচ খুলে মাথাটা বাইরে বের করে রেখেছে

ও।

'আহত পাখি,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল রানা। শিফটাদের কাছ থেকে বেশি দূরে সরে এলে, সমূহ আশংকা আছে ধাওয়া বাদ দিয়ে নিজেদের পথে ফিরে যাবে তারা।

পাশে, কাছাকাছি আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো, ম্লান ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল আর্মারড কার, এই সুযোগে রানা ভান করল আহত হয়েছে ওরা–থ্রটলের উপর থেকে চাপ কমাল, ফলে নাটকীয়ভাবে মন্থর হলো চঞ্চলার গতি, এঁকেবেঁকে এগোবার মধ্যে কোন নিয়মিত প্যাটার্ন থাকল না, ডানা ভাঙা পাখির মত ছোট ছোট লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে।

'কাছে চলে আসছে এবার,' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আব্বাস।

'এত খুশি হবার কিছু নেই,' বিড়বিড় করল রানা, কান ঘেঁষে ছুটে যাওয়া একটা শেলের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ওর কথা।

'এখনও ওরা আসছে, দূরত্ব কমে যাচ্ছে!' রানাকে সাবধান করল আব্বাস। 'এখনও ফায়ার করছে!'

'জানি!' চঞ্চলার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করছে রানা, ঘন ঘন এক দিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাল চাকাগুলো। চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল ও। ঢেউ আকৃতির প্রথম বালিয়াড়িটা আধ মাইল সামনে। কিন্তু সেটার কাছে পৌঁছুতে মনে হলো এক যুগ পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে মাটি, হেলেদুলে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, ধুলো আর কাঁকরের স্তূপ বাতাসে উড়িয়ে আরেক দিকে নামতে শুরু করল, ধাওয়ারত শিফটা ট্যাংকগুলো ওদেরকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না।

বালিয়াড়ি থেকে নামবার সময় চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে এল রানা, পিছলে নামতে দিল গাড়িটাকে, তারপর হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড় করাল। পিছু হটল আর্মারড কার, বালিয়াড়ির

মাথার দিকে ঘুরে গেল নাক, ধীরগতিতে আবার উঠতে শুরু করল মাথার দিকে।

চঞ্চলার খোলটা বালিয়াড়ির আড়ালে থাকল, চূড়ার উপর জেগে থাকল, শুধু টারিট।

‘সাবাস মাসুদ ভাই, সাবাস!’ টারিটের উপর দাঁড়িয়ে এক পাক নেচে নিল আব্বাস, সে তার ভিকার্স আবার শত্রুদের দিকে তাক করতে পারছে। ঝুপ করে বসে পড়ে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়ল সে খোলা প্রান্তর ধরে ছুটে আসা চারটে ট্যাংক লক্ষ্য করে।

বালিয়াড়ির পিছনে স্থির পজিশন থেকে গুলি করায় প্রতিটি বিস্ফোরণের প্রতিটি বুলেট ধেয়ে আসা খোলগুলোর গায়ে লাগাতে পারল সে।

‘যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে,’ বলল রানা, আন্দাজ করল এরপর নাকের সামনে মুলো না থাকলেও ধাওয়া করবে গাধাগুলো। বালিয়াড়ি থেকে ট্যাংকগুলো এখন আর পাঁচশো গজও দূরে নয়, ক্ষুদে টার্গেট চঞ্চলার টারিটেও যে-কোন সময় একটা শেল লাগিয়ে দিতে পারে। ‘চলো হে, পালাই!’

আর্মারড কার ঘুরিয়ে নিল রানা, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে সবেগে নেমে এল ওরা। দু’পাশে আর সামনে কাঁটাঝোপ আর গাছপালা চলে এল, ওগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে পলকের জন্য দেখতে পেল রানা। কৌপীন ছাড়া কারও পরনে কিছু নেই, বুকে স্টীলের লম্বা রেইল নিয়ে একজনের পিছনে একজন, এক লাইনে শুয়ে আছে—তাদের মধ্যে দু’জনে উন্মাদের মত গড়ান দিয়ে চঞ্চলার পথ থেকে সময় থাকতে সরে গেল।

এক বালিয়াড়ি থেকে নেমে আরেক বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, চূড়ায় উঠবার পর শ্লথ হলো গতি, ধুলোর ভিতর ঢাকা

পড়ে গেল খোলটা, থ্রটলে চাপ দিয়ে গতি বাড়াতেই লাফ দিয়ে অপরদিকের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

দ্বিতীয় বালিয়াড়ি থেকে পুরোপুরি নামবার আগেই চঞ্চলার ব্রেক কষল রানা, খোলা হ্যাচ থেকে বেরিয়ে গাড়ির পাশে বালির উপর লাফিয়ে পড়ল, আব্বাসও অনুকরণ করল ওকে। বালিতে পড়েই সিধে হলো, ঢাল বেয়ে ছুটল চূড়ার দিকে।

চূড়ার কিনারা থেকে উঁকি দিল ওরা, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এল শিফটাদের চারটে ট্যাংক। সগর্জনে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওগুলো।

ট্র্যাকের নীচে চ্যাপ্টা হলো কাঁটাঝোপ আর গাছপালা। এক নিমেষে জ্যান্ত হয়ে উঠল জঙ্গল নগ্ন কালো মূর্তিতে। দানবীয় গর্জন বেরিয়ে আসছে খোলগুলো থেকে, কিন্তু কোন কিছুর পরোয়া না করে হাজার হাজার পিঁপড়ের মত আদিবাসী যোদ্ধারা ছেঁকে ধরল ওগুলোকে।

প্রতিটি স্টীল রেইল বিশজন লোকের হাতে রয়েছে, বিশাল গাছের কাণ্ডের মত সেটাকে ধরাধরি করে ছুটল তারা, প্রতিটি ট্যাংককে চারদিক থেকে আক্রমণ করল, রেইলের শেষ মাথা সবেগে ঢুকিয়ে দিল শিকলের আঙটার সঙ্গে সংলগ্ন চাকার দাঁতের মাঝখানে।

রেইল সঙ্গে সঙ্গে আটকে গেল, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠল গা, বিশজনের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল রেইলের অপর প্রান্তটা, আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং হলো সবাই। দরদী একজন এঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকলে মেশিনগুলো নিজেদের ভেঙে টুকরো টুকরো করতে গিয়ে যে শব্দ করছে তা শুনে হয়তো ভাবত জ্যান্ত প্রাণীরাই যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

স্টীলের রেইল জকি হুইল ছিঁড়ে বের করে আনল, সেটিং থেকে ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত বেরিয়ে এল ট্র্যাকগুলো, সপাং সপাং শব্দে চাবুক মারল বাতাসে, ধুলোর মেঘ আর গাছপালার ভিতর ঘন ঘন আছাড় খেয়ে একসঙ্গে যেন একশো অজগর মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের ভিতর থেমে গেল সব, চারটে ট্যাংক স্থির হয়ে গেছে, অঙ্গহানির ফলে মেরামতের অযোগ্য, ওগুলোর চারপাশে পড়ে আছে চার-পাঁচজন আদিবাসীর লাশ, ট্র্যাকগুলো বিছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বার সময় আঘাত করেছে ওদেরকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে শরীরগুলো, কারও হাত আছে তো মাথা নেই, দশ মনী পাথর দিয়ে যেন প্রত্যেককে থেঁতলানো হয়েছে।

যারা বেঁচে আছে, সংখ্যায় তারা কয়েকশো, নিরাপদ আড়াল আর দূরত্ব থেকে ছুটে এসেছে এরইমধ্যে, ঘিরে ফেলেছে ট্যাংকগুলোকে। প্রায় নগ্ন, লু-লু আওয়াজের সঙ্গে উল্লাসে নৃত্যরত, গলা ছেড়ে হাসছে, খালি হাতে দমাদম ঘুসি মারছে ইস্পাতের খোলে।

খোলের ভিতর শিফটা অথবা ইটালিয়ান গানাররা এখনও মরিয়া হয়ে শেল ছুঁড়ছে, কিন্তু এখন আর তাদের টারিট ঘুরছে না, একটা কামানও টার্গেটের উপর লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। তারা অন্ধও বটে—কারণ বারোজন আদিবাসীকে একটা করে বালতি দিয়ে রেখেছে রানা, বালতিতে আছে এঞ্জিনের তেলের সঙ্গে ধুলো মেশানো কাদা—ড্রাইভার আর গানারের ভাইজরে মুঠো মুঠো কাদা লাগিয়ে দিয়েছে তারা। ট্যাংকের ভিতর শিফটা ক্রুরা বন্দী, বাইরে কয়েকশো লোকের বিজয়োল্লাস, দ্বিতীয় কারের আওয়াজটা তাই শুনতেই পেল না রানা।

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টোদিকের বালিয়াড়ির মাথায় থামল গাড়িটা। ঘটাং করে খুলে গেল জোড়া হ্যাচ কাভার, খোল থেকে লাফিয়ে নীচে নামল মাইকেল আর বৃদ্ধ কামাল হাসান।

গোত্রপ্রধানের সঙ্গে তরোয়াল রয়েছে, ঢাল বেয়ে দমকা বাতাসের মত নেমে আসবার সময় মাথার উপর সেটা বন বন করে ঘোরালেন তিনি, তাঁর সাদা আলখেল্লা ফুলে উঠল পিছনে, রণহুংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটলেন নিজের যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আদিবাসীদের উল্লাস আর অচল ট্যাংকগুলো দেখে প্রাচীন যোদ্ধার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

দুই বালিয়াড়ির সমতল মেঝেতে নেমে এল মাইকেল, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল ওকে–কিন্তু বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকুর মধ্যে সত্যিকার সম্মান লুকিয়ে রয়েছে, উপলব্ধি করল রানা। পাশাপাশি ছুটে দু'জনেই ওরা ঝোপের মাঝখানে নেমে এল, এখানে বালির নীচে লুকানো রয়েছে গ্যাসোলিন ভরা কয়েকটা ক্যান।

কাজে হাত দেওয়ার আগে রানার বাহুতে হালকা ঘুসি মারল মাইকেল। 'একাই ছ'টাকে পঙ্গু করে দিয়েছ, ওল্ড চ্যাপ। এর চেয়ে কম কিছু তোমার কাছে আমি আশা করিনি। যদি অস্বীকার করো এ-জন্মে নয়, তা হলে আমি বলব গত জন্মে একজন ব্রিগেডিয়ার ছিলে তুমি, কী?'

আদিবাসীরা বালি সরিয়ে ফেলেছে, রানা আর মাইকেল দুটো করে ক্যান নিয়ে রওনা হলো ট্যাংকগুলোর দিকে। একটা ক্যান আব্বাসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, এরইমধ্যে কাছের ট্যাংকটার টারিটে উঠে পড়েছে সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে তরোয়ালের ডগা দিয়ে একটা হ্যাচ খুলবার চেষ্টা করছেন কামাল হাসান। জ্বলন্ত

অঙ্গারের মত আলো বিকিরণ করছে বৃদ্ধের চোখ জোড়া, লু-লু রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মুক্তোর মত সাদা কৃত্রিম দাঁতগুলো নড়বড় করছে মুখের ভিতর, শত্রুহননের সুযোগ পেয়ে প্রায় উন্মাদ।

গ্যাসোলিন ভর্তি ক্যানটা টারিটের উপর রাখল আব্বাস, ড্যাগারটা কোমর থেকে টেনে নিয়ে ধাতব ছিপির মাঝখানে গাঁথল। হিস হিস শব্দে স্বচ্ছ তরল গ্যাসোলিন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

'ভাল করে ভেজাও,' চিৎকার করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসল আব্বাস, ক্যান উপুড় করে তরল গ্যাসোলিন ঝরাল ট্যাংকের গায়ে। গন্ধটা তীব্র, গরম ইস্পাতে পড়ামাত্র বাষ্প হয়ে উড়ে গেল খানিকটা।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এল রানা, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে উঠবার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুলল ক্যানের। ফরওয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের উপর সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, খোলের মাথায় গ্যাসোলিন ঢালল যতক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভিতর চকচক করে উঠল ইস্পাত। নাট-বল্টু-স্ক্রু আর নগণ্য ফুটো-ফাটা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভিতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকল।

'পিছাও,' হাঁক ছাড়ল মাইকেল। 'সবাই পিছাও!' বাকি দুটো ইস্পাতের লাশ নিজের হাতে ভিজিয়েছে সে, পিছিয়ে গিয়ে উঠে পড়েছে বালিয়াড়ির মাথায়, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে লম্বা কালো একটা চুরুট, এখনও ধরায়নি, হাতে একটা দিয়াশলাই।

হালকা লাফ দিয়ে ট্যাংক থেকে নীচে নামল রানা, ক্যান উপুড় করে ছুটল মাইকেলের দিকে, পিছনে রেখে আসছে গ্যাসোলিনের

মোটা একটা রেখা।

‘তাড়াতাড়ি! জলদি!’ আবার তাগাদা দিল মাইকেল।

আব্বাসও তার পিছনে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা তৈরি করছে, ছুটে আসছে মাইকেলের দিকে।

‘এমন কেউ নেই ওই বুড়ো ভামটাকে এদিকে সরিয়ে আনে?’ অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল মাইকেল। সবচেয়ে কাছের ট্যাংকটার কাছে একটা মাত্র মূর্তি উন্মাদের মত লাফালাফি করছে, রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মাথার উপর তরোয়াল ঘুরিয়ে ট্যাংকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে ক্রুদের। হাতের ক্যান ফেলে দিয়ে সেদিকে ছুটল আব্বাস, কিন্তু তরোয়ালের ভয়ে কাছে ঘেঁষতেই সাহস হলো না তার, সাহায্যের জন্য রানার দিকে তাকাল। হাতের খালি ক্যানটা ফেলে এগিয়ে গেল রানা। ঘুরন্ত তরোয়ালের নীচে মাথা নিচু করে ঢুকল ও, এক হাতে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধের হাড়সর্বস্ব কোমর, শূন্যে তুলে নিল শরীরটা, ধরিয়ে দিল আব্বাসের বাড়ানো জোড়া হাতে। আব্বাস তাকে বুকে নিয়ে ছুটল, এখনও হাত-পা ছুঁড়ছেন কামাল হাসান, তরোয়ালটা মাথার উপর খাড়া করে রেখেছেন।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে চুরুট ধরাল মাইকেল, তারপর কাঠিটাকে ভালভাবে জ্বলতে দিল। ‘অর্ডার দিন, ব্রিগেডিয়ার,’ রানার দিকে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করল সে, ‘সার।’

হেসে ফেলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

গ্যাসোলিনে ভেজা মাটিতে অগ্নিসংযোগ করল মাইকেল। প্রথমে কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ধাক্কা অনুভব করল ওরা, কানের পর্দায় বাড়ি খেলো বাতাস, দপ করে আগুন ধরে গেল গ্যাসোলিনে। চোখের পলকে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে সগর্জনে আগুনের কয়েকটা রেখা ট্যাংকগুলোর দিকে ছুটল। রক্তবর্ণ

অগ্নিশিখা নাচল, মোচড় খেলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল ট্যাংকগুলোর চারধারে। এক সময় আগুনের পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গেল ওগুলো।

বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আদিবাসী যোদ্ধারা, নিজেদের আয়োজন করা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। একা শুধু কামাল হাসান আগুনের কিনারায় নাচানাচি করছেন, তাঁর তরোয়ালের ফলায় প্রতিফলিত হচ্ছে লাল আগুন।

সামনের ট্যাংকের হ্যাচগুলো সশব্দে খুলে গেল, উত্তপ্ত বাতাসে লাফিয়ে বেরিয়ে এল তিনটে মূর্তি, লাল পাঁচিলের ভিতর অস্পষ্ট, দেখে মনে হলো তিনজনই বুক চাপড়াচ্ছে, আসলে ইউনিফর্মের আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে ক্রুরা। পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে এল লোকগুলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন ধরে গেছে, আক্ষরিক অর্থেই তিনটে অগ্নিমূর্তি।

তাদের দিকে ছুটে গেলেন কামাল হাসান, বাতাসে শিস কাটল তাঁর তরোয়ালের ফলা। ট্যাংক কমান্ডারের মাথা আগুনে পোড়া কালচে কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে বিছিন্ন হলো, নিখুঁতভাবে তরোয়াল চালিয়েছেন বৃদ্ধ। মাথাটা কমান্ডারের পিছনে পড়ল, একটা বলের মত গড়িয়ে নেমে এল ঢাল বেয়ে। ধড়টা ধীরে ধীরে নিচু হলো, প্রথমে ভাঁজ হলো হাঁটু জোড়া, ঘাড় থেকে শূন্যে খাড়া হলো রক্ত স্রোত।

রক্ত হিম করা হুংকার ছেড়ে বাকি দু'জনের দিকে তেড়ে গেলেন কামাল হাসান, তাঁর লোকেরা হিংস্র পশুর মত গর্জে উঠে অনুসরণ করল তাঁকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা, রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা, কিন্তু পা বাড়াতেই ওকে ধরে ফেলল মাইকেল।

'ইজি, ওল্ড চ্যাপ,' রানাকে টেনে রাখল সে। 'তোমার

বয়স্কাউট ভূমিকা এখানে কোন কাজে আসবে না।'

কয়েকশো আদিবাসী যোদ্ধা বাকি দুই ট্যাংকের বেরিয়ে আসা ক্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে জনতা, কে তাদের ঠেকাবে।

রানাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল মাইকেল। 'তোমার বা আমার কোন ব্যাপার নয়, ওল্ড চ্যাপ। খেলায় তো হারজিত আছেই—ওরা হেরে গেছে, খেসারত দিতে হবে না?' হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ওকে নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মাইকেল। চোখের সামনে নিরুপায় লোকগুলোকে মেরে ফেলছে আদিবাসী যোদ্ধারা, তার ভাল না লাগবারই তো কথা।

খানিকদূর হেঁটে এসে চঞ্চলার গায়ে হেলান দিল ওরা, দু'জনেই একটু একটু হাঁপাচ্ছে। পকেট হাতড়ে সামান্য দোমড়ানো একটা চুরুট বের করল মাইকেল, যত্নের সঙ্গে সিধে করল সেটাকে, আস্তে করে গুঁজে দিল রানার ঠোঁটে। 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, প্র্যাকটিক্যাল হবার চেষ্টা করো—ভাবাবেগ কোন কাজের জিনিস নয়। ওদের বাধা দিতে গেলে তোমাকেও ওরা ফেড়ে ফেলবে।' চুরুটটা ধরিয়ে দিল সে।

খানিক থেমে প্রসঙ্গ বদল করল মাইকেল, 'বড় সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। ট্যাংক নেই তো দুশ্চিন্তাও নেই। এখন আর গিরিখাদের মুখে শিফটাদের এক হপ্তা আটকে রাখা কোন সমস্যা নয়।'

হঠাৎ করে আবছা হয়ে গেল সূর্য, দ্রুত নেমে গেল তাপমাত্রা। দু'জনেই ওরা একযোগে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। গত এক ঘণ্টায় মেঘের বিপুল সমাবেশ পাহাড়ের মাথা থেকে সরে এসে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে, সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে গোটা পাহাড়শ্রেণীর মাথা। ডানাকিল মরুর উপরে এমন কোন

ফুটো নেই যার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। প্রান্তরের দূর প্রান্তে এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দু'এক ফোঁটা ওদের গায়েও পড়ল।

'ভাল লক্ষণ, কী?' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে উঠল মেঘ, দপ করে নিভে গেল মাইকেলের হাসি, গোটা আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি শুরু করল সরু সরু বিদ্যুৎ রেখা।

মেঘের গর্জন সত্ত্বেও আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর কান পাতল।

'মা জননী মেরীর কিরে, ব্যাপারটা অদ্ভুত!' মেঘের গুরুগুরু ডাকের ভিতর থেকে মেশিনগানের আওয়াজ আলাদাভাবে চিনতে পারছে মাইকেল, রানার দিকে তাকাতে সে-ও মৃদু মাথা ঝাঁকাল। 'ওদিক থেকে তো কোন ফায়ারিং হবার কথা নয়!' ওদের পিছন, অর্থাৎ সরাসরি যেন গিরিখাদের মুখ থেকে আসছে আওয়াজটা।

'এসো দেখি!' বলল রানা, চঞ্চলার হ্যাচ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিয়ে আলগা লাল বালির উপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির দিকে ছুটল ও।

মেঘ আর বৃষ্টি গিরিখাদের মুখ ঝাপসা করে রেখেছে, তবে মেশিনগানের আওয়াজ এখন বিরতিহীন।

'দুর্ঘটনা বা ছোটখাট কোন সংঘর্ষ নয়,' বিড়বিড় করল মাইকেল।

'ফুল-স্কেল ফায়ার ফাইট,' একমত হলো রানা, চোখে এখনও বিনকিউলার।

'কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?' বালির ঢাল বেয়ে বালিয়াড়ির মাথায় ওদের পাশে উঠে এল আব্বাস। তার পিছু পিছু আসছেন বৃদ্ধ কামাল হাসান, পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় এখনও হাঁপাচ্ছেন

তিনি।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, আব্বাস।' চোখ থেকে রানা বিনকিউলার নামায়নি।

'রহস্যময়, কী?' মাথা নাড়ল মাইকেল। 'দক্ষিণ থেকে শিফটারা এগোলে, পাহাড়ের নীচে আমাদের পজিশনের সামনে পড়বে তারা, আর উত্তর থেকে এলে গালাদের সামনে পড়বে। ওদিকে নূর আয়াঙ খুব শক্ত ঘাঁটি গেড়ে আছে। শিফটাদের সাথে ওদের যুদ্ধ হলে আমরা শুনতে পেতাম। না, গালাদের হটিয়ে দিয়ে শিফটারা আসতে পারে না...!'

'আর আমরা রয়েছি মাঝখানে,' বলল রানা। 'শিফটারা তা হলে ঢুকল কীভাবে?'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' গোলাগুলির আওয়াজ আগের মতই শোনা যাচ্ছে।

এই সময় বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলেন কামাল হাসান। দুই কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, একটু জিরিয়ে নিলেন, তারপর মুখ থেকে বের করলেন দাঁতগুলো। সাদা একটা রুমালে জড়ালেন সেগুলো, রেখে দিলেন আলখেল্লার গোপন একটা পকেটে। দাঁত খুলে নেওয়ায় তাঁর মুখের চেহারা বিধ্বস্ত দেখাল, আবার তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স ফিরে পেলেন।

বুড়ো দাদুর কাছে ধাঁধার উত্তর জানতে চাইল আব্বাস, তার আগে নিজেদের ও গালাদের পজিশন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিল সে। শুনবার সময় দুই পায়ের মাঝখানে বালিতে ঘষে তরোয়ালের ফলায় লেগে থাকা কালচে রক্ত মুছলেন তিনি। কথা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ করে, বুড়ো মানুষের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর।

‘আমার দাদু বলছেন, নূর আয়াঙ গালা হলো গণোরিয়ায় আক্রান্ত একটা হায়েনার শুকনো বিষ্ঠা,’ দ্রুত অনুবাদ করল আব্বাস। ‘তিনি আরও বলছেন, আমার কাকা, প্রিন্স হাসান সালে, তাকে বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছেন।’

‘বুঝলাম! কিন্তু এর মানে কী?’ জানতে চাইল রানা। বিনকিউলারটা আবার সারডি গিরিখাদের মুখের দিকে তুলে কিছু দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করল। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল ও, ‘ধেত্তেরি! সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! মেয়েটার কি মাথাখারাপ? কিরে খেয়ে বলল, এই একবার অন্তত নাক গলাবে না…কিন্তু ঠিকই এসে পড়েছে!’

বৃষ্টির ভিতর অস্পষ্ট, মাথার উপর ঘন কালো মেঘ নিয়ে, হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল নিতম্বিনীকে। এখনও খানিকটা দূরে, তবু রাহেলা বানুর মাথাটা পরিষ্কার চিনতে পারল রানা টারিটের উপর। বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে ছুটল ও।

‘রানা!’ এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল অ্যানির গলা, নিতম্বিনী এখনও থামেনি। ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে তার মাথা, বাতাসে তার ভিজে চুল উড়ছে, সাদা মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

‘এর মানে কী?’ রাগের সঙ্গে পাল্টা চিৎকার করল রানা।

‘গালারা!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাহাকার করে উঠল অ্যানি। ‘ওরা চলে গেছে! সবাই! চলে গেছে!’

অকস্মাৎ ব্রেক করে হ্যাচ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল অ্যানি, তাকে ধরে সিধে করল রানা।

‘কী বলছ! চলে গেছে মানে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, এইমাত্র পৌঁছুল সে।

টারিটের মাথা থেকে, জ্বলন্ত চোখ নিয়ে, জবাব দিল বানু, 'চলে গেছে মানে ধোঁয়ার মত গায়েব হয়ে গেছে। পালিয়েছে!'

'তারমানে আমাদের বাম দিকের পজিশন...?' মাইকেল হতবাক হয়ে পড়ল।

'খালি। কেউ নেই সেখানে। শিফটারা এগিয়ে এসেছে, ঢুকে পড়েছে ভিতরে, কোন গুলি খরচ না করেই। দলে দলে, শয়ে শয়ে। আমাদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসে পড়েছে গিরিখাদের মুখে।'

'রানা, আমাদের হারারি আর রাসটা গোত্রের সব ক'জন মারা পড়ত! পাইকারী গণহত্যা ঘটতে যাচ্ছিল! ওর দাদুর নামে হুকুম দেয় বানু, ডান দিকের পজিশন ছেড়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের যোদ্ধারা!'

'হায় আল্লাহ!'

'ওরা এখন লড়াই করে গিরিখাদে ফেরার চেষ্টা করছে–কিন্তু মেশিনগানের সাহায্যে গিরিখাদের মুখ কাভার দিয়ে রেখেছে শিফটারা। কী যে অবস্থা, মুখে বললে তুমি বুঝবে না! মরুভূমি ঢাকা পড়ে গেছে রক্ত আর লাশে!'

'সব শেষ! যা কিছু অর্জন করেছিলাম, এক ধাক্কায় সব হারিয়েছি! আজকের ব্যাপারটা একটা ফাঁদ ছিল, ট্যাংকগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্রমণটা ছিল বাঁ দিক থেকে–কিন্তু শিফটারা জানল কীভাবে গালারা পালিয়ে গেছে?'

'আমার দাদু যেমন বলেন, একটা সাপ বা একজন গালাকে বিশ্বাস করতে নেই।'

'রানা, আর দেরি করা উচিত নয়!' ওর হাত ধরে ঝাঁকাল অ্যানি। 'আমাদের ফেরার পথ বন্ধ করে দেবে ওরা।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'গিরিখাদে ফিরে যেতে হবে আমাদের, ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডিফেন্সের প্রথম লাইনে দাঁড় করাতে হবে

যোদ্ধাদের, তা না হলে ছুটতে ছুটতে সেই একেবারে আদ্দিস আবাবায় পৌঁছে যাবে শিফটারা।' ঝট্ করে আব্বাসের দিকে ফিরল সে। 'আমরা যদি এই লোকগুলোকে সাথে নেই,' হাত তুলে বালিয়াড়ির নীচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধনগ্ন নিরস্ত্র আদিবাসীদের দেখাল ও, 'যদি ওদেরকে গিরিখাদের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করি, শিফটা মেশিনগান সব ক'টাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যেতে পারে না ওরা, পায়ে হেঁটে ঘুর পথ ধরে গিরিখাদে পৌঁছুতে পারবে না?'

'ওরা পাহাড়ী লোক,' শান্তভাবে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আব্বাস।

'গুড। ওদের তা হলে বলে দাও, গিরিখাদে নেমে প্রথম জলপ্রপাতের কাছে যেন অপেক্ষা করে। প্রথম জলপ্রপাত, আমাদের এক হবার জায়গা।'

'আর আমরা কী করব?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

'গিরিখাদের মুখ হয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'আর্মারড কারগুলোকে সাথে না রেখে আর কোন উপায় নেই। আঁটসাঁট একটা ঝাঁক বেঁধে ছুটব আমরা। প্রার্থনা করো, শিফটারা আর্টিলারি বসানোর কাজ এখনও শেষ করার সুযোগ পায়নি। লেট'স গো!'

কামাল হাসানের পাঁজরে খোঁচা দিল মাইকেল, 'চলো।'

'গাড়িতে ওঠো,' অ্যানিকে নির্দেশ দিল রানা। 'এঞ্জিন স্টার্ট দাও। বাকি দুটো গাড়ি নিয়ে আসছি আমরা। লাইনের মাঝখানে থাকবে তোমার নিতম্বিনী, ফুলস্পীডে ছুটবে। গিরিখাদে না পৌঁছে কোন কারণেই থামবে না। বুঝতে পারছ কী বলছি?'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি।

'কী ব্যাপার, তোমার মাথায় অন্য কোন চিন্তা আছে নাকি?'

কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে কেমন ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, কী যেন বলতে চেয়েও পারছে না।

‘কী হলো, কিছু বলবে?’

বিড়বিড় করল অ্যানি, ‘রানা, আমি তোমাকে ভালবাসি।’ কিন্তু এতই ক্ষীণ কণ্ঠে যে রানা তার একটা শব্দও শুনতে পেল না বা শুনতে না পাবার ভান করবার সুযোগ পেল। রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, বাধা দিল মাইকেল।

‘বুঝতে পারছ না, কীসের মধ্যে থেকে আসতে হয়েছে ওকে?’ অ্যানির দিকে ফিরল সে, কয়েক পা এগিয়ে এসে তার একটা হাত ধরল। ‘রানার কথায় কিছু মনে কোরো না তুমি, মাথায় অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলে মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না ও। এসো, তোমাকে আমি গাড়িতে তুলে দিই।’

রানার দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অ্যানি, কোমর ধরে নিতম্বিনীর টারিটে তাকে তুলে দিল মাইকেল, ফিসফিস করে বলল, ‘দুর্লভ কোন জিনিস অপাত্রে দান করা হচ্ছে দেখলে মনে বড় ব্যথা পাই, ডার্লিং!’

মুখে কিছু বলল না, চটাস চটাস আওয়াজ তুলে ঘন ঘন হাততালি দিল বানু।

‘আরেকটা কথা,’ বলল মাইকেল, ইতিমধ্যে আব্বাসকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে রানা। ‘সব জিনিসেরই একটা মোক্ষম সময় আছে। তুমুল যুদ্ধ চলছে, চারদিকে রক্ত আর লাশ, আহত মানুষের আহাজারিতে কান পাতা দায়, যে-কোন মুহূর্তে একটা গুলি ছুটে এসে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে, এমন একটা সময়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করে দেখো–উপযুক্ত সাড়া পাবার নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিন্তু সবাই কি আর আমার মত প্রেমের কাঙাল, বলো?’

রানার গমনপথের দিকে এখনও তাকিয়ে আছে অ্যানি, সে তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে মাইকেলের দিকে ফিরিয়ে আনল। শান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছু বলছিলে আমাকে?'

'শুনতে পাওনি, কী? সেই যেদিন থেকে পরিচয় সেদিন থেকেই তো বলছি–জিনিসটা আমার দরকার,' বলে আর দাঁড়াল না মাইকেল, হন হন করে এগোল কামাল হাসানের হাত ধরে।

'লাভলি! ওয়ান্ডারফুল!' চেঁচিয়ে উঠল বানু। এখনও হাততালি দিচ্ছে সে। 'ওহ, মিস অ্যানি, আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে!'

'তোমার আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই,' ম্লান গলায় বলল অ্যানি। 'কেননা, কিছুই তুমি বোঝোনি।'

'বুঝিনি? আমি?' খিল খিল করে হেসে উঠল বানু। 'এ-কথা তুমি বলতে পারলে? জানো, এ-বিষয়ে আমি একজন এক্সপার্ট? বুঝেছি কিনা পরীক্ষা করো তা হলে। রানা একটা গবেট, বলতে পারো সে বোঝেনি। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝেছি। না, শুনতে পাইনি কিন্তু তোমার ঠোঁট নড়া দেখে জেনে ফেলেছি কী বলেছ–রানা আমি তোমাকে ভালবাসি। কী, ঠিক বলিনি?'

তবু উৎসাহ বোধ করল না অ্যানি, চেহারায় বিষাদ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। বলল, 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারায় কী লাভ, বলো? যাকে বোঝাতে চাই সে দিনে দিনে দূরে সরে যাচ্ছে...।'

'দূরে সরে যাচ্ছে? রানা?' আকাশ থেকে পড়ল বানু। 'কী বলছ তুমি, মিস অ্যানি?'

'ঠিকই বলছি, বানু।' মাথা নিচু করল অ্যানি। 'রানা কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। বেশ বুঝতে পারছি...।'

'এটা নিয়ে এত চিন্তা কোরো না তো!' পরামর্শ দিল বানু। 'তাই যদি হয়, তারও ওষুধ আছে। রানাকে আপাতত বাদ দাও,

প্রথম প্রেমিক হিসেবে মাইকেলকে গ্রহণ করো তুমি। ঈর্ষার আগুনে পুড়ুক রানা, তারপর দেখবে... ।'

কথা না বলে অ্যানি শুধু মাথা নাড়ল।

'তা হলে টোপ ফেলো! সত্যিকার টোপ। যা দেখলে পুরুষমানুষের মাথার ঠিক থাকে না!' ফিসফিস করে বুদ্ধি দিল বানু, ঠোঁটে ষড়যন্ত্রের হাসি। 'বাঘকে রক্তের স্বাদ পেতে দাও!'

'ভেবেছ দিইনি?' মুখে নয়, মনে মনে বলল অ্যানি। 'কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও। এরপর কী করব, আমি জানি না।' মুখে বলল, 'এ-প্রসঙ্গ থাক, বানু। সামনে ভারি বিপদ!'

চোদ্দো

ক্লান্ত আর নির্জীব হয়ে পড়েছেন কামাল হাসান, তাঁকে টেনে ঢালের উপর তুলতে হিমশিম খেয়ে গেল মাইকেল। পায়ে বেধে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে ভেবে তাঁর কাছ থেকে তরোয়ালটা চাইল সে, কিন্তু বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে বিপুলবেগে মাথা ঝাঁকালেন, বোঝাতে চাইলেন নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে রাজি নন তিনি।

হঠাৎ ওদের মাথার উপর আকাশে একটা শব্দ হলো, যেন নরকের সমস্ত বাতাস ছুটে এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল স্বর্গটাকে। তীক্ষ্ণ শব্দটা পাশ কাটাল, ওদের সামনে আর পাশে ঢালের গায়ে বিস্ফোরিত হলো বালি আর অগ্নিশিখা, টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠল আর্মারড কারের পঞ্চাশ ফিট নীচে।

'কামান!' বলল মাইকেল। 'এবার রওনা হতে হয়, ওল্ড ম্যান!' বৃদ্ধের পিঠে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আর

দরকার হলো না। কামানের গোলা বিস্ফোরিত হতে দেখে সাহস ও শক্তি দুটোই ফিরে পেয়েছেন তিনি, শূন্যে লাফ দিলেন একটা, গলা চিরে বেরিয়ে এল রণহুংকার, আলখেল্লার গোপন পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন নকল দাঁতের খোঁজে।

'আরে করো কি, না!' আঁতকে উঠে দু'হাত বাড়াল মাইকেল, অনেক কষ্টে আবার জাপটে ধরল বৃদ্ধকে, টেনে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। কামাল হাসান খেপে গেছেন, পায়ে হেঁটে নাঙ্গা তরোয়াল হাতে যুদ্ধযাত্রা করতে চান। মাইকেল তাঁকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কী হবে, পিছন ফিরে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশে বিরতিহীন রণহুংকার ছাড়ছেন তিনি।

পরবর্তী গোলাটা বিস্ফোরিত হলো চূড়ার অনেক সামনে, আওয়াজ পেলেও দেখতে পেল না ওরা।

'প্রথমটা কম দূরত্ব পেরোল, দ্বিতীয়টা বেশি,' বিড়বিড় করল মাইকেল, কামাল হাসানকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হিমশিম খাচ্ছে সে। 'তৃতীয়টা কোথায় পড়বে?'

প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় এল সেটা। এল ধূসর রঙা প্রান্তরের উপর দিয়ে ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে, নিচু মেঘের ভেলা ভেদ করে, আকাশ কাঁপিয়ে। ভিতরে ঢুকল টারিটের পিছন দিয়ে, গাড়ির মোটা প্লেট ভেঙে। বিস্ফোরিত হলো ক্যাব-এর ইস্পাত মেঝেতে।

কাগুজে ঠোঙার মত ফেটে গেল গাড়িটা। সঙ্গে আগুনের লালচে শিখা আর কমলা রঙের ধোঁয়া নিয়ে গোটা টারিট আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল।

হ্যাঁচকা টানে কামাল হাসানকে বালির উপর ফেলে দিল মাইকেল, তাঁর পিঠের উপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ল নিজে।

ওদের চারদিকে আগুন আর ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরল কয়েক সেকেন্ড, তারপর আবার মাইকেলের নীচে মোচড় খেতে শুরু করলেন কামাল হাসান। কিন্তু মাইকেল তাঁকে ছাড়ল না, সে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আর্মারড কারের দিকে। বিধ্বস্ত খোল থেকে বেরিয়ে এল চোখ-ধাঁধানো আলোকমালা–গ্যাসোলিন আর ভিকার্সের অ্যামুনিশন আতসবাজির মত ছুটোছুটি শুরু করল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ এক সময় থামল। সাবধানে মাথা তুলে তাকাল মাইকেল। সেই মুহূর্তে আরেকটা অ্যামুনিশন বেল্টে আগুন ধরল, সাদা ট্রেসার ছুটে এল ওদের দিকে। ঝট করে আবার মাথা নামিয়ে নিল মাইকেল।

'উঠে পড়ো, কামাইল্যা, দোস্তো,' অবশেষে বলল মাইকেল। 'চলো দেখি, লিফট নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় হয় কিনা।' এই সময় সগর্জনে অপর দিকের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এল কুৎসিতদর্শন চঞ্চলা, ওদের মাথার উপর ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'গড!' চিৎকার করল রানা, ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে মাথা তুলল ও। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে মারা গেছে ভাগ্যদেবী! ভাবলাম, যাই, টুকরোগুলো পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

কামাল হাসানকে তুলে দিয়ে, নিজেও আঁচড়ে-খামচে চঞ্চলার টারিটে উঠে পড়ল মাইকেল। 'ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'তোমাকে আমার শোধ করতে হবে দুটো ঋণ।'

'হিসাবটা পাঠিয়ে দেব,' কথা দিল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করল, চঞ্চলার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল একটা গোলা, বিস্ফোরিত হলো চূড়ার এক কোণে। চোখেমুখে বালি আর ধোঁয়ার ধাক্কা খেলো ওরা।

‘বেঁচে থাকার স্বার্থে আমাদের বোধহয় এখান থেকে নড়া দরকার, কী?’ মৃদুকণ্ঠে বলল মাইকেল। ‘অবশ্য তোমার যদি অন্য কোন প্ল্যান না থাকে।’

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করল চঞ্চলা, নীচের শক্ত মাটিতে নেমে এসে দিক বদলাল রানা, মেঘ আর বৃষ্টি ঢাকা গিরিখাদের মুখ লক্ষ্য করে ছুটল।

ওদেরকে আসতে দেখল অ্যানি, ওদের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখায় সে-ও রওনা হলো। সমতল প্রান্তর ধরে পাশাপাশি ছুটল জোড়া আর্মারড কার, বৃষ্টির ভিতর দিয়ে আবার সগর্জনে ধেয়ে এল একটা গোলা, বিস্ফোরিত হলো ওদের পঞ্চাশ ফুট সামনে, ধূমায়িত গর্তটাকে এড়াবার জন্য সামান্য দিক বদলাতে হলো ওদেরকে।

‘দেখতে পাচ্ছ, ব্যাটারিটা কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

হ্যাচের উপর ওয়েল্ডিং করা একটা আংটা ধরে নিজেকে খাড়া রেখেছে মাইকেল, মুখে বৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, চোখ জোড়া কোঁচকানো। ‘সম্ভবত গালাদের ছেড়ে যাওয়া পজিশনে রয়েছে ওরা, যত্ন করে খোঁড়া আর্মার ট্রেঞ্চগুলোয়।’

‘সরাসরি ওদের ওপর হামলা করা সম্ভব?’ পরামর্শ চাইল রানা।

‘না, ওল্ড চ্যাপ। পজিশনগুলো আমার নির্বাচিত, সাংঘাতিক নিরাপদ। সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকেই চলো−ভেতরে দ্বিতীয় পজিশনটাই আমাদের একমাত্র ভরসা, জলপ্রপাতের ধারে।’ বৃদ্ধ কামাল হাসান গাড়ি থেকে অর্ধেকটা ঝুলছেন, তাঁর পেটে একটা হাঁটু গেড়ে রেখেছে মাইকেল। ‘এই শালার বুড়ো আমাকে জ্বালাতন করে মারল!’

পেটে হাঁটু নিয়ে ঝুলে থাকলে কী হবে, দ্রুতগতি গাড়িতে চড়বার আনন্দে দাঁতহীন মাড়ি বের করে নিঃশব্দে হাসছেন কামাল হাসান, নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবার সম্ভাবনা থাকায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর। মাইকেলের পাঁজরে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি, বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'আরও ভাল থাকতে পারলে ভাল হত, ওল্ড বয়,' খেদ প্রকাশ করল মাইকেল, পরমুহূর্তে ঝট করে মাথা নিচু করল সে, প্রায় মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল পরবর্তী শেলটা।

'ব্যাটারা উন্নতি করছে,' ক্ষোভের সুরে বলল সে।

'প্র্যাকটিস করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছে,' পাল্টা চিৎকার করল রানা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল মাইকেল, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে!' সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মেঘ, গোটা প্রান্তর বৈদ্যুতিক সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে শুরু হলো মুষলধারে তুমুল বৃষ্টি।

'অবিশ্বাস্য, মেজর সেভারস! তাজ্জব ব্যাপার!' রানার পাশ থেকে বলল আব্বাস। 'আপনি জাদু জানেন নাকি?'

'এ কিছু না, মাই সান,' কৃতিত্বের দাবিদার হতে অস্বীকৃতি জানাল মাইকেল। 'বলতে পারো, এ স্রেফ ওপরওয়ালার সাথে সরাসরি যোগাযোগ।'

বৃষ্টি যেন সাদা ঘন কুয়াশা, ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। আন্দাজের উপর গাড়ি চালাচ্ছে রানা, চারদিকে বিশ গজের বেশি কী আছে দেখবার উপায় নেই। মুষলধারে বৃষ্টি শুরুর পর থেকে শিফটারা কামান দাগছে না, টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে তারা।

খানিক পর বিস্ময় প্রকাশ করল মাইকেল, 'গুড লর্ড, আর কতক্ষণ এরকম চলবে?' ভিজে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

‘চার মাস,’ পাল্টা চিৎকার করল আব্বাস। ‘এখন থেকে চারমাস চলবে একটানা।’

‘কিংবা তুমি যতক্ষণ না থামতে বলো,’ বলল রানা, ওর ভিজে আর ক্লান্ত চেহারায় নিঃশব্দ হাসি ফুটল, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল পাশের গাড়িটার দিকে।

নিতম্বিনীর টারিট থেকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করল ওকে বানু। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে, অর্ধেক শরীর হ্যাচের ভিতর। ভিজে কাপড় সেঁটে আছে বুকের সঙ্গে, স্তন জোড়া মনে হচ্ছে উন্মুক্ত, গাড়ির ঝাঁকির সঙ্গে সেগুলোও লাফাচ্ছে অনবরত।

হঠাৎ করে বৃষ্টিতে ঝাপসা সামনের প্রান্তর ছুটন্ত মূর্তিতে ভরে উঠল। রাসটা আর হারারি গোত্রের প্রতিটি যোদ্ধা লম্বা আলখেল্লা পরে রয়েছে, হাতে অস্ত্র, হোঁচট খেতে খেতে দৌড়াচ্ছে সবাই গিরিখাদের মুখের দিকে।

টারিটে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিল আব্বাস, কথা শেষ করে রানাকে বলল, ‘ওদের বললাম, প্রথম জলপ্রপাতের নীচে পজিশন নেব আমরা–খবরটা ওরা ছড়িয়ে দেবে।’

আদিবাসী যোদ্ধাদের উদ্দেশে আবার কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল সে, এই সময় আঁতকে উঠল রানা, ব্রেক করল, লাশের একটা বিশাল স্তূপকে পাশ কাটাবার জন্য ঘুরিয়ে নিল চঞ্চলাকে।

‘এখানেই শিফটা মেশিনগানাররা পায় ওদেরকে,’ নিতম্বিনীর টারিট থেকে চিৎকার করে জানাল বানু, আর ঠিক যেন তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য ঘন বৃষ্টি ভেদ করে ভেসে এল মেশিনগানের আওয়াজ।

লাশের স্তূপ অসংখ্য, সেগুলোকে এড়ানোর জন্য কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকতে হলো রানাকে, তারপর সুযোগ পেয়ে ঘাড়

ফেরাল নিতম্বিনীর দিকে, জানতে চায় অ্যানি ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছে কিনা।

'আরে, কী ব্যাপার!' রানা বুঝতে পেরেছে ওরা একা। 'গেল কোথায়!' চঞ্চলাকে দাঁড় করাল ও। 'এমন বেয়াদপ মেয়ে তো দেখিনি!' পিছন দিকে ছুটল আর্মারড কার, সগর্জনে। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই দেখছে না ও।

ওর পিছন থেকে সকৌতুকে বলল মাইকেল, 'তোমার কথায় একটু যেন হতাশার সুর, কী?'

'এমন হতে পারে,' বলল রানা, 'ওকে পাবার পর উপলব্ধি করব না পাওয়াই ভাল ছিল! স্বাধীনচেতা একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতে ভারি মজা, কিন্তু তার সাথে ঘর বাঁধা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ।'

'তারমানে কী, প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছ তুমি, ওল্ড চ্যাপ?'

'জীবন থাকতে নয়!' ঘোষণা করল রানা, জানে ওর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সামান্য আভাস পেলেও অপমানিত বোধ করবে মাইকেল।

'ও, বুঝেছি!' মাইকেল গম্ভীর হলো। 'আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেয়াটাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তারপর হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কী?'

'সেটা কী তোমারও উদ্দেশ্য নয়, মাইকেল?'

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল মাইকেল। দৃঢ়কণ্ঠে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলল সে, 'না। অ্যানিকে আমি যদি জয় করতে পারি, আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হবে ও। ওকে সুখী দেখার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করব আমি।'

মাইকেলের কথা শুনে আনন্দে ভরে উঠল রানার বুক। একটা ব্যাপারে কোন খাদ নেই, রানা অ্যানিকে সত্যি ভালবাসে। এ

ভালবাসা পবিত্র এবং দৈহিক মিলনের ঊর্ধ্বে। অ্যানি সুখী হলে ওর চেয়ে বেশি খুশি হবে না কেউ।

বৃষ্টির ভিতর হঠাৎ দেখা গেল নিতম্বিনীকে। মাইকেল গুঙিয়ে উঠল, 'ও মাই গড!'

নিতম্বিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে, অ্যানি আর বানু গাড়ির নীচে। অসংখ্য লাশের ভিতর ছুটোছুটি করছে দু'জন, নিহতদের ভিড়ে যারা আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছে হামাগুড়ি দিয়ে আর্মারড কারে ঢোকো। রক্তাক্ত এক যোদ্ধাকে ধরাধরি করে তুলল ওরা, নিতম্বিনীর দিকে এগোল, আহতরা অনুসরণ করল ওদের।

'অ্যানি, চলে এসো!' হাঁক ছাড়ল রানা।

'তুমি চাও, এদের এখানে ফেলে যাই আমরা?' পাল্টা চিৎকার করল অ্যানি।

এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না রানা, লক্ষ করল মাইকেল ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'জলপ্রপাতের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে হবে আমাদের,' ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করল ও। 'আহতদের এখুনি সাথে না নিলেও চলবে, কারণ শিফটারা ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের যোদ্ধারা যারা বেঁচে আছে তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমরা দ্বিতীয় পজিশনে পৌঁছুতে পারি কিনা তার ওপর...,' কিন্তু বৃথাই ব্যাখ্যা করছে রানা, মেয়ে দুটো ওর দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'অ্যানি!' আবার ডাকল রানা।

'তোমরা যদি সাহায্য করো, সময় আরও কম লাগবে,' জবাব দিল অ্যানি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চঞ্চলার টারিট থেকে নেমে এল রানা, মাইকেল আর আব্বাসও তাকে অনুসরণ করল।

আহত রাসটা আর হারারি যোদ্ধাদের তোলা হলো দুটো আর্মারড কারে। গাড়ি দুটোর খোল ভরাট হবার পর সন্তুষ্ট হলো অ্যানি।

'পনেরো মিনিট নষ্ট করলাম,' ঘড়ি দেখে বলল মাইকেল। 'এই দেরির কারণে আমরা মারা যেতে পারি, হারাতে পারি গিরিখাদটা।'

'ওগুলোর চেয়ে এই কাজটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল অ্যানি, আর কিছু শুনবার অপেক্ষায় না থেকে স্টার্ট দিল সে, ছেড়ে দিল গাড়ি।

সামনে আরও আহত লোক দেখল ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে পথের সামনে চলে এল, হাত তুলে কাতর অনুরোধ করল তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আর কাউকে নেওয়ার জায়গা নেই। করুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কারও কিছু করবার থাকল না।

একবার বৃষ্টির বেগ কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় চারদিকে এক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হলো ওদের দৃষ্টিসীমা, সেই সঙ্গে মঞ্চে ফেলা স্পটলাইটের মত এক টুকরো রোদ আলোকিত করে তুলল ওদেরকে, চকচকে আলো নিয়ে হেসে উঠল ইস্পাতের খোল। সঙ্গে সঙ্গে শিফটাদের মেশিনগান গর্জে উঠল মাত্র দুশো গজ দূর থেকে, বুলেটের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল দশ-বারোজন যোদ্ধা, পরমুহূর্তে ঝপ করে নেমে এল বৃষ্টির ঘন পর্দা, আবার আড়াল হয়ে গেল সব।

গিরিখাদের নীচে মেইন ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা, চারদিকে সব এলোমেলো হয়ে আছে। কামানের অসংখ্য গোলা আর মেশিনগানের হাজার হাজার গুলি বিশাল ক্যাম্পটাকে মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে দিয়েছে। ঘোড়ার লাশ আর নিহত মানুষ কাদার ভিতর আংশিক ডুবে আছে, এখানে সেখানে পথ ভোলা দু'একটা কুকুর বা হারিয়ে যাওয়া এক-আধটা শিশু ছাড়া জ্যান্ত প্রাণী বলতে কোথাও কিছু নেই।

ক্যাম্পের চারদিকে পাথুরে মাটিতে ছাড়া ছাড়াভাবে এখনও যুদ্ধ চলছে, ঢালের গায়ে শিফটাদের ইউনিফর্ম আর মাজল-ফ্ল্যাশ দেখতে পেল ওরা। মাঝে মধ্যেই একেকটা শেল সগর্জনে ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে, দৃষ্টিসীমার বাইরে কোথাও বিস্ফোরিত হলো।

'সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকে চলো,' টারিট থেকে বলল মাইকেল। 'এখানে থেমো না।'

কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে এগোল চঞ্চলা, যে ঢালগুলোয় যুদ্ধ চলছে তার নীচে ও আড়ালে রয়েছে পথটা। সারডি নদী পেরোল ওরা, হাঁ করে থাকা গিরিখাদের বিশাল মুখের দিকে এগোল।

'আমার লোকেরা ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে!' গর্বের সঙ্গে চিৎকার করল আব্বাস। 'গিরিখাদ নিজেদের দখলে রেখেছে ওরা! ওদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের ঠিকানা প্রথম জলপ্রপাত,' রানার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এই প্রথম গলা চড়াল মাইকেল। 'ওরা লড়ছে, ভাল কথা–কিন্তু শিফটাদের এখানে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বিশেষ করে কামান চলে আসার পর। প্রথম জলপ্রপাতে জড়ো হতে পারলে আমাদের আশা আছে।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, কিন্তু যেখানে থাকবার কথা সেখানে নিতম্বিনীকে দেখতে পেল না। 'সর্বনাশ হয়েছে! আবার!'

'কী ব্যাপার, মাইকেল?' হ্যাচ থেকে মাথা তুলল রানা, উদ্বিগ্ন।

‘ওরা আবার…!’

‘কারা…?’ জিজ্ঞেস না করলেও চলত রানার, কারণ ঘাড় ফেরাতেই নিতম্বিনীকে দেখতে পেল ও, পথ ছেড়ে বাঁক নিয়েছে অ্যানি, আর্মারড কার নিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে ক্যাম্পের দূর প্রান্তে।

‘ধরো ওটাকে!’ গর্জে উঠল মাইকেল। ‘সামনে গিয়ে বাধা দাও!’

চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিল রানা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিতম্বিনীর পথরোধ করবার জন্য ছুটল। গাছপালা আর বৃষ্টির ভিতর হারিয়ে গেল নিতম্বিনী।

পাঁচ মিনিট পর আবার সেটাকে দেখা গেল, ভাঙাচোরা তাঁবুর পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তৈজস-পত্র, কাপড়চোপড়, খাবার দাবার। টারিটে উবু হয়ে বসে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় লক্ষ্য করে ভিকার্স মেশিনগান থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করছে বানু, জবাবে শিফটাদের তরফ থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো সশব্দে লাগছে ইস্পাতের খোলে। ছুটন্ত শিফটা সৈনিকদের দু'একজনকে দেখতে পেল রানা, চঞ্চলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আব্বাসকে সুযোগ করে দিল গুলি করবার।

কিছু বলতে হলো না, থেমে থেমে গুলি করল আব্বাস। ঝোপঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেল শিফটারা। হ্যাচ থেকে বেরিয়ে টারিটে দাঁড়াল রানা, চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল নীচের দিকে।

নিতম্বিনী থেকে বেরিয়ে এসেছে অ্যানি উইসপার, মুষলধারে বৃষ্টি আর থকথকে কাদার ভিতর ঘুর ঘুর করছে সে, যেন মেশিনগানের গুলি সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

'অ্যানি!' সংবিৎ ফিরে পেয়ে ডাকল রানা।

অ্যানি তাকাল না, কাদার ভিতর থেকে কী যেন একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সে, চিৎকার করে উঠল উল্লাসে। এতক্ষণে ওদের দিকে ফিরল সে, নিতম্বিনীর দিকে ছুটল, কয়েক ফুট দূর থেকে পাশ কাটাল রানাকে।

'এসব কী শুরু করেছ তুমি...,' রাগের সঙ্গে বলল রানা।

'টাইপরাইটার আর টয়লেট ব্যাগ,' ব্যাখ্যা করল অ্যানি, দুটোই সে বুকের সঙ্গে শক্ত করে ধরে আছে। 'একটার ভেতর রয়েছে আমার মেক-আপ, আর দ্বিতীয়টা ছাড়া কাজ করব কীভাবে, তুমিই বলো?' এরপর ভিজে বিড়ালের মত হাসল সে। 'এবার আমরা যেতে পারি, ধর্মাবতার জনাব মাসুদ রানা।'

গিরিখাদের ভিতর ক্রমশ উপর দিকে উঠে গেছে পথ, ঢালু পথে কাকভেজা মানুষ আর পশুর বিশৃংখল মিছিল। ভেজা পাথরে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে ঘোড়া আর গাধার। বারোটা উটের পিঠে ভিকার্স মেশিনগানগুলোকে দেখতে পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা, কাঁধে টোকা দিয়ে আরও কয়েকটা উটের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মাইকেল, সেগুলো অ্যামুনিশনের বাক্স বহন করছে। তার লোকেরা যার যার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছে। মেশিনগান বা অ্যামুনিশনের বাক্স হাতছাড়া করেনি।

'ওদের সাথে যাও, আব্বাস,' নির্দেশ দিল রানা। 'দেখবে ওগুলো যেন নিরাপদে প্রথম জলপ্রপাতের নীচে পৌঁছায়।' লাফ দিয়ে চঞ্চলা থেকে নেমে গেল আব্বাস। গাড়ি দুটো মিছিলের সঙ্গে ধীরগতিতে এগোল।

'ওরা কি আর যুদ্ধ করতে পারবে?' সন্দেহ প্রকাশ করল

মাইকেল, তাকিয়ে আছে বিধ্বস্ত যোদ্ধাদের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজে হি-হি করে কাঁপছে সবাই।

'পারবে,' আশা প্রকাশ করল রানা, তাকাল গোত্রপ্রধান কামাল হাসানের দিকে। 'আপনি কী বলেন?'

আলখেল্লার আস্তিন সরিয়ে বাহুর পেশী ফুলিয়ে রানাকে দেখালেন কামাল হাসান। রণহুংকার ছাড়লেন তিনি, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

প্রথম জলপ্রপাতের নীচে চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, সাবধানে মোড় ঘুরল চঞ্চলা।

'এখানে থামো,' বলল মাইকেল, কামাল হাসানকে নিয়ে নেমে গেল সে।

গাড়ির মাথা থেকে রানা বলল, 'দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাওয়া দরকার, মাইকেল।'

দাঁড়াল মাইকেল, ঘুরল, মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'বলো।'

'গাড়ি নিয়ে তুমি আর অ্যানি সারডি শহরে চলে যাও,' ইঙ্গিতে খোলের ভিতরটা দেখাল রানা, 'ওদের চিকিৎসা দরকার। যে-কোন বড় একটা বাড়ি দখল করবে, হাসপাতাল বানাবে সেটাকে। কাজটা বরং অ্যানির ওপর ছেড়ে দাও, ব্যস্ত থাকলে মাথায় কুবুদ্ধি চাপবে না। যদি দেখো তাতেও কাজ হচ্ছে না, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে ওকে-,' হাসল রানা, পরমুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠল চেহারা। 'প্রিন্স হাসান সালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। এখানকার পজিশন সম্পর্কে জানাবে তাকে। বলবে গালারা পালিয়েছে, চেষ্টা করে আমি বড়জোর এক হপ্তা দখলে রাখতে পারব গিরিখাদ। বলবে, অ্যামুনিশন দরকার আমাদের-দরকার খাবার, ওষুধ, কম্বল। সাপ্লাই সহ একটা ট্রেন যদি সারডিতে

পাঠাতে পারে, সবচেয়ে ভাল হয়। ট্রেন পেলে আহতদেরও আমরা পাঠাতে পারব...।'

'কিন্তু এ-সব দায়িত্ব তুমি আমাকে কেন দিচ্ছ?' মাইকেল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, মোটেও বিস্মিত হয়নি। 'মেজর বলতে এখানে একমাত্র আমি, কী? যুদ্ধ করার দায়িত্ব তো আমার পাবার কথা!'

'তাও পাবে,' জবাব দিল রানা। 'কাজগুলো সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছ তুমি। আসার সময় যত বেশি সম্ভব খাবারদাবার নিয়ে আসবে,' ইঙ্গিতে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধাদের দেখাল ও। 'খালি পেটে এরা যুদ্ধ করবে কীভাবে?'

'সব ঠিক আছে,' বলল মাইকেল। 'কিন্তু সারডিতে কে যাবে তা জানার জন্যে টস করতে হবে, ওল্ড চ্যাপ।'

'কেন, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভেবেছ শিফটাদের আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারব না?'

'তোমার সামরিক অভিজ্ঞতার ওপর আমার শ্রদ্ধা আকাশচুম্বি, ওল্ড চ্যাপ,' ততধিক গম্ভীর সুরে বলল মাইকেল। 'স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমার—আমি বিশেষ করে রণকৌশল সম্পর্কে বলছি। তবে কথা হলো, এই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করছে না, এই যা। টস করে দেখা যাক, ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।' পকেটে হাত গলিয়ে তাঞ্জানিয়ান শিলিংটা বের করল সে।

চঞ্চলার টারিট থেকে এক লাফে নেমে পড়ল রানা। 'টস যদি করতে হয়, আমি করব,' বলে মাইকেলের হাত থেকে একরকম

প্রায় কেড়ে নিল শিলিংটা।

‘হেডস!’ ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি নিয়ে বলল মাইকেল।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের তালুতে নিল রানা। মুখ তুলল ধীরে ধীরে।

ভারি গলায় হেসে উঠল মাইকেল, ‘তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড চ্যাপ, কী?’

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে আবার চঞ্চলার টারিটে উঠে পড়ল রানা।

‘শোনো হে,’ কামাল হাসানের কাঁধে হাত রেখে রানার দিকে মুখ তুলল মাইকেল, ‘যদি পারো কিছু চুরুট নিয়ে এসো। ধোঁয়া না গিলে প্রাণত্যাগ করতে আমার কষ্ট হবে। দেখো, বৃষ্টিতে আবার ভিজিয়ে ফেলো না যেন। আর, হ্যাঁ, আমার সম্পত্তিটার দিকে একটু নজর রেখো–কিন্তু সাবধান, খুব বেশি নজর যেন না পড়ে...!’

চঞ্চলাকে পিছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো রানা, দেখল যোদ্ধাদের বিশৃংখল ভিড়টাকে খেদিয়ে পজিশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে মাইকেল।

মাথার উপর তরোয়াল খাড়া করে রণহুংকার ছাড়লেন বৃদ্ধ কামাল হাসান। রানার দিকে চেয়ে বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

পনেরো

হাইল্যান্ডের উপর ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, দুই দিন আর তিন রাত ধরে বিরতিহীন বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। কমিউনিস্টদের বিশাল একটা বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রওনা

হয়েছিল, মেঘ আর বৃষ্টি প্রথম দলটাকে রক্ষা করেছে। আম্বা আরাডাম-এর কাছাকাছি ছিল দ্বিতীয় দলটা, আকাশে মেঘ না থাকায় ক্যাপরোনি বম্বারগুলো নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় পায় তাদের, বোমা বর্ষণের পর যারা বেঁচেছিল তারা প্রাণ হারায় শিফটা বাহিনীর অতর্কিত হামলায়। দশ হাজার শিফটাকে নিয়ে ডেসি রোডের দিকে রওনা হয়েছে জেনারেল ফাদ আর মি. এক্স। পনেরো হাজার কমিউনিস্টকে খতম করে এখন তারা ধাওয়া করছে প্রথম দলটাকে, আম্বা আরাডাম থেকে আগেই যারা রওনা হয়ে গেছে।

হাইল্যান্ডের আকাশ মেঘে ঢাকা হলে কী হবে, প্রিন্স হাসান সালে ক্যাপরোনি বম্বারগুলোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে বিরতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্কর দিচ্ছে ওগুলো, ক্ষুধার্তের মত খুঁজছে মেঘের গায়ে কোন ফাঁক পাওয়া যায় কিনা। মেঘ সরে গেলে কী লোভনীয় টার্গেটই না পাবে তারা—ডেসি রোডের বারো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কমিউনিস্ট বাহিনীর আঠারো হাজার গেরিলা। থকথকে কাদায় পথ চলা দায়, যোদ্ধারা ঠাণ্ডায় কাঁপছে, পেট খালি, মনে ভয় যে-কোন মুহূর্তে পিছন থেকে ঝাপিয়ে পড়বে শিফটা ট্যাংক বা আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুনে বোমা।

তুমুল বৃষ্টি শিফটাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে। কাদা আর গর্তের ভিতর তাদের প্রকাণ্ড ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো ঘন ঘন আটকা পড়ছে, শুকনো নালাগুলো ভরে উঠেছে তীব্রগতি পানিতে। ভাড়াটে ইটালিয়ান এঞ্জিনিয়ারদের বিশ্রাম নেই, প্রতি দু'পাঁচশো গজ পরপর একটা করে ব্রিজ তৈরি করতে হচ্ছে তাদের।

কমিউনিস্ট বাহিনীর এই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছিল মাহমুদ

বাশার, সামরিক ট্রেনিং থাকায় সদ্য দলভুক্ত প্রিন্স হাসান সালেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে। ডেসি রোড ধরে ছোট একটা দল নিয়ে সারডিতে পৌঁছুনোর কথা হাসান সালের, বাহিনীর সিংহভাগ চলে যাবে লেক টানার দিকে, যেখানে সেলাসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে কমিউনিস্টদের মূল শক্তি। কিন্তু দলত্যাগী গালাদের অতর্কিত এক হামলায় প্রাণ হারিয়েছে মাহমুদ বাশার, নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রিন্সের হাতে। কমিউনিস্টদের হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরী বার্তা এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। বাহিনীর গতি মন্থর হলেও, প্রিন্স হিসাব করে দেখেছে, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুতে পারবে সে।

কাদায় লেপা ফোর্ড সেডান-এর ব্যাক সিটে বসে রয়েছে প্রিন্স, গায়ে ভিজে গ্রেটকোট, গাড়ির ভিতর বৃষ্টি না থাকলেও ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে তার হাত, শেষ কবে ঘুমিয়েছে মনে করতে পারছে না।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে প্রিন্স হাসান সালে। পনেরো হাজার দক্ষ-অদক্ষ গেরিলা যোদ্ধা রয়েছে তার দায়িত্বে। তাদের নিয়ে সময় মত লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। পিছনে ধাওয়া করে আসছে জেনারেল ফাদ আর তার বিশাল বাহিনী। সামনে কী অবস্থা তার জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারে সে—শিফটাদের ডানাকিল কলাম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সারডি গিরিখাদ দখল করে নিয়েছে, কিংবা হয়তো উঠে এসেছে সারডি শহরে। সে জানে, কামাল হাসানের ক্ষুদে বাহিনী সমতল প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে গিরিখাদের মুখ দখল করে রাখতে। তার ভয়, রানা আর মাইকেলের ভঙ্গুর প্রতিরোধ তছনছ করে দিয়ে এক পাল হিংস্র নেকড়ের মত ডেসি রোডে ছুটে

আসবে শিফটারা, কমিউনিস্ট বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তার আরও একটা ভয়, দলত্যাগী গালাদের নিয়ে। রাসটা আর হারারি নেতৃত্ব তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করেছিল। আম্বা আরডামে যেমন, তেমনি ডানাকিল মরুতেও বেঈমানী করেছে তারা। ডেসি রোডের দু'পাশে পাহাড়ী ঢাল আর গুহার আড়ালে লুকিয়ে আছে দলত্যাগী গালারা, সুযোগ পেলেই কমিউনিস্টদের ছোটখাট দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ-ধরনের একটা আক্রমণেই নিহত হয়েছে মাহমুদ বাশার। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল প্রিন্স—সারডি গিরিখাদ বা সারডি শহরে রানা আর মাইকেলের বিরুদ্ধে নূর আয়াঙ গালা কী করছে কে জানে।

সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল প্রিন্স। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক মাঝখানে দেখা গেল রেল লাইন। সন্তুষ্ট বোধ করল সে, ড্রাইভারের দিকে ফিরে গাড়ির স্পীড বাড়াতে বলল। যোদ্ধাদের মিছিল দু'পাশে রেখে সামনে এগোল ফোর্ড সিডান।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিঙে পৌঁছুল গাড়ি, রাস্তার ধারে অপেক্ষারত গেরিলা অফিসারদের পাশে থামল ড্রাইভার। মাথায় হ্যাট পরে গাড়ি থেকে নামল প্রিন্স, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল অফিসাররা। কার কী দরকার, নতুন দুঃসংবাদ, অস্তিত্বের পক্ষে হুমকিস্বরূপ পরিস্থিতি, সবাই এক যোগে জানাতে শুরু করল। শুনতে শুনতে মন আরও খারাপ হয়ে গেল প্রিন্সের।

ওরা না থামা পর্যন্ত চুপ করে শুনল প্রিন্স, তারপর বলল, 'সারডির টেলিফোন লাইন এখনও খোলা?'

'গালারা এখনও ওটা কাটেনি। ওটা রেললাইন ধরে যায়নি, গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, সেজন্যেই বোধহয় এখনও ওদের

নজরে পড়েনি।’

‘সারডি স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করো, ওখানে কারও সাথে আমার কথা বলতে হবে। গিরিখাদে কী ঘটছে জানতে হবে আমাকে।’

রেললাইনের ধারে অফিসারদের রেখে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো প্রিন্স, গাড়িতে বসে সে তার বাবা, মেয়ে, ভাই আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবল। মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে তারা, বেঈমান গালা আর অত্যাচারী শিফটাদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর গাড়ির পাশে ছুটে এল একজন টেকনিশিয়ান। ‘কমরেড, সারডির লাইন খোলা। আপনি কথা বলবেন?’

সারডি-ডেসি টেলিফোন লাইনে একটা ফিল্ড-টেলিফোন ফিট করা হয়েছে। মাথার উপর টেলিগ্রাফ পোল থেকে ঝুলছে তামার তার। হ্যান্ডসেটটা ধরিয়ে দেওয়া হলো প্রিন্সের হাতে।

সারডি রেলওয়ে চত্বরে, স্টেশন মাস্টারের অফিস কামরার পাশে, লম্বা গুদাম ঘরে ঠাঁই পেয়েছে ছয়শো আহত যোদ্ধা। টিনের ছাদ বহু জায়গায় ফুটো, বৃষ্টির পানি অনবরত ঝরছে। অল্প কিছু গমের বস্তা ছাড়া গোটা গুদাম খালিই ছিল, আহতদের জায়গা করে দিতে অসুবিধে হয়নি। তবে বিছানা, কম্বল, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই, চটের খালি বস্তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

নরক কি এরচেয়ে খারাপ কিছু? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কোন আড়াল বা সরঞ্জাম নেই, পানি নেই, নেই অ্যান্টিসেপটিক, ওষুধ, শুকনো কাপড় বা গরম খাবার। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। আহতদের চিৎকারে কান পাতা দায়। দুর্গন্ধে প্রাণ বাঁচে না।

দু'দিন আগে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে অ্যানি উইসপার। সেই থেকে সার সার পড়ে থাকা আহতদের মাঝখানে কেটে গেছে তার সময়, অতীত আর ভবিষ্যৎ ভুলে শুধু বর্তমান নিয়ে বেঁচে আছে সে, মনে রাখেনি নিজের অস্তিত্বের কথাও। গুদামের আবছা আলোয় মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, চোখের নীচে ঘন কালি জমেছে, পিঠ আর কাঁধ ব্যথায় আড়ষ্ট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুটো পা ফুলে গেছে তার। তার লিনেন পোশাকে রক্তের দাগ তো আছেই, দুর্গন্ধময় আরও একাধিক তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলেও দাগগুলো মুছে যায়নি। এখনও অবিরাম কাজ করে চলেছে সে, ব্যথায় টন টন করছে বুকটা আহতদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারছে না বলে।

করবার মধ্যে পানির জন্য কেউ ছটফট করলে তার মুখে মগ ধরছে অ্যানি, নিজের ত্যাগ করা ময়লা থেকে অচল কাউকে সরিয়ে আনছে, কেউ মারা যাচ্ছে দেখলে তার করুণ আবেদন ভরা কালো হাত নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে লোকটার মুখ ঢেকে দিচ্ছে চটের বস্তায়, ইঙ্গিতে অতি পরিশ্রমে শ্রান্ত পুরুষ সহকারীদের ডেকে লাশ সরাবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু বলবার দরকার করে না, লাশ সরিয়ে নেওয়ার পর লোকগুলো বাইরে থেকে আরেকজন আহতকে নিয়ে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে এরকম আরও অনেক আহত লোক কাতরাচ্ছে, কেউ মারা গেলে তবে তাদের একজনের জায়গা হবে গুদামের ভিতর।

হারারি সহকারীদের একজন তার কাঁধে টোকা দিল। তাকাল অ্যানি, কিন্তু লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে সময় নিল খানিক। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে, দু'পাশে হাত দুটো মেলে দিয়ে তাল সামলাল, একবার মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর

লোকটাকে অনুসরণ করে কাদা আর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে উঠন পেরুল, চলে এল স্টেশন অফিসে।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল অ্যানি, খসখসে গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করল।

'মিস উইসপার, আমি প্রিন্স হাসান সালে,' তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট, টিনের ছাদে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকায় আরও আবছা শোনাল। 'আমি ডেসি ক্রসরোড থেকে বলছি।'

'ট্রেন,' বলল অ্যানি, গলায় জোর ফিরে আসছে। 'প্রিন্স সালে, তুমি কথা দিয়েছিলে ট্রেন পাঠাবে, সেটা কোথায়? এই মুহূর্তে ওষুধ দরকার আমাদের—অ্যান্টেসেপটিক, অ্যানেসথেটিক—বুঝতে পারছ না? এখনও আমাদের হাতে ছয়...প্রায় সাতশো আহত লোক রয়েছে! ওদের ক্ষত পচে যাচ্ছে, এক এক করে পশুর মত মারা যাচ্ছে!' হঠাৎ বুঝতে পারল উন্মাদিনীর মত চিৎকার করছে সে।

'মিস উইসপার। ট্রেন...আমি দুঃখিত। ট্রেন আমি পাঠিয়েছিলাম। সাপ্লাই সহ। মেডিসিন। আর একজন ডাক্তার। কাল সকালে রওনা হয়েছিল ওটা, কাল সন্ধ্যায় এই ক্রসরোড পেরিয়ে গেছে...।'

'তা হলে কোথায় সেটা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল অ্যানি। 'ট্রেনটা এখানে পৌঁছায়নি কেন? তুমি বুঝতে পারছ না এখানে কী পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা...।'

'আমি দুঃখিত, মিস অ্যানি। ট্রেনটা তোমাদের ওখানে পৌঁছুবে না। সারডির পনেরো মাইল দূরে লাইন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে। নূর আয়াঙের লোকেরা...গালারা। লাইন তুলে ফেলেছে তারা, ট্রেনে যারা ছিল সবাইকে মেরে ফেলেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোচগুলোয়...।'

দু'জনের মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল, যান্ত্রিক শব্দগুঞ্জন ছাড়া কেউ কিছু শুনতে পেল না।

'মিস উইসপার, লাইনে আছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তুমি?'

'হ্যাঁ, পারছি।'

'ওখানে কোন ট্রেন পৌঁছুবে না।'

'না।'

'ডেসি ক্রসরোড আর সারডির মাঝখানের রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছে নূর আয়াঙ।'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা কোন সাহায্য পাচ্ছ না, সারডি থেকে রেলওয়ে লাইন ধরে পালিয়ে আসার পথও তোমাদের জন্যে বন্ধ। পাহাড় আর পথের ওপর দশ হাজার লোক নিয়ে অপেক্ষা করছে নূর আয়াঙ। রাস্তার পাশে ঢালের ওপর তার অবস্থান এতই শক্তিশালী যে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে। আমরা চেষ্টা করব সারডিতে পৌঁছুতে, আমাদের সাথে পনেরো হাজার যোদ্ধা রয়েছে, কিন্তু পারব কিনা জানি না...।'

'আমরা আটকা পড়েছি,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি। 'আমাদের সামনে শিফটা। পিছনে গালা।'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল, তারপর প্রিন্স জানতে চাইল, 'শিফটারা এখন কোথায়, মিস উইসপার?'

'গিরিখাদের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে তারা, শেষ জলপ্রপাতটা যেখানে পথের ওপর ঝুলে আছে...,' থামল অ্যানি, কান থেকে রিসিভার সরাল, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল, তারপর আবার

কানে রিসিভার ঠেকিয়ে বলল, 'শিফটাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তুমি। এখন তারা সারাক্ষণ ফায়ার করছে। একেবারে কাছে।'

'মিস উইসপার, তুমি একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারবে মাসুদ রানা আর মেজর সেভারসের কাছে?'

'পারব।'

'তাদের বোলো, আরও আঠারো ঘণ্টা দরকার আমার। তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে ওরা কাল সন্ধ্যার আগে ক্রসরোডে পৌঁছুতে পারবে না। তাতে করে আরেকটা দিন ও আরেকটা রাত সময় পাব আমি। বলবে, তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত শিফটাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, গোটা ইথিওপিয়ান জাতি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। সে, তুমি আর মি. মাসুদ রানা–তোমাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব আমরা।'

'ঠিক আছে,' বলল অ্যানি, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না।

'ওদের বলো, কাল দুপুরের মধ্যে আমার সাধ্যের মধ্যে যা কিছু সম্ভব সব আমি করব সারডি থেকে তোমাদের উদ্ধার করার জন্যে। ওদের বোলো, দুপুর পর্যন্ত যেন ঠেকিয়ে রাখে শিফটাদের, তারপর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব তোমাদেরকে…।'

'বলব।'

'আরও বলবে, কাল দুপুরে আমাদের যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে হবে তারা যেন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কী করতে পারলাম তা টেলিফোন করে জানাব তোমাকে…!'

'প্রিন্স সালে, আহতদের কী হবে? যারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তে

অক্ষম?’

আবার নিস্তব্ধতা; তারপর প্রিন্সের অস্পষ্ট, ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘গালাদের হাতে পড়ার চেয়ে ওদের বরং শিফটাদের হাতে পড়া ভাল।’

‘হ্যাঁ,’ শান্তভাবে সায় দিল অ্যানি।

‘আরেকটা কথা, মিস উইসপার।’ ইতস্তত করল প্রিন্স, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, ‘কোন অবস্থাতেই শিফটাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তুমি। এমনকী চরম কোন পরিস্থিতিতেও নয়। তারচেয়ে…,’ শব্দটার উপর জোর দেওয়ার জন্য দু’বার উচ্চারণ করল সে, ‘তারচেয়ে অন্য যে-কোন পরিণতি তোমার জন্যে ভাল হবে।’

‘কেন?’

‘আমাদের গুপ্তচরদের কাছ থেকে জেনেছি, তোমাদের তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তোমাকে বলা হয়েছে কমিউনিস্টদের চর, আর ওদের দু’জনকে টেরোরিস্ট। তোমাকে তুলে দেয়া হবে নূর আয়াঙের হাতে, সে-ই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তারচেয়ে যে-কোন পরিণতি তোমার জন্যে ভাল।’

‘বুঝেছি,’ ফিসফিস করে বলল অ্যানি, নূর আয়াঙের কুৎসিত চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিউরে উঠল সে।

‘শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই যদি করতে না পারি, তোমাদের জন্যে পাঠাব আমার…,’ এখানেই শেষ, হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এমনকী যান্ত্রিক শব্দ-কোলাহলও শুনতে পেল না অ্যানি। আরও প্রায় এক মিনিট যোগাযোগ পাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙল না। ক্রেডলে রিসিভার রেখে চোখ বুজল

সে, দেয়ালে হেলান দিল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। জীবনে কখনও এতটা নিঃসঙ্গ বোধ করেনি সে, এতটা ক্লান্ত হয়নি কখনও, এরকম ভয়ও কখনও পায়নি।

উঠনে নেমে মুখ তুলল অ্যানি, আকাশের দিকে তাকাল। বুঝতে পারেনি সময় কীভাবে বয়ে গেছে, দিনের আলো আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। তবে মেঘের রাজ্যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক উপরে উঠে গিয়ে ইতস্তত করছে পাহাড়চূড়ার কাছাকাছি, গায়ে কোথাও কোথাও আলোর পোঁচ চোখে পড়ল—মেঘ ভেদ করে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে রোদ।

তা যেন না ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যানি। এই ক'দিন একটানা বৃষ্টির মধ্যে দু'বার কিছুক্ষণের জন্য সরে গিয়েছিল মেঘ, প্রতিবার শিফটা বোমারুগুলো একেবারে নীচে দিয়ে সগর্জনে ছুটে আসে গিরিখাদের উপর। দু'বারই ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর, ট্রেঞ্চ ছেড়ে পরবর্তী পজিশনে পিছিয়ে না এসে উপায় ছিল না। বন্যার পানির মত গুদামে এসে ঢুকছে আহত লোকজন।

'বৃষ্টি হোক,' প্রার্থনা করল অ্যানি। 'প্লিজ গড, লেট ইট রেইন অ্যান্ড রেইন।'

মাথা নিচু করে গুদামে ঢুকে পড়ল সে, নাকে প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল উৎকট দুর্গন্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীরা গোঙাচ্ছে। চারদিকে চিৎকার। অ্যানি দেখল, কাঠের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এখনও ডাক্তারকে সাহায্য করছে বানু। ছেঁড়া ক্যানভাস টাঙিয়ে যৎসামান্য আড়াল পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, টেবিলের উপর রশির শেষ মাথায় ঝুলছে একজোড়া পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্প।

জার্মান ডাক্তার ভদ্রলোক বিধ্বস্ত একটা পা কাটছেন, হাঁটুর নীচে। যুবক হারারি যোদ্ধাকে গায়ের জোরে চেপে ধরে রেখেছে

চারজন সহকারী।

রোগীকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অ্যানি, তারপর বানুকে ডাকল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দু'জনে, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে তাজা বাতাস নিল বুক ভরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকল, প্রিন্সের সঙ্গে কী কথা হয়েছে ধীরে ধীরে বলে গেল অ্যানি। 'তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোন শব্দই আর হলো না।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল বানু। 'তার কেটে দিয়েছে। আরও আগে কেন কাটেনি নূর আয়াঙ, সেটাই আশ্চর্য। তারটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে তো, নাগাল পেতে সময় লেগেছে।'

'গিরিখাদে নামবে তুমি, বানু? রানা আর মাইকেলকে খবরটা দেয়া দরকার। নিতম্বিনীকে নিয়ে আমিই যেতাম, কিন্তু ট্যাংকে ফুয়েল নেই বললেই চলে। রানাকে আমি কথা দিয়েছি একটা ফোঁটাও অপব্যয় করব না। পরে আমাদের কাজে লাগবে...।'

'ঘোড়া নিয়ে গেলে বরং তাড়াতাড়ি হবে,' ক্ষীণ হাসল বানু। তা ছাড়া, আব্বাসকে কাছে পাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ি কেন?'

'না, সময় খুব বেশি লাগবে না,' বলল অ্যানি। 'ওরা তো একেবারে কাছে সরে এসেছে।'

শিফটাদের মেশিনগানের আওয়াজ শুনবার জন্য দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। শুধু মেশিনগান নয়, একইসঙ্গে বিস্ফোরিত হচ্ছে কামানের গোলা, ওদের পায়ের নীচে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে মাটি।

'মিস অ্যানি, রানাকে তুমি কোন ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠাতে চাও না?' ধনুকের মত পিঠ বাঁকিয়ে প্রশ্ন কলল বানু। 'সে হয়তো তোমার আশায় খাবি খাচ্ছে। আমি কি তাকে বলব যে তার

অভাবে তোমার শরীরের চাহিদা মিটছে না…?'

'বানু!' আঁতকে উঠল অ্যানি। 'তাকে যদি তুমি এ-ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত দাও… ।'

'অশ্লীল কথাটার মানে কী, মিস অ্যানি?' সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ বেড়ে গেল বানুর।

'নোংরা, অভদ্র।'

'অশ্লীল,' পুনরাবৃত্তি করল বানু, মুখস্থ করে রাখছে। 'ভারি সুন্দর একটা শব্দ।' শব্দটা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করল সে, 'আমার শরীরের অশ্লীল চাহিদা তোমার অভাবে মিটছে না!'

'বানু, ঠাট্টা নয়,' সাবধান করে দিল অ্যানি, 'এ-ধরনের কথা তুমি যদি বলো ওকে, আমি তোমাকে নিজ হাতে খুন করব।'

'কেন, এর মধ্যে ক্ষতি কী দেখলে তুমি? প্রেমে পড়লে কত কিছুই তো বলে বা করে মানুষ!' বানু বিস্মিত।

'ওখানে তোমার ভুল হয়েছে, গোড়াতেই।' অ্যানি বিষণ্ন বোধ করল। 'আমি বুঝতে পেরেছি, রানা আমার প্রেমে পড়েনি।'

'কথাটা তুমি আগেও আমাকে বলেছ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বানু। 'ব্যাপারটা আমার বোধগম্য নয়। কোন মেয়ে একটা ছেলেকে চাইলে পাবে না, এ আবার কী কথা? ওরা তো পাগলা কুকুরের মত হয়ে থাকে, একটু সুযোগ দিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তুমি কিনা বলছ… ।'

'তোমার একবারও মনে হয়নি, রানা তাদের দলে পড়ে না?'

'তা হলে বাদ দাও ওর কথা,' রানার উপর রেগে গেছে বানু। 'এসো, আমরা বরং মাইকেলকে ফাঁসাই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল অ্যানি, অকস্মাৎ হিংস্র উল্লাসধ্বনির সঙ্গে শোনা গেল আর্তচিৎকার, সেই সঙ্গে উঠনটা ছুটন্ত মানুষের ভিড়ে ভরে উঠল। রেল লাইনের দু'পাশের গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়

থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তারা, উঠনে ঢুকে সদ্য আগত আহত যোদ্ধাদের উপর একদল নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারান্দার অন্ধকার কোণ থেকে ওরা দেখল, গালারা সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এল, পড়ে থাকা অসহায় আহতদের উপর এলোপাতাড়ি ছোরা চালাচ্ছে।

বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন জার্মান ডাক্তার, করুণা ভিক্ষার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা লম্বা তরোয়ালের ধাক্কা খেলেন বুকে, ফলার ডগাটা ভোজভাজির মত আধ হাত বেরিয়ে এল দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে।

'ওরা গালা!' ফিসফিস করল বানু, আতংকে পঙ্গু হয়ে গেছে দু'জনই। পৈশাচিক আনন্দে উলু-ধ্বনির মত আওয়াজ করতে করতে গুদামের ভিতর ঢুকে পড়ল কয়েকশো গালা, শুরু হলো অবিশ্বাস্য হত্যাযজ্ঞ।

টিনের দেয়ালে অনেক ফুটো, তার একটায় চোখ রেখে একজন গালাকে দেখল অ্যানি, হাতে লোড করা রাইফেল, সার সার শুয়ে থাকা আহতদের সামনে দিয়ে হাঁটছে, গুলি করছে প্রত্যেকের মাথায় মাজল ঠেকিয়ে।

আরেকজন গালাকে দেখল অ্যানি, হাতে লম্বা ড্যাগার, আহত রাসটা বা হারারি যোদ্ধার গলা কাটবার ঝামেলায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে চটের বস্তা সরিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ড্যাগার গাঁথছে তলপেটের নীচে।

আহত যোদ্ধাদের আর্তনাদ আর খুনীদের উল্লাসধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। অ্যানিকে টেনে সরিয়ে নিল বানু, লাফ দিয়ে উঠনে নামল ওরা। 'গাড়ি!' হাঁপিয়ে উঠল অ্যানি।

'ঈশ্বর, গাড়ির কাছে পৌঁছে দাও আমাদের!'

নিতম্বিনী রয়েছে স্টেশন বিল্ডিঙের পিছনে, লোকো শেডের প্রসারিত ছাদের নীচে। পাশাপাশি ছুটল ওরা, শেডের কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরল, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা দশ-বারোজন গালার ঠিক সামনে পড়ে গেল।

বৃষ্টির মধ্যে কুৎসিত কালো চেহারাগুলো পলকের জন্য দেখতে পেল অ্যানি, খোলা মুখের ভিতর নেকড়েসুলভ দাঁত, খুনের নেশায় আধবোজা চোখ। নাকে ঢুকল উৎকট ঘামের গন্ধ।

পরমুহূর্তে মোচড় খেলো অ্যানির শরীর, বাঘের সামনে হরিণ যেমন মোচড় খেয়ে আরেক দিকে বাঁক নেয়। ঘুরে পিছন ফিরবার সময় পেল সে, কিন্তু ছুটে পালানোর সুযোগ হলো না, একটা শক্তিশালী হাত খামচে ধরল তার কাঁধ।

ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল ব্লাউজটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটল অ্যানি, কিন্তু শুনতে পেল লোকগুলো তাকে ধাওয়া করে আসছে, রোমহর্ষক লু-লু চিৎকার পাগল করে তুলল তাকে।

তার সঙ্গে ছুটছে বানু। স্টেশন বিল্ডিঙের কোণ লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা, তার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে সে। আগুনের ফুলকি দেখা গেল, ওদের বাঁ দিক থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, ওদের সামনে দেয়ালে লাগল বুলেটটা। চোখের কোণ দিয়ে অ্যানি আরও অনেক ছুটন্ত গালাকে দেখতে পেল, শহরের মেইন রোড থেকে কাছে চলে আসছে, ওদের সামনের পথে বাধা দেওয়ার ইচ্ছে।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বানু, চঞ্চলা হরিণীর মত দ্রুতগতি তার পা, তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে পারছে না অ্যানি। দশ কদম আগে স্টেশনের বিল্ডিঙের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল বানু।

বাঁক ঘুরেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বানু, তার সামনে নিতম্বিনীকে ঘিরে কমলা রঙের আগুন নাচানাচি করছে, হ্যাচগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ওদের আগেই আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেছে গালারা।

নিতম্বিনী জ্বলছে, পনেরো-বিশজন গালা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ধেই ধেই করে নাচছে ওটার চারধারে। ভিকার্স অ্যামুনিশন বিস্ফোরিত হতে শুরু করায় ছিটকে দূরে সরে গেল তারা।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছে বানু, তার কাছে পৌঁছুতে ওই এক সেকেন্ডই লাগল অ্যানির।

'সেডার জঙ্গল!' ফুঁপিয়ে উঠল বানু, দিক বদলানোর সময় অ্যানির বাহু খামচে ধরল সে।

রেললাইনের ওপারে জঙ্গলটা দুশো গজ দূরে, তবে গভীর আর অন্ধকার এবড়োখেবড়ো মাটি আড়াল করে নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু হয়ে আছে। এক ছুটে খোলা জায়াগায় বেরিয়ে এল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে বিশ-বাইশজন গালা পিছু নিল, আবার শুরু হলো লু-লু উলু-ধ্বনি।

গালাদের সামনে ছুটছে অ্যানি, খোলা উঠনটা যেন অনন্ত বিস্তৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মাটি পিচ্ছিল, কাদার ভিতর গোড়ালি ডেবে যাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে ছুটল সে।

দীর্ঘ পা ফেলে অনায়াসে ছুটে চলেছে বানু, এক লাফে রেললাইন পেরিয়ে গেল সে, জঙ্গলের কিনারা আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট সামনে।

রেললাইন পেরোতে গিয়ে অ্যানি অনুভব করল তার একটা পা বেধে গেছে, পরমুহূর্তে কাদার উপর আছাড় খেলো সে। উঠতে চেষ্টা করল, খাড়া হলো হাঁটুর উপর। জঙ্গলের কিনারা থেকে ঘাড়

ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল বানু, ইতস্তত করল, মসৃণ গাঢ় মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে বিশাল সাদা চোখ জোড়া।

'পালাও!' চিৎকার করল অ্যানি। 'পালাও! রানাকে বলো!' অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল বানু, একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল ডালপালা।

রাইফেলের একটা বাঁট শরীরের পাশে আঘাত করল অ্যানিকে, পাঁজরের নীচে। ঠাণ্ডা পিচ্ছিল কাদার ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, ব্যথায় অন্ধকার দেখল চোখে। শুধু টের পেল অনেকগুলো নির্দয় হাত ওর পরনের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে নিচ্ছে। চোখ খুলবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু সারা মুখে ভেজা চুল থাকায় কিছুই দেখতে পেল না। হাত-পা ছুঁড়ল, বৃথাই, কারণ পুরুষগুলো সংখ্যায় অনেক। ওকে ধরে দাঁড় করাল তারা, হঠাৎ কর্তৃত্বসূচক একটা ভারি কণ্ঠস্বর চাবুকের মত শব্দ করল। শরীর থেকে সরে গেল হাতগুলো।

মুখ তুলল অ্যানি, চামড়া ছেঁড়া কোমর আর তলপেটে ব্যথা নিয়ে কুঁজো হয়ে আছে। কাদা আর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তবু ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গালা সর্দারকে চিনতে পারল সে। এই কুৎসিতদর্শন পশুটাই গিরিখাতে তাকে অপমান করেছিল, সেবার তার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল মাইকেল। এখনও লোকটা নীল আলখেল্লা পরে আছে, বৃষ্টির পানিতে ভেজা, তার বীভৎস মুখে নিঃশব্দ হাসি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল অ্যানির।

ষোলো

ট্রেঞ্চগুলোর সামনের কিনারায় বালির বস্তা আর ডালপালা ফেলে নিরাপদ আড়াল তৈরি করা হয়েছে, চৌকো অবজারভেশন ফাটলের সামনে গিরিপথের নীচের দৃশ্য দেখতে কোন বাধা নেই।

বালির বস্তার উপর একটা কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল মাইকেল, ফাঁকে চোখ রেখে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভিতর তাকাল। ক্রল করে এগিয়ে এসে ফায়ারিং স্টেপ-এর উপর সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, মাইকেলের মুখভাব লক্ষ করছে। আভিজাত্যের গর্বে মাটিতে যার পা পড়ত না সেই মাইকেল সেভারসের সারা মুখ লাল মাটিতে লেপা, গায়ে আর কাপড়ে দুনিয়ার ময়লা লেগে আছে। চোয়াল ঢাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি বিবর্ণ রঙের পোঁচ বলে মনে হলো, গোঁফটা আকৃতি হারিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে। গত এক হপ্তায় গোসল করবার বা কাপড় পাল্টানোর সুযোগ হয়নি। মুখে নতুন কয়েকটা রেখা আর ভাঁজ দেখতে পেল রানা, বিশেষ করে ঠোঁটের কোণে আর চোখের চারধারে–উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ব্যথার প্রতিনিধিত্ব করছে ওগুলো। কিন্তু রানার দিকে চোখ পড়তে নিঃশব্দে হাসল সে, একটা ভুরু খানিকটা উপরে তুলে নাচাল, শয়তানী বুদ্ধি ঝিক্ করে উঠল চোখে। যদিও গন্ধ ছুটছে বাম হাতের ব্যান্ডেজ থেকে।

কথা বলতে যাবে মাইকেল, এই সময় ওদের নীচে থেকে গিরিখাদের গভীর গাঢ় ছায়া ধরে উপর দিকে ছুটে এল একটা গোলা। দু'জনেই ওরা মাথা নিচু করল, গোলাটা বিস্ফোরিত হলো কাছাকাছি, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। গত কয়েক দিনে এত কাছাকাছি এরকম দু'তিনশো গোলা পড়েছে।

'মেঘ সরে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল মাইকেল, দু'জনেই ওরা পাহাড়ের মাঝখানে সরু আকাশের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু যথেষ্ট দেরি করে সরছে। আর বিশ মিনিট পর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

দেরি হয়ে গেল বম্বারগুলোর জন্য, কারণ মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেলেও চান্ডির এয়ারফিল্ড থেকে উড়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে পাইলটদের।

'কাল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, আবার আসবে ওগুলো।'

'কালকের কথা কাল ভাবব,' বলল রানা, কালো বম্বারগুলোর কথা মনে করতে না চাইলেও চোখের সামনে ফুটে উঠল দৃশ্যগুলো।

যতবার আকাশ সামান্য পরিষ্কার হয়েছে, গিরিখাদের উপর বম্বারের আওয়াজ পেয়েছে ওরা। শিফটা আর্টিলারি স্মোক মার্কার ছুঁড়তে শুরু করে ওদের ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে। ক্যাপরোনি বম্বারগুলো একেবারে নীচে দিয়ে উড়ে আসে, গিরিখাদের দু'পাশের পাথুরে পাঁচিলে ডানাগুলো এই লাগে এই লাগে অবস্থা। এত কাছ দিয়ে উড়ে গেল সেগুলো, কাঁচ ঘেরা ককপিটে হেলমেট পরা এয়ারম্যানদের পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ওরা।

ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বম্বারগুলো, ফিউজিলাজ থেকে খসে পড়ল কালো জিনিসগুলো। একশো কিলো বোমাগুলো সরাসরি খাড়া নেমে এল, বিস্ফোরণের শব্দে শরীর ও মন অসাড়

হয়ে গেল ওদের। ওগুলোর তুলনায় কামানের গোলাকে পটকা বলা যায়। নাইট্রোজেন মাসটারড ভরা ক্যানগুলো প্রথমে ড্রপ খেলো বার কয়েক, তারপর পাথুরে ঢালের উপর বিস্ফোরিত হলো–হলুদ, জেলির মত তরল পদার্থ, চারদিকে একশো ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এক নিমেষে।

প্রতিবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা একের পর এক আসতে থাকল বম্বারগুলো, ফিরবার আগে ওদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিল যে শিফটাদের পদাতিক বাহিনীকে ঠেকানোর কোন উপায় থাকল না। প্রতিবার ট্রেঞ্চ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, পিছু হটে উঠে আসতে হয়েছে পরবর্তী পজিশনে।

এটাই ওদের শেষ পজিশন, ওদের দু'মাইল পিছনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট পাথরের প্রাকৃতিক তোরণ, গিরিখাদের নামবার মুখে। আরও সামনে সারডি শহর আর ডেসি রোডের দিকে খোলা পথ।

'চেষ্টা করে দেখো না একটু ঘুমোতে পারো কিনা,' বলল রানা, নিজের অজান্তেই মাইকেলের বাম হাতের দিকে তাকাল। ছেঁড়া শার্ট দিয়ে বাঁধা গোটা হাতটাই ফুলে আছে, গলার সঙ্গে একটা স্লিঙে ঝুলছে বুকের কাছে। ব্যান্ডেজের তেমন কোন কাজ হয়নি, রক্ত আর পুঁজ অবাধে বেরিয়ে আসছে কিনারা দিয়ে। ক্ষতটার নগ্ন চেহারা কী রকম জানে রানা, যতবার তাকিয়েছে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ও। কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত ছাল তুলে নিয়েছে নাইট্রোজেন মাসটারড, যেন গোটা হাত ফুটন্ত পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল। ওষুধ কোথায় পাবে, গ্রিজ ঢালা হয়েছে ক্ষতের উপর, কী উপকার হবে কে জানে।

'আগে অন্ধকার হোক,' বিড়বিড় করল মাইকেল, ভাল হাতটা

দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুলল। 'কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। নীচেটা বড় শান্ত।'

আবার ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে কথা বলবার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

'বড় বেশি চুপচাপ,' আবার বলল মাইকেল, হাতটা সরাতে গিয়ে ব্যথায় উফ করে উঠল। 'গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার সময় নেই ওদের। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোনোর কথা।' তারপর প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'তুমি বিশ্বাস করবে, ওল্ড চ্যাপ, একটা চুরুটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে একটা টেসটিকল হারাতেও আপত্তি করব না আমি, কী?' হাসল সে। 'যখন সবচেয়ে বেশি দরকার...।'

হঠাৎ থেমে গেল সে, পরমুহূর্তে দু'জনেরই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল।

'আমি যা শুনছি, তুমিও কি তাই শুনছ?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

'আমারও তাই ধারণা।'

'আসার তো কথাই, হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল মাইকেল। 'এত দেরি হলো কেন সেটাই আশ্চর্য। তবে আসমারা থেকে দূরত্বও তো কম নয়। চুপচাপ থাকার কারণটা তা হলে বোঝা গেল, ওগুলো আসার অপেক্ষায় ছিল ওরা।'

নিস্তব্ধ গিরিখাদের ভিতর নতুন শব্দটা চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই। এখনও অস্পষ্ট, তবে পাথরের উপর ইস্পাতের ঘর্ষণ টের পেতে অসুবিধে হলো না। প্রতি মুহূর্তে শব্দটা বাড়ছে। এখন ওরা এঞ্জিনের মৃদু গর্জনও শুনতে পাচ্ছে।

'ট্যাংক,' বলল মাইকেল। 'ব্লাডি ট্যাংক।'

'সন্ধ্যের আগে এখানে ওরা পৌঁছুতে পারবে না,' আন্দাজ করল রানা। 'রাতে হামলা করার ঝুঁকি নেবে বলেও মনে হয় না।'

‘না,’ সমর্থন করল মাইকেল। ‘কাল সকালে আসবে ওরা।’

‘সেদ্ধ ডিম আর গরম কফির বদলে ট্যাংক আর বোমারু?’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল। ‘সেরকমই ভয় করছি, ওল্ড চ্যাপ।’

কাঁধে হাত আর চোখে আলোর ছোঁয়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসবার চেষ্টা করবার জন্য সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি এক করতে হলো। আধ ভেজা কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে চোখ কুঁচকে ল্যাম্পটার দিকে তাকাল ও, কিছুই দেখতে পেল না। ঠাণ্ডায় প্রতিটি পেশী অসাড় হয়ে গেছে ওর, কপাল আর মাথা লোহার মত ভারি। সকাল হয়ে গেছে বিশ্বাস হতে চাইল না।

‘কে?’

‘আমি, মাসুদ ভাই।’

এতক্ষণে ল্যাম্পের পিছনে আব্বাস খায়েরের থমথমে চেহারাটা দেখতে পেল রানা। ‘চোখ থেকে আলোটা সরাবে?’ কর্কশ গলায় বলল ও।

রানার পাশে হঠাৎ উঠে বসল মাইকেল সেভারস। ভিজে কাপড়ে দু’জনেই ওরা ট্রেঞ্চের ভিতর কাদার উপর ঘুমিয়ে ছিল। ‘কিছু ঘটেছে, কী? জড়ানো গলায় বলল সে, ক্লান্তিতে মন্থর হয়ে গেছে সে-ও।

ল্যাম্প সরিয়ে নিল আব্বাস, তার পাশে দাঁড়ানো একহারা গড়নের রাহেলা বানুর উপর পড়ল আলোটা। ঠাণ্ডায় ঠক-ঠক করে কাঁপছে মেয়েটা, ব্লাউজ আর স্কার্ট দুটোই ভিজে, ঝোপের কাঁটা আর গাছের ডাল লেগে তার হাত ও পায়ের চামড়া কেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট আর ব্লাউজ।

রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, রানা দেখল আতংকে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে চেষ্টা করল বানু, কিন্তু থরথর করে শুধু ঠোঁট কাঁপল, কোন শব্দ বেরুল না। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। 'মিস অ্যানি...,' নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে এল বানু। 'ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে...!'

'তোমাকে এখানে থাকতে হবে,' বলল রানা, ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, ট্রেঞ্চগুলোর কাছ থেকে আধ মাইল পিছনে রয়েছে চঞ্চলা। 'ভোরে একটা জোরাল হামলা হবে, তুমি না থাকলে ওরা ঠেকাতে পারবে না।'

'আর্মারড কারে আমিও থাকছি, রানা,' শান্তভাবে বলল মাইকেল, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে। 'অ্যানি ওদের হাতে বন্দী, আর আমি এখানে বসে থাকব, এ তুমি...,' হঠাৎ থেমে ক্ষীণ হাসল সে। 'তোমার ওপর ফাদারলি একটা চোখ রাখার জন্যেও আমার উপস্থিতি দরকার, ওল্ড চ্যাপ। অন্তত এই একবার কামাল হাসানকে নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে ঝুঁকি নিতে হবে।'

কথা বলতে বলতে আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেল ওরা, গিরিখাদের মাথার নীচে এবড়োখেবড়ো মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। হাত বাড়িয়ে চঞ্চলার গা থেকে ক্যানভাস কাভারটা সরাল মাইকেল, আব্বাসের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'যাই ঘটুক না কেন,' তাকে বলল ও, 'ভোরের আগেই ফিরে আসব আমরা। যদি না ফিরি, কী করতে হবে তুমি জানো। এই ক'দিন ভাল ট্রেনিং পেয়েছ তুমি।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল আব্বাস।

'যতক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখবে। তারপর পিছিয়ে গিরিখাদের

মাথায় চলে এসে শেষ কর্তব্যটি সারবে। ঠিক আছে? মাত্র দুপুর পর্যন্ত, তাই না? চেষ্টা করলে ওদেরকে আমরা ওই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারব—ট্যাংক নিয়ে আসুক আর যাই নিয়ে আসুক, কী বলো?'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, পারব ঠেকিয়ে রাখতে। আপনি আমাকে দোয়া করুন।'

আব্বাসের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা।

'আরেকটা কথা, ওল্ড সান,' বলল মাইকেল। 'তোমার দাদুকে আমি আপন ভাইয়ের মত ভালবাসি—কিন্তু শালার বুড়োটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখতে হবে তোমার। দরকার হলে বেঁধে রাখবে।' আব্বাসের কাঁধে চাপড় মারল সে, দখল করা শিফটা রাইফেলটা হাত বদল করল, ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল চঞ্চলার টারিটে।

কোমর ধরে বানুকে গাড়ির মাথায় তুলে দিল রানা, চঞ্চলার সামনে এসে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাল।

প্রায় খাড়া শেষ কয়েকশো গজ ঢাল বেয়ে গিরিখাদের মাথায় উঠে এল চঞ্চলা, পাশ কাটাল মশালের আলোয় মাটি কাটবার কাজে ব্যস্ত রাসটা আর হারারি লোকজনদের। গিরিখাদ ধরে শিফটাদের ট্যাংক আসছে জানবার পর থেকে ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে রানা আর মাইকেল, কোন বিরতি ছাড়া পালা করে মাটি কেটে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে ওরা।

অ্যানিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, দু'জনেই ওরা লক্ষ করল আদিবাসী কর্মীরা নিখুঁতভাবে কাজটা করছে। অ্যান্টি-ট্যাংক পাঁচিল, প্রায় সাত ফুট উঁচু করা হয়েছে, গ্র্যানিট পাথরের তৈরি, তার উপর মাটি ফেলা হয়েছে—পাঁচিলের সামনে গভীর গর্ত।

পাঁচিলের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে এখনও, চঞ্চলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

'ওদের বলো, বানু, ফাঁকটা এবার বন্ধ করে দিক,' নির্দেশ দিল মাইকেল। 'গাড়ি নিয়ে আমরা আর গিরিখাদে ফিরব না।'

পাঁচিলটার সবচেয়ে উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন হারারি কমান্ডার, তার উদ্দেশে চিৎকার করল বানু। জবাবে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

প্রকৃতির তৈরি গ্র্যানিট পাথরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল চঞ্চলা, ওদের সামনে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা আর সারডি শহর।

শহর জ্বলছে।

আর্মারড কার থামাল রানা, খোলের মাথায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল ওরা লাল অগ্নিশিখার দিকে, মেঘের গায়েও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। উপত্যকার চারদিকে আকাশ-ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় পাঁচিলগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

'সে কি এখনও বেঁচে আছে?' ওদের সবার ভয় একযোগে বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে, তবে জবাব দিল একা শুধু বানু।

'ও ধরা পড়বার সময় নূর আয়াঙ শহরে ছিল কিনা জানি না, থাকলে বেঁচে নেই।'

নিস্তব্ধতার ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস করুণ বিলাপের মত লাগল ওদের কানে। পুরুষ দু'জন অটল পাথরের মত তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারে, দু'জনেই রাগ আর ভয়ের হাতে বন্দী।

'তবে নূর আয়াঙের স্বভাব হলো পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা,' আবার বলল বানু। 'যুদ্ধ থামলে লুঠপাট করার জন্যে নেমে আসে সে। সে না আসা পর্যন্ত তার লোকেরা খুন-খারাবিতে হাত দেয় না। আর অ্যানির ব্যাপারটা তো আরও আলাদা—নূর আয়াঙ ওকে কষ্ট পেয়ে মরতে দেখবে, গাভীদের সাথে ব্যস। শুনেছি,

ছোট ছোট ছুরি দিয়ে জ্যান্ত একজন মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারে ওরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপরও নাকি মানুষটা অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে... ।'

ঠাস করে বানুর গালে চড় মারল মাইকেল। তারপরই বিড়বিড় করল সে, 'দুঃখিত, মাই গার্ল!'

চোখে ভরা পানি নিয়ে মাইকেলের কাঁধে মাথা রাখল বানু। 'তোমার ভেতর কী হচ্ছে আমি জানি, মাইকেল।'

ঘটনাটা দেখেও যেন দেখল না রানা, চেহারায় ধ্যানমগ্ন একটা ভাব নিয়ে এখনও দূরে তাকিয়ে আছে ও।

সংবিৎ ফিরল মাইকেলের ডাকে। 'আমি তৈরি, ওল্ড চ্যাপ। তোমার কী খবর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল রানা। 'হ্যাঁ, আমিও তৈরি, মাইকেল।' হ্যাচ গলে ড্রাইভারের সিটে নেমে গেল ও।

*

ফ্রন্ট-লাইন ট্রেঞ্চগুলোর কাছে ফিরে এল আব্বাস খায়ের। গিরিখাদের মাথার উপর সরু আকাশের ক্ষীণ আলোর আভাস দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল সে, ঠিক বুঝতে পারল না ভোর হতে যাচ্ছে কিনা। এরইমধ্যে ট্রেঞ্চের ভিতর নড়াচড়া শুরু হয়েছে, প্যারাফিন ল্যাম্প তুলে ওর মুখে আলো ফেলল গোত্রপ্রধানের একজন দেহরক্ষী। আব্বাসকে চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করল সে। 'উনি আপনার খোঁজ করছিলেন।'

ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে লোকটার পিছু নিল আব্বাস। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হলো তাকে, কাদার উপর শয়ে শয়ে আদিবাসী যোদ্ধারা শুয়ে রয়েছে।

ধূসর একটা কম্বলের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন কামাল

হাসান, মেইন ট্রেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে বড় একটা গহ্বরের ভিতর বসে রয়েছেন তিনি। গর্তের খোলা মাথাটা তাঁবুর ক্যানভাস দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে, মাটিতে ছোট একটা আগুন জ্বলছে, চারদিকে ধোঁয়া। দেহরক্ষী আর সর্দাররা ঘিরে রয়েছে কামাল হাসানকে, শান্তভাবে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল আব্বাস। গোত্রপ্রধান মুখ তুলে তাকালেন।

'বিদেশী বন্ধুরা কি চলে গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন কামাল হাসান, খক খক করে কাশলেন খানিক, প্রাচীন শরীরটা অসম্ভব ঝাঁকি খেলো।

'ভোরে ওঁরা ফিরে আসবেন, হামলা শুরু হবার আগেই,' রানা আর মাইকেলের পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল আব্বাস, তারপর ধীরে ধীরে ওদের চলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল সে।

মাথা ঝাঁকালেন কামাল হাসান, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন আগুনের দিকে, তার চোখে লাল অগ্নিশিখা নাচতে লাগল। আব্বাস থামতেই কাঁপা কাঁপা, ঝগড়াটে গলায় কথা বললেন তিনি, 'এটা একটা সংকেত—স্রষ্টা আমাকে বলছেন, কামাল, আর দেরি কোরো না। বিদেশী সমরনায়কের পরামর্শ অনেক শুনেছি, বহু কষ্টে বহুদিন ধরে বুকে চেপে রেখেছি প্রতিশোধের গনগনে আগুন। আর নয়, আব্বাস, আর নয়! আমার মা ছিল সিংহী, বীরাঙ্গনার গর্ভে আমার জন্ম—নিজেকে আর কত দিন দাবিয়ে রাখব? অনেক দিন হলো শত্রুরা আমাকে লাথি মারছে, আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়!'

খক খক করে কাশলেন তিনি।

'অনেক দৌড়েছি আমরা, শুধু পেছন দিকে। এবার আমরা রুখে দাঁড়াব শত্রুর বিরুদ্ধে। যাও, সবাইকে ঘুম থেকে তোলো।

সবাইকে বলো, হাজার বছরের পুরনো সংকেত বাজবে—বাজবে আমার ড্রামগুলো।' কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে এক লাফে সিধে হলেন কামাল হাসান। 'ড্রামের শব্দ শুনতে বলো সবাইকে।' আশপাশ থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল, দেহরক্ষী আর সর্দারদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। 'ভোর হওয়া পর্যন্ত বাজবে আমার ড্রাম,' বলে চলেছেন কামাল হাসান। 'তারপর যখন ড্রাম থামবে, তখনই সময়!' কারও খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাঁর নিজেরও না। 'আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি কামাল হাসান, তোমাদের সামনে থাকব, ছুটে যাব শত্রুর উদ্দেশে, তাদের খেদিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব মরুভূমিতে, ঠেলে ফেলে দেব সাগরে। নিজেদের যারা বীরযোদ্ধা বলে মনে করে, পবিত্র মাতৃভূমির উপর যাদের এতটুকু মায়া আছে, যারা স্বাধীনতা আর প্রচুর বিয়ে করার অধিকারে বিশ্বাস করে, অবশ্যই তারা আমাকে অনুসরণ করবে।' লু-লু উলুধ্বনিতে তাঁর বাকি কথা চাপা পড়ে গেল, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন তিনি।

সর্দারদের একজন এক মগ তেজ ধরল গোত্রপ্রধানের সামনে। 'চা-টুকু খেয়ে নিন, হুজুর!'

মগের ভিতর না তাকিয়ে ঢক ঢক করে তেজটুকু গলাধঃকরণ করলেন কামাল হাসান।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এল আব্বাস, বুড়ো দাদুর একটা বাহু চেপে ধরল সে। 'দাদু!'

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন কামাল হাসান, চোখে আগুন ঝরছে। 'তুমি যদি মেয়েমানুষের মত করো, তোমাকে আমি নাতি বলে স্বীকার করব না! আমার গায়ে যখন হাত দিয়েছ, তখন আমার মত করে চিন্তা করতে চেষ্টা করো। কোথায় দাঁড়িয়ে আছি

আমরা? পিঠ কোথায়? কোথায় যেতে চাই?’

হঠাৎ দাদুর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ দিবালোকের মত পরিষ্কার বুঝতে পারল আব্বাস। উপলব্ধি করল, তার দাদু কী করতে চাইছেন। তার দাদু বুঝতে পেরেছেন, স্রষ্টা আদিবাসীদের উপর সন্তুষ্ট নন, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, এখন যুদ্ধ করলেও হারতে হবে, না করলেও মরতে হবে। এই যখন পরিস্থিতি, একটা স্বাধীনচেতা জাতির সামনে আর কী করণীয় থাকে, আত্মত্যাগ করা ছাড়া?

নতুন আর প্রাচীনের মধ্যে নিঃশব্দে বিনিময় হলো উপলব্ধি আর সমঝোতার বার্তা।

কামাল হাসান বললেন, ‘যদি তোমার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে থাকে, তা হলে আমার আশীর্বাদ পাবার জন্যে নত হও।’

দাদুর পায়ের উপর মাথা ঠেকাল আব্বাস। তার নগ্ন ঘাড়ে গরম এক ফোঁটা পানি পড়ল। চোখে বিস্ময় নিয়ে মুখ তুলল আব্বাস। বৃদ্ধ কামাল হাসান হাসছেন, কিন্তু দু’গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে চোখের পানি। বিড়বিড় করে তিনি বললেন, ‘একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দেব আমরা, ভাই। এ আমার আনন্দের কান্না!’

সতেরো

ছোট একটা কুঁড়েঘর, মাটির স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়ে আছে অ্যানি উইসপার। সম্ভবত সারডি শহরের এই একটাই ঘরে আগুন ধরানো হয়নি। ঘরটা শহরের এক প্রান্তে, মেঝেতে কিলবিল করছে

কেঁচো, নরম স্পর্শ নিয়ে মোচড় খাচ্ছে অ্যানির গায়ে। ইঁদুরগুলো ছোট, কিন্তু এরইমধ্যে শিকারের অসহায় অবস্থা টের পেয়ে গেছে ওগুলো, ক্ষুদে ধারাল দাঁত দিয়ে কাপড়ে আর চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে। কাদার মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে অ্যানি।

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, এক করে বাঁধা হয়েছে গোড়ালি জোড়াও।

বাইরে থেকে ভেসে আসা আগুনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছে অ্যানি, মাঝে মধ্যে ছাদ ধসে পড়বার আওয়াজও চিনতে পারছে। বুঝতে পারছে, বাইরে বহু গালা ভিড় করে আছে, অনর্গল কথা বলছে তারা, হাসাহাসি করছে। তেজ খেয়ে প্রায় সবাই ওরা মাতাল হয়ে আছে। তাদের শোরগোল ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে রাসটা আর হারারি বন্দীদের আর্তচিৎকার। বন্দীদের বেশিরভাগকেই জবাই করা হয়ে গেছে, দু'পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের টেসটিকল কাটবার জন্য—সেটা নূর আয়াঙের উপস্থিতিতে ঘটবে। সবার মধ্যে একটা অপেক্ষার ভাব। দখল করা শহরে যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নূর আয়াঙ গালা।

ঘরের ভিতর কতক্ষণ পড়ে আছে অ্যানি জানে না। তার হাত আর পায়ে কোন সাড়া নেই, নাইলনের রশিতে শক্ত গিঁট দেওয়া হয়েছে, মাংস কেটে ভিতরে ডেবে গেছে। পাঁজরের নীচে যেখানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছিল, জায়গাটা ব্যথায় টন-টন করছে সারাক্ষণ। আধ খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকছে, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। যতবারই পাশ ফিরতে চেয়েছে অ্যানি, বুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড প্রতিবার লাথি মেরেছে তার পেটে।

এক সময় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল অ্যানি, তবে পুরোপুরি নয়। আচ্ছন্ন একটা ভাবের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতেও বাইরের কোলাহল শুনতে পেল সে, মনে হলো অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যে ভাসছে তার শরীর, সময় থেমে গেছে নাকি বয়ে চলেছে ধারণা নেই। মনের ভয় দূর হয়ে গেল, শারীরিক কষ্ট অনুভব করল না।

এই দুর্দশার মধ্যে কতক্ষণ কেটেছে জানে না, আরেকটা লাথি খেয়ে সচেতন হলো অ্যানি। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল সে, বুঝতে পারল, বাইরে লোক সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হলো, কয়েক হাজার লোক একযোগে কী যেন একটা দাবি জানাচ্ছে। একজন লোক টেনে তুলল তাকে, এতক্ষণে সে দেখল গার্ডের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। তাদের দু'জন তার শরীরে হাত দিল, বাকি একজন মেঝেতে বসে ছুরি দিয়ে কেটে দিল গোড়ালির বাঁধন। সিধে হলো লোকটা, অ্যানির হাতের বাঁধনও কেটে দিল সে। পিঠ আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকি দু'জনের হাত গা থেকে খসাতে চেষ্টা করল সে, পরমুহূর্তে অনুভব করল হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়ে যাচ্ছে সে।

কিন্তু না, তাকে পড়তে দেওয়া হলো না। তিনজন লোক নিজেদের হাতের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখল তাকে, টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

কুঁড়েঘরের সামনে সরু রাস্তাগুলো গালাদের ভিড়ে ঢাকা পড়ে আছে। দোরগোড়ায় অ্যানিকে দেখামাত্র কুৎসিত চেহারাগুলো সামনের দিকে ঝুঁকল ভাল করে দেখবার জন্য। চারদিকে ধোঁয়া আর অসংখ্য মশাল, গার্ডদের কর্কশ নির্দেশে ভিড় সামান্য একটু ফাঁক হলো, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে অ্যানিকে টেনে নিয়ে চলল তারা। চারপাশের ভিড় থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়ল গালারা। চারদিক থেকে ছুটে এল বর্বরদের লোভী হাত, হাসতে

হাসতে হাতের লাঠি দিয়ে সেগুলো ঠেকাল গার্ডরা। চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না অ্যানি, এখনও তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা। রেলওয়ের উঠনে ঢুকল ভিড়টা, পাশ কাটাল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা লাশগুলোকে। এরা সবাই গুদামের ভিতর শুয়ে ছিল, নিজের হাতে এদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে অ্যানি। খুন করবার পর প্রতিটি লাশের গা থেকে কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়েছে গালারা।

গোটা উঠনে কয়েকশো মশাল জ্বলছে। গুদামের বারান্দার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় মোটা গদির উপর বসা লোকটাকে চিনতে পারল অ্যানি। সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা চোখ, ঢুলুঢুলু। গায়ের চামড়ার নীচে মাংস যেন নরম কাদা, কখনও যেন রোদে বেরোয়নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মত লালচে। প্রথমবারের মত, এবারও লোকটা যে শুধু অ্যানির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি বুলাল তাই নয়, বুকের উপর আর তলপেটের নীচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল। ঘৃণায় রি-রি করে উঠল অ্যানির সারা শরীর। কিন্তু নূর আয়াঙ কেন ওখানে গদির উপর বসে আছে বুঝতে পেরে ঘৃণা বা রাগ নয়, আতংকে কাঁপতে শুরু করল সে। বারান্দাটা উঁচু, বন্দিনীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপভোগ করবার জন্য দু'পাশে দুই গাভীকে নিয়ে বসেছে নূর আয়াঙ।

নিজেকে মুক্ত করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল অ্যানি, ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। কিন্তু টেনে-হিঁচড়ে সামনে আনা হলো তাকে, তারপর তিনজন মিলে শূন্যে তুলে ফেলল।

দেড় মানুষ উঁচু অসম্ভব ভারি তিনটে গালা বল্লম মাটিতে গেঁথে একটা তেপায়া তৈরি করা হয়েছে, ইস্পাতের তৈরি ডগাগুলো এক

করে বাঁধা হয়েছে শক্ত করে তার দিয়ে, পিরামিডের চোখা মাথার মত লাগছে দেখতে। তিনজনের সঙ্গে পারল না অ্যানি, তার পা আর হাত টেনে ধরা হলো, আবার সে অনুভব করল কব্জি আর গোড়ালি বাঁধা হচ্ছে।

গার্ডরা কাজ সেরে পিছিয়ে গেল গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড়ের গায়ে, অ্যানি দেখল তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে সে, শরীরের ভারে রশি-বাঁধা কব্জির হাড় ভেঙে যাবে বলে মনে হলো।

মুখ তুলল অ্যানি। সরাসরি তার সামনে, গুদামঘরের বারান্দার উপর, বসে রয়েছে নূর আয়াঙ গালা। চিৎকার করে কী যেন বলল সে, বুঝল না অ্যানি, আতংক আর ব্যথায় বিস্ফারিত চোখে তার মোটা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু। মোটা ঠোঁট ফাঁক হলো, বাইরে বেরিয়ে এল সাপের মাথার মত কালো জিভের ডগা, ঠোঁট চাটল।

তারপর হঠাৎ খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল নূর আয়াঙ, দুই কনুই দিয়ে গুঁতো মারল দু'পাশে বসা যুবতীদের পাঁজরে।

মেয়ে দুটো উঠনে নেমে এল, বহুরঙা সিল্ক পোশাক মশালের আলোয় ঝলমল করছে, আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে গা-ভর্তি গহনা।

যেন আগেই মহড়া দেওয়া ছিল, ঝুলন্ত অ্যানির দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল তারা। তাদের চেহারা ভাবগম্ভীর, চোখ ঢুলুঢুলু, হাবভাবে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা, দৃষ্টিতে ফুটে আছে প্রায় পবিত্র একটা আলো।

তারা যখন হাত তুলে ওকে স্পর্শ করতে গেল, চমকে উঠে অ্যানি দেখল তাদের হাতে ছোট দুটো ছুরি রয়েছে। ভয়ে চিৎকার করতে চাইল সে, কিন্তু গলা থেকে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুল। মোচড় খেলো অ্যানি, ঘাড় আর মাথা অসম্ভব বাঁকা করে ছুরির ফলাটা দেখবার চেষ্টা করল।

দক্ষ হাতে, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে অ্যানির গা থেকে কাপড়গুলো কেটে নামিয়ে নিল তারা। গলার কাছে ব্লাউজের কিনারায় ছুরির ডগা ঠেকিয়ে নামিয়ে আনল নীচের দিকে। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার ফাঁক হয়ে গেল, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল দুধ-আলতা রঙের বুক। ঘ্যাঁচ করে আরেক পোঁচে স্কার্টটা কেটে ফেলল, শুকনো পাতার মত খসে পড়ল সেটা কোমর থেকে।

হাততালি দিল নূর আয়াঙ। কুকুর বিড়ালের ডাক ছাড়ল গালারা। কিন্তু তারপরই আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল উঠনে। সবাই অধীর আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কারও চোখে পলক নেই, এমন সুন্দর আর উত্তেজনাকর দৃশ্য থেকে মুহূর্তের জন্যও কেউ বঞ্চিত হতে চায় না।

সামনের দিকে মাথা নোয়াল অ্যানি, চুলগুলো ঢেকে দিল তার কান্না ভেজা মুখ।

যুবতীদের একজন সরে এল, দাঁড়াল অ্যানির সরাসরি সামনে। হাত তুলল সে। ছুরির ফলাটা ঠেকাল ঠিক গলার নীচে সাদা চামড়ায়। ওখানে একটা শিরা ফাঁদে পড়া ক্ষুদে প্রাণীর মত লাফাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অসহ্যরকম মন্থরগতিতে, ছুরির ফলাটা নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

অ্যানির গোটা শরীর ঝাঁকি আর মোচড় খেতে লাগল, হাত আর পা আড়ষ্ট, পিঠ এমন বাঁকা হয়ে উঠল যে মসৃণ ফর্সা ত্বকের নীচে থেকে মাথাচাড়া দিল প্রতিটি পেশী।

পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হলো তার মাথা, নিষ্পলক চোখ বিস্ফারিত, খোলা মুখ মস্ত হাঁ হয়ে আছে, গলার ভিতর থেকে রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে এল।

যুবতী গালার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গভীর ধ্যানমগ্নতার

সঙ্গে সে তার কাজে ব্যস্ত। ফোলা কিন্তু টান টান স্তন জোড়ার মাঝখান দিয়ে নামিয়ে আনল সে ছুরির ফলাটা। ধারাল ডগা সাদা চামড়ায় অগভীর রেখা তৈরি করছে, উজ্জ্বল লাল একটা সরলরেখা দীর্ঘ হলো প্রতি মুহূর্তে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা, তাদের চাপা গর্জন অনেকটা যেন দূর থেকে ভেসে আসা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত, দ্রুত কাছে সরে আসছে। তাদের সঙ্গে হাসছে নূর আয়াঙ, কিন্তু তার সে হাসি কেউ শুনতে পাচ্ছে না। গদির কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। তার চোখ পাথরের মত চকচক করছে, ফাঁক হয়ে আছে ভিজে ঠোঁট।

একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। স্টেশন বিল্ডিঙের পিছন দিকে ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে রূপকথায় শোনা দৈত্যের মত ধেয়ে এল কুৎসিতদর্শন চঞ্চলা, এক পলকে ঢুকে পড়ল মশালের লালচে আলোর ভিতর। এক সেকেন্ড আগেও আর্মারড কারের শব্দ শুনতে পায়নি কেউ–জনতার সম্মিলিত চিৎকারে সেটা চাপা পড়ে ছিল।

ইস্পাতের ভারি খোল, পুরনো বেন্টলি এঞ্জিনের ঘাড়ে চেপে, ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্ছিদ্র ভিড়ের গায়ে। মাংস আর হাড়ের নিরেট পাঁচিলটাকে বাধা বলে মানল না চঞ্চলা, খেত জুড়ে খাড়া হয়ে থাকা আখের উপর দিয়ে যেন ছুটল একটা বুলডোজার। গতি এতটুকু মন্থর না করে ভিড়ের ভিতর দিয়ে নিজের পথ করে নিল আর্মারড কার, নাক বরাবর সোজা এগোল ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে বল্লমের তৈরি তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে অ্যানি উইসপার।

চঞ্চলার সঙ্গে একই মুহূর্তে, অন্ধকার গুদামঘরের দোরগোড়া থেকে বারান্দায় পা রাখল মাইকেল সেভারস, নূর আয়াঙ যেখানে

বসে আছে ঠিক তার পিছনে।

আহত হাতের ভাঁজে দখল করা শিফটা রাইফেল, সেটার বাঁট কাঁধে না তুলেই গুলি করল সে।

গালা যুবতীর ছুরি ধরা হাতের কনুই চুরমার করে দিল বুলেট, শুকনো সরু ডালের মত মট করে ভেঙে গেল হাতটা, অনুভূতিহীন আঙুল থেকে উড়ে গেল ছুরিটা। তার চিৎকার তীক্ষ্ণ বাঁশির মত বাজল কানে, আছাড় খেয়ে পড়ল সে অ্যানির পায়ের কাছে কাদার উপর।

দ্বিতীয় যুবতীর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক লাফে অ্যানির সামনে চলে এল সে, ডান হাতটা পিছিয়ে গেল ঠিক যেন ছোবল মারতে উদ্যত একটা কেউটের মাথার মত, ছুরিটা সে তাক করল অ্যানির হৃৎপিণ্ডের দিকে। তার চোখ জ্বলছে, নাকের ফুটো ঘন ঘন বড় হচ্ছে। ছুরি ধরা ডান হাত ছুটে গেল, হাতল পর্যন্ত ডেবে যাবে নরম মাংসের ভিতর–রাইফেল মাজল চুল পরিমাণ ঘুরিয়ে আবার ফায়ার করল মাইকেল।

ভারি বুলেট তার তামাটে কপালের ঠিক মাঝখানে ঢুকল। সদ্য তৈরি কালো গর্তটাকে মনে হলো তৃতীয় একটা চোখের খালি কোটর, পিছন দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো মাথাটা।

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, বোল্ট টেনে আবার রাইফেল মাজল সামান্য ঘোরাল মাইকেল। কিন্তু নূর আয়াঙ মোচড় খেয়ে পিছন দিকে তাকাল, গদিগুলো আঁকড়ে ধরে সামনে তুলবার চেষ্টা করছে সে, আড়াল পেতে চায়। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে, ঘড়ঘড়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, রাইফেল মাজলটা আস্তে করে ঢুকে গেল মুখের ভিতর। তৃতীয়বার গুলি করতেও ইতস্তত করল না মাইকেল।

ঘাড়ের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, গর্তটায় মুঠো পাকানো একটা হাত অনায়াসে ঢুকে যাবে। বারান্দা থেকে উঠনে পড়ে বোবা ব্যাঙের মত লাফাতে লাগল নূর আয়াঙ গালা।

লাফ দিয়ে তাকে টপকাল মাইকেল, নেমে এল উঠনের মাটিতে। মাথার উপর তরোয়াল খাড়া করে ছুটে এল একজন গালা। রাইফেল না তুলে আবার গুলি করল মাইকেল, লাশটা টপকে স্থির হলো অ্যানির পাশে, সেই মুহূর্তে ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চঞ্চলা, হ্যাচ গলে টারিটে উঠল রানা, হাতে হারারি ড্যাগার নিয়ে লাফ দিল।

ওদের মাথার উপর, টারিটে বসে, ভিকার্স মেশিনগান ঘোরাচ্ছে বানু। একনাগাড়ে, কোন বিরতি ছাড়াই, গুলি ছুঁড়ছে সে। আতংকে অস্থির গালারা অন্ধকারের ভিতর যে যেদিকে পারল ছুটল, পিছনে ফেলে গেল অগণিত লাশ।

অ্যানির হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে দিল রানা, সামনের দিকে ঢলে রানার বুকে পড়ল সে, দু'হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলল রানা।

ঝুঁকল মাইকেল, অ্যানির ছেঁড়া কাপড়গুলো এক করে তুলে আহত বগলের নীচে রাখল। 'এবার বোধহয় ফেরা উচিত, কী?' দরাজ গলায় প্রশ্ন করল সে। 'আমার ধারণা এখানে আর কোন মজা নেই।' দু'জন ধরাধরি করে অ্যানিকে তুলে দিল ওরা চঞ্চলার টারিটে।

তিনটে কারণে বানানটো সাতার উদ্ভাবিত দর্শন পরিত্যাগ করে শিফটা বাহিনীর নিরাপদ পশ্চাদভাগ থেকে একেবারে ফ্রন্ট-লাইনে চলে এসেছে কাউন্ট ডিকানডিয়া লেকরেক। জেনারেল ফাদ রেডিও-যোগে জরুরী তাগাদা দিয়ে বলেছে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যে সারডি শহর দখল করতে হবে তাকে, তা না হলে তার জায়গায় নতুন কাউকে কমান্ডার করে পাঠানো হবে। মেজর লুইগি রাকা বাইবেল স্পর্শ করে তাকে জানিয়েছে, গোটা সারডি গিরিখাদ প্রায় খালি হয়ে গেছে, পিছু হটতে হটতে মাথার কাছে সরে গেছে অল্প কিছু রাসটা আর হারারি যোদ্ধা, তাদের কাছ থেকে কোন হামলা আশা করা যায় না। শেষ কারণ, এক ঝাঁক ট্যাংক–সদ্য এসে পৌঁচেছে ওগুলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা দখল করেছে কাউন্ট, সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে তার মনে। চলে এসেছে শিফটা বাহিনীর একেবারে সামনের সারিতে।

তার স্বপ্নিল ঘুম ভাঙল ড্রামের শব্দে। সটান উঠে বসল সে ট্যাংকের শক্ত মেঝেতে। চোখ বড় বড়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। পিস্তলটা পাবার জন্য উন্মাদের মত হাতড়াতে লাগল অন্ধকারে। ‘সাতা!’ প্রায় কেঁদে ফেলল কাউন্ট, ড্রামের শব্দ তার বুকে হাতুড়ি ঠুকছে। ‘সাতা!’ কিন্তু সার্জেন্ট বানানটো সাতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্রিম দ্রিম শব্দটা পাগল করে তুলল তাকে। দু’হাতে কান চাপা দিল, কিন্তু তবু শুনতে পাচ্ছে, শব্দের সঙ্গে কাঁপছে ট্যাংকের খোল, কাঁপছে তার গোটা অস্তিত্ব। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠল সে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, জানে না কোথায় যাচ্ছে। এক সময় পিছনের হ্যাচ ঠেকল হাতে, সেটা খুলে বাইরে মাথা বের করল সে। ‘সাতা!’

এবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। খর্বকায় সার্জেন্ট ট্যাংকের জোড়া স্টীল ট্র্যাক-এর মাঝখানে পাথুরে মাটির উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কাউন্টের ডাক শুনে মুখ থেকে কম্বল সরাল সে, কাউন্ট শুনতে পেল সাতার দাঁতগুলো সচল

টাইপরাইটারের মত শব্দ করছে।

'ড্রাইভারকে পাঠিয়ে এই মুহূর্তে খবর দাও মেজর লুইগি রাকাকে।'

'এই মুহূর্তে।'

কম্বল গায়ে নিয়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সাতা, কয়েক মিনিট পর এমন হঠাৎ করে আবার উদয় হলো সে যে আঁতকে উঠে তার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করল কাউন্ট।

'এক্সেলেন্সী!' করুণা ভিক্ষা করল সাতা।

'গাধার লেজ!' খেঁকিয়ে উঠল কাউন্ট, আতংকে খসখসে তার কণ্ঠস্বর। 'আরেকটু হলেই তো খুন হয়ে যাচ্ছিলে—জানো না, চিতার মত ক্ষিপ্র আমি?'

'এক্সেলেন্সী, আমি কি ট্যাংকের ভিতর ঢুকতে পারি?'

অনুরোধটা এক মুহূর্ত বিবেচনা করল কাউন্ট, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'আগে আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দাও।' কিন্তু কফি যখন এল, কাউন্ট বিমর্ষ দৃষ্টিতে দেখল ড্রামের শব্দ তার নার্ভের এমনই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে যে মগটা হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না সে, মগের কিনারা দাঁতের সঙ্গে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে।

'ছাগলের মুত বানিয়ে এনেছ!' মারমুখো হলো কাউন্ট, সাতাকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়, যাতে সে দেখতে না পায় তার হাত কাঁপছে। 'এ তো বিষ! আমাকে খুন করার ফন্দি!' কফিসহ মগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিখাদের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল মেজর লুইগি রাকার বিশাল দেহ।

'যোদ্ধারা এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, মাই কর্নেল,' ভারি গলায় বলল সে। 'আর পনেরো মিনিট পর দিনের আলো

ফুটলে... ।’

‘গুড। গুড।’ তাকে থামিয়ে দিল কাউন্ট, ড্রামের শব্দ এড়াবার বুদ্ধি বের করে ফেলেছে সে। ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব। জেনারেল ফাদের সাথে জরুরী একটা বিষয়ে পরামর্শ... ।’

‘চমৎকার, মাই কর্নেল,’ এবার মেজরই বাধা দিল তাকে। ‘আমার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে, শত্রুপক্ষের বিরাট একটা দল পাহাড় টপকে আমাদের পিছনে, ডানাকিল মরুভূমিতে পৌঁচেছে। আপনি গিরিখাদ থেকে বেরুবার সাথে সাথে, সম্ভাবনা আছে তাদের সামনে পড়ে যাবেন।’ ইতিমধ্যে কাউন্টকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছে মেজরের, জানে কী রোগের কী দাওয়াই। ‘আপনার সাথে ছোট একটা এসকর্ট থাকবে, কিন্তু তাতে কী, আপনি একাই তো একশো–শত্রুদের দলটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।’

‘কিন্তু আমি সিরিয়াসলি ভাবছি,’ গলায় অপ্রত্যাশিত জোর ফুটিয়ে বলল কাউন্ট, ‘আমার মনটা সন্তানতুল্য সৈনিকদের মাঝখানে রয়ে যাচ্ছে কিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা সময়ও আসে যখন মাথার কথা না শুনে, শুনতে হয় হৃদয়ের কথা। এবং তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, রাকা–রক্তে আমার যুদ্ধ করার নেশা জাগছে।’

‘শুনে ধন্য হলাম, মাই কাউন্ট।’

‘আমি এই মুহূর্তে অ্যাডভান্স করব,’ ঘোষণা করল কাউন্ট, পিছনে শত্রুপক্ষের বিরাট দল আছে শুনে সামনে পালাতে চাইছে সে। ‘সাহসী যোদ্ধারা ভোর হবার অপেক্ষায় বসে থাকে না, বুঝলে?’

প্রস্তুতি নিতে নিতে ক্ষীণ আলো ফুটল আকাশে, আর সেই সঙ্গে অকস্মাৎ থেমে গেল ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। আকস্মিক নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মত বাজল কাউন্টের কানে, মুখ তুলে গিরিখাদের উপর দিকে তাকাল সে।

ধীরে ধীরে নতুন একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ বাতাসে। রাতের আকাশে পাখির ডানা ঝাপটানোর মত, অথচ সম্পূর্ণ অচেনা। তারপর আরেকটা শব্দ যোগ হলো, ক্ষীণ কিন্তু পরিষ্কার—বহুকণ্ঠের সম্মিলিত লু-লু। যেন কয়েকশো লোক একসঙ্গে আওয়াজ করছে।

'মাতা মেরী, যীশু, যীশুর বাপ!' ভয়ে আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কাউন্ট।

প্রথমে মনে হলো পাথরের ধস নেমে আসছে। সেই সঙ্গে লু-লু ধ্বনিতে কেঁপে উঠল পাথর, মাটি, পাহাড়প্রাচীর, ট্যাংক আর কাউন্টের গোটা শরীর। তারপর চেনা গেল আকৃতিগুলো—পাথর নয়, মানুষের ঢল।

'রাকা, তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব!' চিৎকার করল কাউন্ট। 'তুমি না বলেছিলে শত্রুপক্ষ হামলা করবে না?' কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল মেজর রাকার কর্কশ কমান্ডে। পরমুহূর্তে সামনের লাইন থেকে গর্জে উঠল মেশিনগানগুলো।

রাসটা আর হারারি যোদ্ধারা ঘর ভাঙা পিঁপড়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে গিরিখাদে। দলে দলে, শয়ে শয়ে নেমে আসছে তারা। ঢেউ খেলানো গমের খেত যেন, আলাদাভাবে কাউকে চিনবার উপায় নেই। লাশের উপর জমা হতে লাগল লাশ, তবু তাদের অগ্রযাত্রার বিরাম নেই। মুষলধারে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে, ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে জনারণ্য, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় সারি, চোখের

পলকে লাশে পরিণত হচ্ছে সবাই, তাদেরকে টপকে এগিয়ে আসছে আরেক দল।

অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা আতংক ভুলিয়ে দিল কাউন্টকে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল সে। বুলেট-বৃষ্টি এড়িয়ে শত্রুরা সামনে বাড়তে পারছে না, তবু দু'একজন কীভাবে যে ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনে চলে এল কেউ বলতে পারবে না। মেজর রাকার নির্দেশে তৈরি কাঁটাতারের বেড়ার সামনে পৌঁছেও থামল না তারা, ধারাল তরোয়াল দিয়ে তার কাটবার চেষ্টা করল।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে যারা পৌঁছুল তাদের বেশিরভাগই মারা গেল প্রথম সারির শিফটা ট্রেঞ্চের সামনে। একটা করে রাইফেল গর্জে ওঠে, একজন করে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেল, ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকছে দু'একজন রাসটা বা হারারি–মৃত্যুকে তারা বরণ করল বেয়োনেট বুকে নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন হারারি, মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেল বেড়াটা, সেই সঙ্গে মাথায় রাইফেলের বুলেট নিয়ে বেড়ার উপরই মুখ থুবড়ে পড়ল তারা। পরমুহূর্তে তাদেরকে টপকে ছুটে এল তিনজন।

তিনজনের নেতৃত্বে রয়েছেন কংকালসদৃশ এক বৃদ্ধ। সাদা আলখেল্লা পরে আছেন তিনি। মাথায় কোন চুল নেই, খুলিটা কামানের গোলার মত চকচক করছে। ঘামে ভেজা মুখে সাদা ধবধবে দাঁত মুক্তোর মত ঝলমলে। শুধু একটা তরোয়াল বহন করছেন তিনি, অস্বাভাবিক লম্বা আর চওড়া সেটা, মাথার উপর অনায়াসে বন বন করে ঘোরাচ্ছেন, মেশিনগান আর রাইফেলের বুলেটগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পাহাড়ী ছাগলের মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লাফ দিয়ে জায়গা বদল করছেন।

তাঁকে অনুসরণ করছে দু'জন হারারি, তাদের হাতে মান্ধাতা আমলের রাইফেল। ছুটে আসছে তারা, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, তাদের লু-লু চিৎকার চাপা পড়ে গেল কামাল হাসানের রণহুংকারে।

দলটাকে টার্গেট করে গর্জে উঠল একটা মেশিনগান। ধরাশায়ী হলো সঙ্গী দু'জন, কিন্তু তালগাছের দৈর্ঘ্য নিয়ে আগের মতই লাফাতে লাফাতে ছুটে এলেন কামাল হাসান।

হতভম্ব কাউন্ট যেন তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার পাশ থেকে একটা মেশিনগান গর্জে উঠল, এবার কামাল হাসান সামান্য একটু হোঁচট খেলেন। কাউন্ট দেখল, বুলেট লেগেছে, টার্গেটের ঢোলা আলখেল্লা থেকে মিহি ধুলো উড়ল, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল খানিকটা কাপড়, সেই সঙ্গে তাঁর বুকের কাছে ফুটল লাল রঙ। অথচ এখনও আগের মতই ছুটে আসছেন তিনি, এখনও তাঁর গলা থেকে রণহুংকার বেরুচ্ছে, লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলেন ট্রেঞ্চের প্রথম সারি, নাক বরাবর সোজা এক লাইনে দাঁড়ানো ট্যাংকগুলোর দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি যেন পরম শত্রু কাউন্ট ডিকানডিয়াকে চিনতে পেরেছেন, তাকেই বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতা হরণকারীদের অন্যতম হিসাবে। কাউন্টের মনে হলো, একা শুধু তার প্রতিই আক্রোশ নিয়ে ছুটে আসছে লোকটা। লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বুকের উপর, তবু বাতাসে অনবরত শিস তুলছে তরোয়ালের ফলা। হোঁচট খাচ্ছেন তিনি।

মেশিনগানের শেষদফার বুলেটগুলো আঘাত করল তাঁকে, তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল তরোয়াল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তারপরও ক্রল করে এগোলেন, তাকিয়ে আছেন মুখ তুলে সরাসরি কাউন্টের চোখে। চিৎকার করে

কী যেন বলতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, কিন্তু আওয়াজের বদলে সাদা দাঁত ডুবে গেল মুখভরা তাজা রক্তে। গল গল করে রক্ত বমি করলেন তিনি। ক্রল করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকের সামনে পৌঁছে গেলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন কাউন্টের দিকে, কাউন্ট তার বেরেটা তাক করল কামাল হাসানের মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, ট্রিগার টানতে পারল না।

'মারো!' চিৎকার করল সে। 'খতম করো!'

কিন্তু শিফটাদের রাইফেল বা মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে থাকল। এই অভাবনীয় দৃশ্য পাথর করে দিয়েছে তাদের।

চোখ বন্ধ করল কাউন্ট, অনেক চেষ্টা করে এক এক করে পরপর ছ'টা গুলি করল সে। ছ'ফুট দূরে ছ'বার ঝাঁকি খেলেন কামাল হাসান।

এক মিনিট পর চোখ মেলল কাউন্ট। কৃত্রিম দাঁত মুখ থেকে খসে পড়েছে কামাল হাসানের। সেদিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকল সে। তার শরীর কাঁপছে। কামাল হাসান এখনও তাকিয়ে আছেন তার দিকে, চোখের স্থির মণিতে প্রাণ নেই।

কাউন্টের পাশে এসে দাঁড়াল মেজর রাকা। ঘোষণা করল, 'গিরিখাদ শত্রুমুক্ত হয়েছে, সারডির পথ সম্পূর্ণ খোলা।' তার নির্দেশে একযোগে বেজে উঠল কয়েকটা বিউগল, ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল শিফটা পদাতিক বাহিনী। স্টার্ট নিল ট্যাংকগুলো।

শিফটাদের এক অজ্ঞাত পরিচয় সৈনিক পদাতিক বাহিনীর মিছিলে যোগ দেওয়ার আগে নিজের গা থেকে কম্বল খুলে ঢেকে দিল কামাল হাসানের লাশ। ট্যাংক নিয়ে রওনা হবার আগে লাশটার সামনে দাঁড়াল মেজর রাকা, কাউন্টের চোখ ফাঁকি দিয়ে কামাল হাসানকে স্যালুট করল সে।

আঠারো

গিরিখাদের ঠিক ঠোঁটের কাছে বিশাল গ্র্যানিট পাথর সাজিয়ে উঁচু পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, আর্মারড কলাম দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। শিফটা পদাতিক বাহিনী এগিয়ে এল পাঁচিল ভাঙবার কাজে। পাঁচিলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে রাসটা আর হারারি বাহিনীর কিছু যোদ্ধা, অকস্মাৎ মাথা তুলে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল তারা।

আতংকে অস্থির হয়ে দলে দলে পিছিয়ে আসতে শুরু করল শিফটারা, বেশিরভাগ পড়ে গেল পাঁচিলের কাছাকাছি গর্তের ভিতর, পাঁচিলের উপর থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ট্যাংকের সামনে কয়েকশো লোক ছুটোছুটি করছে, গানাররা সাহস করে গুলি ছুঁড়তে পারল না।

পরপর তিনবার, গোটা সকাল ধরে, পাঁচিলের কাছ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো শিফটারা। কামানের গোলা ছুঁড়েও পাঁচ ফুট চওড়া গ্র্যানিট পাথরের তৈরি পাঁচিলের তেমন কোন ক্ষতি করা গেল না।

অঘোষিত যুদ্ধবিরতি শুরু হবার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা আর মাইকেল, বিশাল গ্র্যানিট পাথরে হেলান দিয়ে। দু'জনেই ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'আমি নীল দেখছি।' পাহাড়চূড়ার মাথায় এখনও রয়েছে মেঘ, তবে শুকনো মরু বাতাসে ভেসে যাচ্ছে দ্রুত, মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে, ফাঁকের ভিতর নীল আকাশ, পরমুহূর্তে ফাঁকটা পূরণ করছে ঘন মেঘের ভেলা।

হঠাৎ উজ্জ্বল এক ঝলক রোদ গোটা উপত্যকা আলোকিত করে তুলল, ছায়া সরে যাওয়ায় সবুজ রঙ নিয়ে হেসে উঠল যেন পাহাড়গুলোর ঢাল।

'জীবন ভারি সুন্দর!' বিড়বিড় করল মাইকেল।

ঘড়ি দেখল রানা। 'এগারোটা সাত। আর একটু পরই রেডিও মেসেজ পাঠাবে ওরা, আকাশ খালি হয়ে গেছে। পাইলটরা ককপিটে বসে আছে, এখানে পৌঁছুতে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে ওদের।'

সিধে হয়ে বসল মাইকেল, অক্ষত হাতটা দিয়ে চুল সরাল কপাল থেকে। 'এক ভদ্রলোকের কথা জানি, ওরা যখন আসবে, তিনি তখন এখানে থাকবেন না।'

'দু'জন ধরো,' একমত হলো রানা।

'আমাদের কাজ শেষ, ওল্ড চ্যাপ। যতটুকু করবার করেছি আমরা। দু'চার মিনিট এদিক-ওদিক হলে চকলেট সালে খিটমিট করবে বলে মনে হয় না। বম্বারগুলো যখন আসবে, দুপুর হতে বাকি থাকবে বড় জোর ওই দু'চার মিনিটই।'

'বেচারা যোদ্ধাদের কী হবে?' পাথুরে পাঁচিলের নীচে ওদের সঙ্গে যারা বসে রয়েছে তাদের দিকে হাত তুলল রানা। সংখ্যায় তারা কয়েকশো হবে, কামাল হাসান বাহিনীর অবশিষ্টাংশ।

'বম্বার আসার শব্দ পেলেই ছুটবে ওরা, অনুমতি দিয়ে রাখো।'

'ব্যাখ্যা করে বোঝাবে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যাই, বানুকে ডেকে আনি,' ক্রল করে এগোল মাইকেল, পাঁচিলের গা ঘেঁষে, কারণ পাহাড়ের মাথায় শিফটা ুাইপাররা বসে আছে।

পাঁচশো গজ পিছনে ভাঁজবহুল মাটির উপর চারপাশে কর্কশ ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চঞ্চলা, ওটাকে আড়াল করে রেখেছে কয়েকটা সেডার গাছ, রাস্তার পাশে।

একবার চোখ বুলিয়েই মাইকেল বুঝতে পারল উদ্ধার করবার সময় যে নড়বড়ে ভাবটা ছিল সেটা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে অ্যানি, তবে চেহারা এখনও ম্লান আর ক্লান্ত, পরনের ছেঁড়া কাপড়ে শুকনো রক্ত আর মাটির দাগ। কেবিনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে ছেলেটা, তার শুশ্রূষায় বানুকে সাহায্য করছে অ্যানি, মাইকেলকে দেখে মুখ তুলে তাকাল।

'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল, খোলা পিছনের দরজা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সে। দুটো বুলেট খেয়েছে আব্বাস, গিরিখাদ থেকে তাকে তুলে এনেছে বিশ্বস্ত দু'জন হারারি।

'সেরে উঠবে ও, আমার ধারণা,' বলল অ্যানি।

চোখ খুলে ফিসফিস করল আব্বাস।

'মেজর মাইকেল—হ্যাঁ, সেরে উঠব আমি।'

'উঠতেই হবে, তা না হলে পাওনা শাস্তিটা ভোগ করবে কে? তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু হামলা করার দায়িত্ব দিইনি।'

'মেজর সেভারস!' ঝট্ করে মুখ তুলল বানু, মায়ের মমতা নিয়ে আব্বাসকে রক্ষা করতে চাইল। 'বীরত্ব আর সাহসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে...।'

'ঈশ্বর! সাহসী আর সৎ মানুষদের কবল থেকে রক্ষা করো

আমাকে!' হাঁপিয়ে উঠল মাইকেল, 'দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলার জন্যে ওরাই দায়ী।' বানু আবার তার উপর ঝাল ঝাড়বার সুযোগ পেল না, বলে চলল মাইকেল, 'আমার সাথে চলো দেখি, কিছু অনুবাদ কর্ম সারতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আব্বাসকে ছেড়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল বানু। বেরিয়ে এল অ্যানিও, ইস্পাতের খোলের পাশে মাইকেলের কাছাকাছি দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভাল তো?'

'নেভার বেটার,' অ্যানিকে আশ্বস্ত করল সে, কিন্তু অ্যানি দেখল মাইকেলের চেহারায় অস্বাভাবিক একটা রঙ ফুটে উঠেছে, চোখে যেন কীসের একটা নেশা নেশা ভাব।

ঝট করে হাত বাড়াল অ্যানি, মাইকেল বাধা দেওয়ার আগেই তার আহত হাতটা ধরে ফেলল। বেলুনের মত ফুলে আছে ওটা। চামড়ার রঙ হয়েছে সবুজাভ লালচে, সামনের দিকে ঝুঁকতেই পুঁজের তীব্র গন্ধ পেল অ্যানি। উদ্বেগের সঙ্গে হাত তুলে মাইকেলের কপাল স্পর্শ করল সে।

'সর্বনাশ! মাইকেল, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!'

'প্রেম আর আবেগ, ওল্ড গার্ল। তোমার চাঁপা কলার মত আঙুলের স্পর্শ পেয়েই...।'

'হাতটা দেখতে দাও আমাকে,' জেদ ধরল অ্যানি।

'না দেখাই ভাল।' অ্যানির চোখে চোখ রেখে, ঠোঁট টিপে হাসল মাইকেল। 'কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না, কী? সভ্য জগতে না ফেরা পর্যন্ত কারও কিছু করার নেই।'

'মাইকেল...।'

'ওখানে পৌঁছে, মাই ডিয়ার লেডি, তোমাকে বড় এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেব আমি, তারপর খবর পাঠাব পাদ্রিকে।'

'মাইকেল, সিরিয়াস হও।'

'এত সিরিয়াস কখনও ছিলাম না।' অক্ষত হাতটা আঙুল দিয়ে অ্যানির চিবুক স্পর্শ করল মাইকেল। 'ওটা বিয়ের একটা প্রস্তাব ছিল,' বলল সে, অ্যানি অনুভব করল তার আঙুলের ডগা আগুনের মত গরম।

'মাইকেল! ওহ্ মাইকেল!'

'ধরে নিলাম তুমি বলছ–থ্যাংকস, বাট নো থ্যাংকস।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি, কথা বলতে পারল না।

'রানা?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল, আবার মাথা ঝাঁকাল অ্যানি।

'কী জানো, আরও ভাল কাউকে পেতে পারতে তুমি। যেমন, আমাকে।' তারপরই নিঃশব্দে হাসল সে, কিন্তু তাতানো শরীর থেকে ব্যথা আর বিষাদ অদৃশ্য আঁচের মত ঠিকরে বেরিয়ে এল। 'আবার, আরও অনেক খারাপ কেউ কপালে জুটে যেতে পারত। যেমন, আমি।' পরমুহূর্তে ঝট করে বানুর দিকে ফিরল সে, খপ্ করে তার কনুইয়ের উপরটা খামচে ধরল। 'চলে এসো, মাই ডিয়ার।' হাঁটতে শুরু করে কাঁধের উপর দিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল। 'বম্বার আসছে শুনতে পেলেই ফিরে আসব আমরা। ছোটার জন্যে তৈরি থেকো।'

'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?' ওদের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

'এখনও জানি না।' হেসে উঠল মাইকেল। 'তবে চিন্তা কোরো না, নিরিবিলি একটা জায়গা ঠিকই আমরা খুঁজে নেব।'

প্রথম শুনতে পেল রানা, এত দূরে যে ঝিমানো দুপুরে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন বলে মনে হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা, ভেসে আসবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল পাহাড় প্রাচীর।

'আসছে ওরা,' বিড়বিড় করল রানা, যেন সায় দিয়েই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো পাঁচিলের অপরদিকে, গিরিখাদের এক মাইল পিছনে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে শিফটা কামান। হলুদ ধোঁয়ার মোটা একটা স্তম্ভ পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে রোদ জ্বলা বাতাসে উঠে গেল।

'মুভ!' গর্জে উঠল মাইকেল, কমান্ড হুইসেলটা ঠোঁটে তুলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল কয়েকবার।

পাঁচিল ঘেঁষে ছুট দেওয়ার আগে রানা আর মাইকেল নিশ্চিত হয়ে নিল রাসটা আর হারারিরা সবাই সেডার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জঙ্গল আর পাঁচিলের মাঝখানে উপত্যকায় কেউ নেই। ট্রেঞ্চগুলোও খালি। এবার নিজেরাও ওরা উপত্যকায় বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে বোমারুগুলো একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছে।

একটু থেমে মাইকেলের অক্ষত হাতটা ধরল রানা। 'দৌড়াতে অসুবিধে হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল মাইকেল, রানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও জোরে পা চালাল, কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল একবার পিছন দিকে। দেখাদেখি রানাও।

গিরিখাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রথম বোমারু, প্রসারিত কালো ডানা দুটো গোটা আকাশটাকে যেন ঢেকে ফেলতে চাইছে। পেট থেকে দুটো বোমা খসল। একটা পিছনে পড়ল, কিন্তু দ্বিতীয়টা আঘাত করল পাঁচিলে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ওরা, কেউ যেন শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারল ওদেরকে।

আবার যখন মাথা তুলল রানা, দেখল ধোঁয়া আর আগুনের মাঝখানে পাঁচিলটা ভেঙে গেছে। 'পালাই হে চলো,' মাইকেলকে টেনে তুলল ও। 'খেল খতম হয়ে গেছে।'

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ ওদের নীচে, কেবিন থেকে চিৎকার করে জানতে চাইল অ্যানি; ড্রাইভারের সিট থেকে রানা বা টারিট থেকে মাইকেল, দু’জনের কেউই জবাব দিল না।

‘গাড়ি নিয়ে আমরা যদি সোজা ডেসি রোডে উঠে যাই, অসুবিধে কী?’ জানতে চাইল বানু, ‘সামনে পা মেলে দিয়ে কেবিনের মেঝেতে বসে আছে সে, কোলের ওপর আব্বাসের মাথা। কাপুরুষ গালাদের সাথে না পারার কিছু নেই, ঠিকই একটা রাস্তা করে নিতে পারব...।’

‘গ্যাসের যা অবস্থা তাতে আরও পাঁচ মাইল অনায়াসে যেতে পারব আমরা।’

‘গাড়ি নিয়ে আম্বা সাকাল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়,’ প্রায় গোটা দক্ষিণ আকাশ ঢেকে রেখেছে পাহাড়টা, সেদিকে একটা হাত তুলে বলল মাইকেল। ‘ওখানে গাড়ি ফেলে হেঁটে পাহাড় টপকাতে হবে।’

হ্যাচ গলে টারিটে, তার পাশে উঠে এল অ্যানি, দু’জনেই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল আম্বা সাকালের দিকে।

‘কিন্তু আব্বাসের কী হবে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

‘ওকে আমরা বয়ে নিয়ে যাব।’

‘পাহাড় টপকানো কোন দিন সম্ভব নয়। চারদিকে গালারা গিজগিজ করছে।’

‘আর কোন বিকল্প জানা আছে?’ জিজ্ঞেস করল মাইকেল, মরিয়া হয়ে নিজের চারদিকে তাকাল অ্যানি।

গোটা উপত্যকায় একা শুধু চঞ্চলাই সচল বস্তু। পাহাড়ের পাথুরে ঢালগুলো ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাসটা আর হারারিরা। চঞ্চলার পিছনে উপত্যকার ঠোঁট পেরিয়ে যে-কোন মুহূর্তে উঠে

আসবে শিফটাদের ট্যাংক বহর।

হতাশ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল অ্যানি, চূড়াগুলো ছুঁয়ে অল্প কিছু মেঘ এখনও ইতস্তত করছে। হঠাৎ করে তার সমস্ত মনোবল ফিরে এল, বদলে গেল গোটা মেজাজ। চিবুক উঁচু করল সে, মুখে ফিরে এল সমস্ত রঙ। দুই চূড়ার মাঝখানের ফাঁকটায় হাত তুলল সে, হাতটা কাঁপছে। 'হ্যাঁ,' উল্লাসে চিৎকার করল অ্যানি। 'বিকল্প একটা জানা আছে আমার। তাকাও! উফ, এখনও তাকাচ্ছ না!'

খাড়া ভাবে নামতে শুরু করায় ছোট্ট নীল প্লেনটা রোদে ঝিক্ করে উঠল, দুই চূড়ার মাঝখানে পৌঁছে সিধে করল ডানা, রঙিন প্রজাপতির মত ঝলমল করছে গা।

'শিফটা প্লেন?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাইকেল।

'না! না!' দ্রুত মাথা নাড়ল অ্যানি। 'ওটা প্রিন্স সালের প্লেন। চিনি, আমি চিনি। প্রিন্সকে নেয়ার জন্যে আগেও একবার এখানে এসেছিল।' প্রায় উন্মাদিনীর মতই হাসছে সে, দামী পাথরের মত চকচক করছে চোখ। 'প্রিন্স বলেছিল, ওটা পাঠাবে সে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সময় এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছিল সে...।'

'ল্যান্ড করবে কোথায়?' জানতে চাইল মাইকেল।

হ্যাচ গলে ড্রাইভারের পাশে নেমে গেল অ্যানি উইসপার, পথ নির্দেশ দিয়ে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে নিয়ে চলল গাড়িটাকে। শহরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল ঘর-বাড়ি থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

চোখেমুখে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা সবাই, শুধু আব্বাস বাদে, খোলা মাঠের কিনারায় চঞ্চলার পাশে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছে। মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা, সেটার সঙ্গে ঘুরছে ওদের মাথা।

'ব্যাটা করছেটা কী!' রাগের সঙ্গে বলল রানা। 'শিফটারা এলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে?'

'লোকটা নার্ভাস,' আন্দাজ করল মাইকেল। 'এখানে কী ঘটছে জানে না। দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে–শহরটা পুড়ছে, আর ট্যাংক। ট্যাংকের সাথে বোধহয় ট্রাকগুলোও ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে গিরিখাদ থেকে।'

ওদের দিকে পিছন ফিরে আর্মারড কারের দিকে ছুটল অ্যানি, টারিটে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়াল, ঘন ঘন হাত নাড়ল পাইলটের উদ্দেশে।

পরবর্তী চক্করে আরও অনেক নীচে নামল পুস মথ, ককপিটের পাশের জানালায় পাইলটের মুখ দেখতে পেল ওরা, ওদের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। তারপর বিধ্বস্ত শহরের উপর দিয়ে ছুটে এল প্লেনটা, প্রতি মুহূর্তে নীচে নামল, চঞ্চলার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাঝখানে ব্যবধান থাকল মাত্র দশ গজের মত–টারিটে দাঁড়ানো অ্যানিকে ভাল করে দেখে নিল পাইলট।

অ্যানি চিনতে পারল পাইলটকে, প্রিন্স সালেকে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকটাই এসেছিল। পাইলটও চিনতে পেরেছে অ্যানিকে, ককপিটের ভিতর সহাস্যে হাত নাড়ল সে।

পরের বার মাঠে নেমে এল হালকা পুস মথ। ছুটে এসে থামল ওদের সামনে। জানালার কাঁচ সরিয়ে মাথা বের করল পাইলট, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার, 'হালকা তিনজনকে নিতে পারি, ভারি হলে দু'জনের বেশি নয়। চারদিকে পাহাড়, ওজন বেশি হলে চূড়ায় ধাক্কা খাব।'

নিমেষের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর মাইকেল,

পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে কেবিনের দরজা খুলে ফেলল রানা, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢোকাল মেয়ে দুটোকে। কেবিনটা ছোট্ট, দু'জন উঠবার পর আর প্রায় কোন জায়গাই থাকল না।

'থামো,' পাইলটের কানে বোমা ফাটাল মাইকেল। 'হালকা আরও একজন আছে।'

দু'জন ধরাধরি করে চঞ্চলার কেবিন থেকে বের করে আনল আব্বাসকে। এরইমধ্যে বাতাসের দিকে পিছন ফিরবার জন্য প্লেন ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে পাইলট, আব্বাসকে নিয়ে প্লেনের পিছু পিছু ছুটতে হলো ওদেরকে।

'রানা…!' রুদ্ধকণ্ঠে ডাকল অ্যানি, চিৎকার করতে চাইলেও তার গলা ভেঙে গেল, চোখে উন্মাদিনীর দৃষ্টি।

'চিন্তা কোরো না,' পাল্টা চিৎকার করল রানা, ওর আর মাইকেলের হাত থেকে মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে নিল আব্বাসকে, প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে এখনও ছুটছে ওরা। 'চিন্তা কোরো না,' আবার বলল রানা, 'আমরা ঠিক বেরিয়ে যাব… ।'

'রানা…,' কী যেন বলতে চেয়েও পারল না অ্যানি, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেও নিজেকে সামলাতে পারল না, দু'চোখ ভাসিয়ে দিয়ে পানি বেরিয়ে এল, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। 'ওহ্, রানা…!'

প্লেনের সঙ্গে এখন শুধু একা রানা ছুটছে, লম্বা করা হাত দিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করছে ও। টেক-অফ করবার জন্য বেড়ে গেল প্লেনের গতি, কিন্তু আব্বাসের একটা পা বেরিয়ে থাকায় দরজাটা বন্ধ করতে পারছে না রানা। পা-টা ভিতরে ঠেলে দেওয়ার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল ও, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে গেল একটা রাইফেল বুলেট। ফিউজিলাজের ক্যানভাস আবরণ ভেদ করল সেটা।

ঝট করে মুখ তুলতেই রানা দেখল পরবর্তী বুলেটটা ককপিটের পাশের জানালার কাঁচ ভেঙে সরাসরি পাইলটের জুলফির ভিতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিট থেকে কাত হয়ে পড়ল পাইলট, ঝুলে থাকল শুধু শোল্ডার স্ট্র্যাপের সঙ্গে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁকা পথ ধরল প্লেন, রানা দেখল পাইলটের লাশের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে থ্রটলটা বন্ধ করে দিল অ্যানি। ঘুরে দাঁড়িয়ে চঞ্চলার দিকে ছুটল রানা।

ওরা ছুটছে, ওদের পায়ের কাছে ধুলো ওড়াচ্ছে রাইফেলের বুলেট।

'কোথায় ওরা?' মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাঁ দিকে।'

ঘাড় ফেরাতেই দুশো গজ দূরে, মাঠের কিনারায় ঘাসের ভিতর শিফটা রাইফেলম্যানদের দেখতে পেল রানা। ওদের পিছনে বড় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও পিছনে, আরও অনেক পিছনে দেখা গেল ট্যাংকগুলোকে, হেলেদুলে এগিয়ে আসছে।

চঞ্চলার এঞ্জিন চালুই রয়েছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শিফটাদের দিকে ছুটল রানা, টারিট থেকে ভিকার্স মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ল মাইকেল। লাফিয়ে উঠল শিফটারা, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটে পালাল।

মাইকেল এবার গুলি করল ট্রাক লক্ষ্য করে। ফুয়েল ট্যাংক ঝাঁঝরা হয়ে গেল, গোটা ট্যাংক ঢাকা পড়ল লাল আগুনে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চঞ্চলাকে প্লেনের কাছাকাছি দাঁড় করাল রানা, স্নাইপাররা গুলি করলে এখন আর্মারড কারের গায়ে লাগবে।

ইতিমধ্যে অ্যানি আর বানু ধরাধরি করে পাইলটের লাশ ককপিট থেকে নামিয়ে ফেলেছে। লোকটা লম্বা-চওড়া, কাঁধ দুটো ভারি। তার দিকে পিছন ফিরে ককপিটে উঠল অ্যানি, কন্ট্রোলের

পিছনে বসে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধল নিজেকে।

'গড!' বলল রানা, চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠল। 'এক বার বলেছিল বটে প্লেন চালাতে জানে!'

রাইফেলের একটা বুলেট ইস্পাতের খোলে লেগে পিছলে গেল, ছুটে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে।

পাইলটের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইকেল। 'ওর মৃত্যু ভারি তাৎপর্যপূর্ণ।'

'আর মাত্র একজনের জায়গা হবে,' ককপিট থেকে চিৎকার করল অ্যানি। 'তোমাদের দু'জনকেই তুলে নিলে, পাহাড় টপকানো সম্ভব হবে না।' দু'জনেই ওরা দেখতে পেল, কথাগুলো বলতে গিয়ে আত্মপীড়নে জর্জরিত হলো অ্যানি।

চঞ্চলার খোলে আরেকটা বুলেট লাগল।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার চিৎকার করল অ্যানি, 'আর মাত্র একজনকে নেয়া যাবে প্লেনে।'

'কে যাবে?' চোখে বিদ্রূপাত্মক, শয়তানি হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল মাইকেল।

শান্ত সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'কার যাওয়া দরকার? কার চিকিৎসা প্রয়োজন?'

'তুমি জানো না, ওল্ড চ্যাপ, দান করা জিনিস নিই না আমি?' বাঁকা হাসি ফুটল মাইকেলের মুখে। 'এসো টস করি।' ভোজবাজির মত আবার একবার তার হাতে বেরিয়ে এল তাঞ্জানিয়ান শিলিংটা। রানার মুখের উপর নিঃশব্দে হাসল সে।

'হেডস,' বলল রানা।

রোদের ভিতর ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেল শিলিংটা, অক্ষত হাতের তালুতে সেটাকে নামতে দিল মাইকেল,

ঝুঁকে তাকাল। 'জানতাম কোন এক সময় ঘটবে ব্যাপারটা—অবশেষে জিতলে তুমি।' মাইকেলের নিঃশব্দ হাসি মুখের কোণগুলো উঁচু করে তুলল। 'ওয়েল ডান, ওল্ড চ্যাপ। বিদায়।'

কিন্তু কব্জিটা চেপে ধরল রানা, শিলিংটার দিকে তাকাল ও। 'টেইলস!' ধমকে উঠল ও। 'প্রথম থেকেই জানতাম তুমি একটা চীট, ইউ বাস্টার্ড!' ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল ও। 'তোমাদের টেক-অফ কাভার দেব আমি, অ্যানি। প্লেন আর শিফটাদের মাঝখানে রাখব চঞ্চলাকে, যতক্ষণ পারা যায়!' বলেই পিছন ফিরল রানা।

ওর পিছনে ঝুঁকল মাইকেল, প্রায় আধ সের ওজনের একটা পাথর হাতে নিয়ে সিধে হলো। 'দুঃখিত, ওল্ড চ্যাপ। লাগলে বলো, কী?' বিড়বিড় করল সে। 'কিন্তু এরইমধ্যে আমার হৃদয়টা দখল করে নিয়েছ তুমি, বন্ধু!' হাতের পাথরটা দিয়ে রানার মাথার পিছনে সাবধানে মারল সে, পাথরটা ফেলে দিয়ে অজ্ঞান শরীরটাকে অক্ষত হাতের ভাঁজে আটকাল।

রানার শিরদাঁড়ার নীচে একটা হাঁটু ঠেকিয়ে, হাঁটুটা উঁচু করল মাইকেল, এক ধাক্কাতেই প্লেনের কেবিনে তুলে দিল ওকে। তারপর একটা পা তুলে রানার পাঁজরে ঠেকাল, পায়ের চাপে দরজা থেকে ভিতর দিকে ঠেলে দিল শরীরটাকে। বন্ধ করে দিল দরজা।

পর্দার মত কাজ করছে চঞ্চলা, সেটার খোলে একের পর এক বুলেট লাগছে। পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগটা বের করে আনল মাইকেল। পাশের জানালা দিয়ে অ্যানির কোলে ফেলল সেটা। সামনে কন্ট্রোল নিয়ে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছে অ্যানি।

'রানাকে বলো, আমি যদি আগে না পৌঁছাই, চকলেট সালের

চেকটা ক্যাশ করে তোমাকে যেন এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেয় আমার তরফ থেকে—আর, তাতে যখন চুমুক দেবে, স্মরণ করো সত্যিই তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম।' অ্যানি জবাব দেওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সে, ছুটল চঞ্চলার দিকে, আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল খোলের মাথায়, সেখান থেকে হ্যাচ গলে নেমে গেল ড্রাইভারের সিটে।

পাশাপাশি, হরিহর আত্মার মত, আর্মারড কার আর ছোট্ট নীল প্লেনটা খোলা মাঠ ধরে ছুটল, শিফটাদের বিরতিহীন গুলি মুষলধারে বৃষ্টির মত আঘাত করছে ইস্পাতের খোলে।

তারপর, ধীরে ধীরে, দ্রুতগতি চঞ্চলাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল অসম্ভব ভারি পুস মথ। ইতিমধ্যে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা। মাটি ছেড়ে প্লেনের চাকা শূন্যে উঠে পড়ল, অনুভব করে ঝট করে পিছন ফিরল অ্যানি, চোখে দিশেহারা দৃষ্টি।

ড্রাইভারের হ্যাচের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল, অ্যানির উদ্দেশে চিৎকার করে কিছু বলছে সে, শব্দগুলো শুনতে না পেলেও তার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখল অ্যানি। নোংরা ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা মাথার উপর তুলল মাইকেল, দু'তিন বার নেড়ে বিদায় জানাল। নিঃশব্দ হাসিটুকু এখনও লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

খোলা মাঠের কিনারায় চঞ্চলাকে দাঁড় করাল মাইকেল, উঠে দাঁড়াল হ্যাচের উপর, অক্ষত হাতটা কপালে তুলে রোদ ঠেকাল, মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল ছোট্ট নীল প্লেনটার দিকে—ভারি পাহাড়ী বাতাস কেটে অত্যন্ত ধীরগতিতে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাহাড়শ্রেণীর মধ্যবর্তী ফাঁকটার দিকে উঠে যাচ্ছে, গিরিখাদ ওখান থেকে উঠে

গেছে হাইল্যান্ডের দিকে।

তার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে আকাশের কোণে দোদুল্যমান নীল বিন্দুটার দিকে, কাজেই বুঝতে পারল না তিনটে সিভি থ্রি ট্যাংক মেইন রোড ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, চলে এসেছে পাঁচশো গজের মধ্যে।

এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মাইকেল, ট্যাংকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। টারিট থেকে লম্বা স্প্যান্ডাউ ঘুরে গেল ওর দিকে।

কামানের গর্জন শুনতে পায়নি মাইকেল, কারণ শব্দ তার কানে ঢুকবার অনেক আগেই আঘাত করল গোলাটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই শুধু অনুভব করল সে, মনে হলো পৃথিবী কক্ষচ্যুত হলো, হ্যাচ থেকে পড়ে গেছে।

বিধ্বস্ত খোলের পাশে মাটিতে পড়ে থাকল সে, অক্ষত হাতটা দিয়ে শরীরের নীচের অংশটার স্পর্শ পাবার চেষ্টা করল, কারণ তার পেটে কী যেন একটা ঘটে গেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে নীচে নামল হাতটা, কিন্তু যেখানে পেট থাকবার কথা সেখানে কিছুই ছুঁতে পারল না সে। রয়েছে শুধু বিশাল একটা গর্ত, গর্তের ভিতর হাতটা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করল, পচা কোন ফলের শাঁসের মত থকথকে আর নরম কী যেন ঠেকল আঙুলে।

হাতটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল মাইকেল, কিন্তু পারল না। পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। মুখ খুলবার চেষ্টা করল, বুঝতে পারল আগে থেকেই হাঁ হয়ে আছে সেটা। চোখ খুলবার চেষ্টা করতে গিয়েও বুঝল, বিস্ফারিত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্ধকার তার মাথার ভিতর, আর হিম ঠাণ্ডা সারা শরীরে।

চিন্তা শক্তি লোপ পাচ্ছে মাইকেলের। রানার কথা মনে পড়ল তার, সে বলতে চাইল, 'তুমিই জিতে গেলে, ওল্ড চ্যাপ, কী?'

কিন্তু ঠোঁট থেকে কোন শব্দ বেরুল না। অ্যানির কথা মনে করতে চেষ্টা করল, কিন্তু চেহারাটা কিছুতেই মনে করতে পারল না ঠিকমত। তারপর সে অনুভব করল, এক রকম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাতটা নড়ছে।

চেষ্টা করল মাইকেল, দেখল পারছে। হাতটা টেনে কোমরের কাছে আনতে চাইল পকেটটা পেল না, কিন্তু যেটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল আঙুলের ডগায়। হাসতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কিনা বুঝতে পারল না।

অন্ধকার আর হিম ঠাণ্ডার মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মাইকেল, ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। 'ব্যাটা মারা গেছে!'

মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে মাইকেল ভাবল, 'হ্যাঁ, গেছি। এবার সত্যি গেছি।' আবার হাসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার ঠোঁট শুধু কাঁপল। দাঁতগুলো কামড়ে ধরে আছে গ্রেনেডটার পিন।

'ব্যাটা মারা গেছে, মাই কাউন্ট,' আবার বলল বানানটো সাতা।

'তুমি ঠিক জানো?' ট্যাংকের টারিট থেকে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কাউন্ট।

'ঠিক জানি, মাই কাউন্ট।' মাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করল সাতা। 'যার শরীর প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে সে আবার বেঁচে থাকে কী করে?' কর্কশ ঘাস আর কাদার ভিতর মোচড় খেয়ে রয়েছে মাইকেলের ঘাড় আর মাথা।

ট্যাংক থেকে নেমে এল কাউন্ট, টেনেটুনে ঠিকঠাক করল ইউনিফর্মটা। সে-ও পরীক্ষা করল মাইকেলকে। 'তুমি ঠিকই বলেছ, সাতা। লোকটা মারাই গেছে।'

'বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বানানটো সাতা।

‘সাতা!’ হঠাৎ গর্জে উঠল কাউন্ট। ‘তোমার ক্যামেরা কোথায়?’

‘আনছি, মাই কাউন্ট!’ এক ছুটে চলে গেল সাতা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ক্যামেরা নিয়ে।

‘টেরোরিস্টের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা কতক ছবি তোলা দরকার,’ বলে মাইকেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কাউন্ট, পোজ দিল।

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে তৈরি হলো সাতা। ‘চিবুক আরেকটু ওপরে তুলুন, মাই কাউন্ট।’

পিন খুলবার পরপরই মারা গেছে মাইকেল সেভারস, বিস্ফোরণের খবর তার জানা হলো না। বানানটো সাতা বা কাউন্ট ডিকানডিয়া, বিস্ফোরণের পর দু’জনের কাউকেই আলাদাভাবে চিনবার উপায় থাকল না। মাংস আর হাড় আলাদা হয়ে গেছে, কোন কিছুরই কোন আকৃতি নেই।

গিরিখাদের শেষ চূড়াটা পেরিয়ে এল অ্যানি, প্লেন আর চূড়ার মাঝখানে এক সময় ব্যবধান দাঁড়াল মাত্র পঞ্চাশ ফুট। চূড়া যদি আর খানিক উঁচু হত, পুস মথ সরাসরি ধাক্কা খেত সেটার সঙ্গে, কারণ আকাশের আরও উপরে উঠবার শক্তি ওটার নেই।

তার সামনে হাইল্যান্ড বিস্তৃত হয়ে আছে দক্ষিণ দিকে সেই আদ্দিস আবাবা পর্যন্ত। তার নীচে সরু ডেসি রোড। অ্যানি দেখল, রাস্তাটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। কমিউনিস্ট বাহিনী চলে গেছে লেক টানার দিকে, সম্ভবত ছোট একটা দল নিয়ে গিরিখাদে ঢুকেছে প্রিন্স সালে। হঠাৎ মনে পড়ায় রেডিওটা অন করল সে।

স্টেশন ধরাই ছিল, ঘোষকের উল্লসিত কণ্ঠস্বর আঘাত করল অ্যানির কানে, ‘লেক টানায় কমিউনিস্ট বাহিনীর বিরাট সাফল্য

অর্জিত হয়েছে। রেডিও আদ্দিস আবাবা এখন আমাদের দখলে...।'

স্বস্তি বোধ করলেও, সুসংবাদটা তেমন আনন্দ বয়ে আনল না। শরীর সামান্য ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল অ্যানি। দীর্ঘ সারডি গিরিপথ নিথর পড়ে আছে। দু'পাশের পাহাড় প্রাচীরের মাথা থেকে নীচে নামছে বিপুল জলরাশি, তার মনে হলো এমনকী পাহাড়গুলোও যেন কাঁদছে।

সিটের উপর সিধে হয়ে বসল অ্যানি উইসপার, গালে হাত তুলল। তার দুই গাল চোখের পানিতে ভিজে গেছে অনুভব করে মোটেও বিস্মিত হলো না সে। মাইকেলের দরাজ গলা যেন শুনতে পেল ও, 'আমি লোকটা অত খারাপ ছিলাম না, অ্যানি, কী?'

***

মাসুদ রানা-১৬৪

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

মুক্ত বিহঙ্গ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

যুদ্ধক্ষেত্রে অচল হয়ে পড়লো ভাগ্যদেবী,
মাইকেল আর কামাল হাসানকে উদ্ধার করতে গিয়ে
বিকল হয়ে পড়লো রানার চঞ্চলাও। এবার?

ওটা কি ট্রেনিং পাওয়া একটা হাতি—
শিফটাদের ট্যাংকবহরকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে?

কয়েকশো কুৎসিতদর্শন গালা যোদ্ধার হাতে
ধরা পড়লো অ্যানি উইসপার।

গিরিখাদ বেদখল, পরাজয় নিশ্চিত, পালানোর
কোন পথই খোলা নেই সামনে—এখন?

কে শেষপর্যন্ত জিতলো টসে—রানা,
নাকি মাইকেল?

ত্রিশ টাকা মাত্র

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০